# সংক্রমণ

উদয় ভাদুড়ী

চৈতালী প্রকাশনী
৭, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ :
দশে আষাঢ় গুরু পূর্ণিমা—১৩৬১

প্রকাশক :
শ্রী অজিত কুমার গুপ্ত
চৈতালী প্রকাশনী
৭নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
রাহুল মজুমদার

মুদ্রক :
শিবশক্তি প্রেস
২৮/জি অবিনাশ ঘোষ লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

পরিবেশক :
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা—৭০০০০৯

আমার দিদি

মহাশ্বেতা দেবীকে

## সূচী

## দুই

"দখল কার ?"

জনা পঞ্চাশেক লোকের এই সভায় যে গুঞ্জন চলছিল তা চাকিতে স্তব্ধ। জনতা এমন উৎকর্ণ যে, সভাস্থলের কেন্দ্রে যে বটবৃক্ষ, সেখান থেকে পাতা খসে পড়লে তারও শব্দ শোনা যাবে।

হাজো পাশে বসা নকুড়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। থাকার মধ্যে ওই একটিই। বাকি তিন ছেলের দুটো তো মরে হেজে গেছে কোন্ কালে। একটা চুরির দায়ে ধরা পড়ে জেল খাটছে। কাছে আছে শুধু নকুড়। ভাগের জমিটা পেলে খাটে, নইলে জনমজুর। জন্মচাষীর ছেলে জনমজুর। জোয়ান মদ্দ ছেলে, কিন্তু এখনই কেমন যেন হয়ে গেছে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকা নকুড়ের দিকে চেয়ে গাল দিল হাজো, "খরগোশ, শালোর কপালে জমি নাই, অন্ন নাই।"

এই সান্ধ্য মিটিং-এ আসার আগেই নকুড়ের সঙ্গে একচোট হয়ে গেছে। ঘরে নকুড়ের বউ ভরা পোয়াতি। বউ ছেড়ে সন্ধ্যের পর নকুড় একপাও বাড়ির বাইরে বেরোবে না। বউ কি আর কারো ঘরে নেই ? নাকি তারা বিয়োচ্ছে না ? এমন বউচাটা মরদ হাজো বাপের জন্মে দেখেনি।

হাজোর বয়েস তেমন কিছু নয়, পঞ্চাশ ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে কেমন যেন বুড়িয়ে গেছে। এই বয়েসেই ভুরুতে পাক ধরতে শুরু করেছে; দাড়ি তো আর্ধেক সাদা—মাথার চুলের কথা না তোলাই ভালো। চামড়ায় ভাঁজ পড়ছে। কণ্ঠাটাও হাড় উঁচু হয়ে আছে ; শ্বাস নিতে গেলে সেটাও হাপরের মত ওঠানামা করে। হাজো নিজেকেই বলে, "হেজে গেইলে বুড়া। ক্ষেতে-মাঠে, জলে-কাদায়, খিদেয় তেষ্টায় বড় তাড়াতাড়ি হেজে গেইলে বুড়া।"

মিটিং-এ যাবার কথা শুনে নকুড় খেঁকিয়ে উঠেছিল। 'কাগজ আছে, কাগজ ? মিটিনে যাবি, কাগজ না থাকলি তুর কথা কেউ শুনবে ?'

মেজতরফ গত সনের আগের সন একশো চুয়াল্লিশ দিয়েছিল। ফসল হাজো রাখতে পারেনি বটে, কিন্তু হাকিমের রায় ?

"দু সন আগেই তো হাকিম বইলছে, দখল হাজো মালোর। এই হারামজাদা তুই জানিসনে ?" হাজো ফুঁসে উঠেছিল। "মেজতরফের একশো চুয়াল্লিশ ধারার মুখে ঝাড়ু মারি।"

"সে কাগজটো তো চাই।" নকুড় ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল।

"কিসের কাগজ ?"

"হাকিমের রায়ের কাগজ। চাই না ?"

"দুপাতা লেখাপড়া করে শালো কাগজ চিনাইছে।"

"জমিতে ঘাম নাই, তুর বাপ চোদ্দপুরুষের মাথার ঘাম ? জমিতে তুর বুড়া বাপের রক্ত নাই ? হেতের মাঠের মুনিষ বাগাল নাই ? শালোর কাগজ।"

বাপের মেজাজকে ভয় করে নকুড়, বাপের শরীরকে নয়। বাঁধা দেওয়া থাকলেও পৈতৃক ভিটেটুকুর দাম বড় কম নয়। ভয় করার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট। আর কথা না বাড়িয়ে ফরসা গেঞ্জিখানা গায়ে চড়িয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল নকুড়। থেকে থেকেই বুড়ো ভয় দেখায়, "মেজতরফের কাছে জমি বেচে দিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। মুখের রক্ত তুলে আর যে আগল দিতে পারি না।"

ঘরে পোয়াতি বউ এখন তখন। তবুও সান্ধ্য মিটিং-এর আমন্ত্রণ কি গাঁঘরে কেউ উপেক্ষা করতে পারে। সকাল থেকে তিন দফা ঢোল শহরৎ হয়ে গেছে। হাজার হোক চাষীর ঘরের ছেলে; জমির সঙ্গে তার সম্পর্ক রক্তের। বউ গেলে বউ হবে, কিন্তু জমি। একবার গেলে আর হবে না। নকুড় নিজেকে বুঝ দেয়। সেই জমির বিলি বন্দোবস্ত হবে, নতুন করে রেকর্ড হবে—এমন বিপদ মাথায় নিয়ে জন্মচাষী ঘরে থাকে কি করে ?

"খতেন চৌতিরিশ, দাগ নম্বর দুশো সতের। মেজ তরফের ফেকু রাজার তিন বিঘে একলপ্তে আর সেজোতরফের কানু রাজার পাঁচ বিঘে দুটো দাগে। খতেন সাঁইতিরিশ, দাগ নম্বর ··দখল কার ?"

আমিনবাবু চীৎকার করে আরো একবার খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর পড়ে গেল। পাশে বসা নকুড়ের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে লাঠি ভর করে হাজো উঠে দাঁড়াল। জনতা সমস্বরে হুই দিয়ে উঠল।

খিচিম্ খিচিম্ করে আরো জ্বলল। কান্দীর নিউ ফটো সেনটারের দাশবাবু ফ্ল্যাশগান আর ক্যামেরা হাতে টেবিলের ওপাশে ছুটে গেল। সমবেত জনতার আদালতে হাজো মালোর লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা স্থিরচিত্র হল।

সামনেই ছোট একটা টেবিলের মাঝখানে হ্যারিকেনটা বসানো। তার পাশে একরাশ কাগজের স্তূপ। হাজো জানে ওগুলো সব পড়চা আর দাগ-খতিয়ানের রেকর্ড। ওই কাগজে জোতদারদের কুলজী-ঠিকুজী, হাজোর মরণ-বাঁচন।

হ্যারিকেনের লালচে আলোর আড়ালে টেবিলের ওপারের মনুষ্যটির মুখ

দেখা যায় না। শুধু থেকে থেকে তার গলা পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ আগে লোকটি আলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটি তখন বলছিল, "ভয় কি ? আমরা আপনাদের পাশে আছি।"

এই আমরা মানে কারা, হাজো অনুমানে বুঝেছিল। এই আমরার মধ্যে নকুড় নেই, দয়াল কৈবত্ত নেই। তার পাশের বাড়ির ছিদাম কিংবা হাতিয়ারার মঠের আগুলি কাশেম আলিও আছে কিনা সন্দেহ। এই আমরা মানে তাঁরা। হাজো জানে তাঁরা কলকেতায় থাকেন।

হাজো খুব মনোযোগ দিয়ে তখন লোকটিকে লক্ষ্য করছিল। দু কান পেতে তার কথাগুলি শুনছিল। অন্যমনস্ক হওয়ার উপায় ছিল না। "লোকটি আজকের পুজোর ঘটের ঠাকুর, সান্ধ্য মিটিনের বিচের সভায় ধম্মরাজ বটে।"

"আমরা তোমাদের পাশে আছি।" কথাকটি হাজোর অজানা নয়। ভোটের মিটিং-এর দৌলতে কথাগুলো হাজোর জানা আছে। তাছাড়া হাল আমলে ছিনাথ ঘোষও কথাটা তাদের অনেকবার বলেছে। এই সাহাবাজপুরের পঞ্চায়েত অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, বাড়ি গিয়ে বলেছে। তা বলবেই তো! পঞ্চজনের ভোটে ছিনাথ পঞ্চায়েতের নেতা তো বটে!

কিন্তু এ লোকটি ভোটের বাবুদের মত ধুতি বা পাতলুন পরেনি। ছিনাথের মত চাষাড়ে চেহারাও নয় লোকটির। লোকটির মাথায় লাল ধুলো লাগা বারান্দাওলা কাপড়ের টুপি। পরনে ছোট হাফ প্যাণ্ট, হাফশার্টের মত কলার তোলা গেঞ্জি। পায়ে সাদা মোজা, নীল রঙের ন্যাকড়ার জুতো। হাজো ভাবে, বোঝে লোকটি কোলকাতার এবং বড় ভারি সরকারী লোক। কিন্তু হাজো সঠিকভাবে লোকটিকে কোথাও বসাতে পারে না। "পঞ্চাশ সালের জমে ওঠা সমস্ত সমস্যা লোকটি এক সান্ধ্য মিটিং-এই নিকেশ করে দিতে চায়। জমি-জিরেতের হিসেবটা এমনিই সোজা বটে। কিন্তু তা কি হয়, ধম্মরাজ ? দেখছি তো, বহুকাল ধরে দেখছি, হয় না ধম্মরাজ, হয় না!" হাজো নিজের মনেই কথাগুলো বলে। আশা করে আবার ভয় পায়। ভয় পেয়ে দুর্বল শরীরে হাজো কুলকুল করে ঘামে।

লোকটি তখন বলছিল 'একতাই বল। বলতে বলতে লোকটি একগোছা পাটের সুতলি বৃন্দাবনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "ছেঁড়ো।"

আর তাতেই বেন্দা কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে গেল। বক্তব্যে মতলব ছিল। হাজো মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়ে। না হলে বেন্দার মত জোয়ান, যে গতবারেও বিহারের কুস্তির দলের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে দু-দুটো কলসী জিতেছে, সে অমন পাটের সুতলি হাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু লোকজন যেন সাজানো জিনিসই দেখতে এসেছে। যা কিছু দেখানো হবে তাতেই বিশ্বাস করতে এসেছে। পঞ্চাশ-ষাটটা মানুষ বেন্দার কাণ্ড দেখে হই দিল। সাহেবের জয় দিল।

এই সান্ধ্য মিটিং-এ দাঁড়িয়ে হাজোরও যেন কেমন মনে হল। তার চারপাশে এই যারা ভীড় করে আছে তারা যেন জন্মান্তরের আত্মীয়। যেন তার চারপাশের

এই সব মানুষরা কখনও তার জমি কেড়ে নেয়নি, নেবে না। রাতের অন্ধকারে তার সোনালি ধানের শিষ ধারালো কাস্তের ডগায় এরা কেউ কখনো কাটেনি, কাটবে না। তুচ্ছ কারণে এরা কেউ কারো মাথার ওপর কখনো লাঠি তোলেনি তুলবে না। বর্গা সেটেলমেণ্টের সান্ধ্য মিটিংয়ের এমনি যাদু বটে। একটা একটা পরচা হাতে হাতে ঘোরে। দাগ খতিয়েন বলে, ভাগীদারের নাম ঘোষণা হয়। আর জনতা হই দিয়ে ওঠে।

আমিন চিৎকার করে বলল, "দং বর্গা, তেইশ কলম।" টেবিলের ওপর একজন ঝুঁকে পড়ে কাগজ খুঁজছে। হাজো বুকের মধ্যে বাঁধভাঙা জলস্রোতের শব্দ শোনে।

আমিন আবার বলল, "হাজো মালো পিতা ঈশ্বর অধর মালো। দং বর্গা তেইশ কলম।" জনতা আবার হই দিল।

টেবিলের ওপাশের সেই অদৃশ্য লোকটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আপনি এগিয়ে আসুন।"

সামনের দিকে চেয়ে হাজো দেখল হাঁটুর ফাঁক থেকে নকুড় মাথা তুলেছে। সামনের আবছা আলো আঁধারিতে নকুড়ের চোখ দুটো তক্ষকের চোখের মত জ্বলছে। জ্বলবে না? হাজো ভাবে; হাজার হোক জন্ম চাষীর ছেলে— জমির কথায় কোন চাষীর ছেলের না চোখ জ্বলে?

হাজোর কাঁধে হাত রেখে ছিনাথ ঘোষ বলল, "ভাইসব, এই হল হাজো মালো। আপনারা সবাই শুনেছেন, মেজ তরফের ফেকু রাজার তিন বিঘে আর সেজ তরফের কানু রাজার পাঁচ বিঘে দুই দাগে···কারো কোনো আপত্তি থাকে তো বলুন।"

সভায় কিছুক্ষণ গুঞ্জন চলে। দলে দলে ভাগ হয়ে সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে। কথাগুলো হাজো স্পষ্ট না শুনলেও অনুমান করে। অনেক কথা, যা তারা এতকাল ধরে থানায়, আদালতে, বিভিন্ন দরবারে বহুবার বলে এসেছে। ওরা কথাই বলে, আপত্তি দিতে কেউ এগিয়ে আসে না। শুধু নকুড় গুঁড়ি মেরে এক পাশ থেকে এগিয়ে আসে। তার দুচোখ লোভী খটাসের মত চকচক করছে। নাকুড় ডাকে 'বাপ গো।' তার গলা বুজে আসে।

হাজো জনতার দিকে তাকিয়ে হাসে।

"চৌহদ্দি বলো হে কত্তা।" ছিনাথ ঘোষ তাকে বলে, না সমবেত জনতাকে, হাজো ঠাওর পায় না।

চৌহদ্দির কথায় মনে মনে হাজো বাদশাহী সড়ক থেকে পীরের থানকে বাঁ পাশে রেখে মাঠে নামল। প্রথম বর্ষার জলে মাঠের মাটি সামান্য নরম, পিছল। আলপথ ধরে দক্ষিণমুখো হাঁটতে হাঁটতে হাজো দেখল আদিগন্ত বিস্তারে ইতিমধ্যেই সবুজের ছোঁয়া লেগেছে। আলপথে পায়ের নীচে মাথা তুলেছে মোথা ঘাস। দক্ষিণে জলার ধারে কটা বক সাদা বিন্দুর মত।

সামনের ব্রহ্মডাঙার ডানপাশে তিনটে জমি পরপর ছিনাথ ঘোষের জমি। হাল সনে কিনেছে। সামনের বছরে ট্রাকটর দিয়ে ডাঙাটাও ভাঙবে। ওই জমি তিনটে পার হয়ে বাঁদিকে মোড় নিলে পালবাবুর জমি। ছোট ছেলের নামে এক লপ্তে সাড়ে পাঁচ বিঘে। তারপর একা ছোট্ট পাকুড়, পুরোনো বট। রাখাল, বাগালদের ছোট আড্ডা, গোচর। তার পাশে ছোটো একটা ডোবা, সবে বর্ষার জল জমতে শুরু করেছে। হাজোকে আরো এগোতে হবে।

হাজো দম পায় না। ভোরের ভেজা হাওয়ায় শরীরে সামান্য কাঁপুনি লাগে। ভারী লাঙল, মই কাঁধে পা দুটো সামান্য টাল-মাটাল। "হেজে গেইলছ বুড়ো। খেতে-মাঠে, জলে-কাদায়, খিদেয় তেষ্টায় বড় তাড়াতাড়ি হেজে গেইলছ বুড়ো।" হাজো নিজেকেই বলে।

হাজো আকাশের দিকে চাইল। মেঘে ভরা আকাশ অনেকটা নকুড়ের পোয়াতি বউয়ের ভরা পেটের মত। মাটির সোঁদা গন্ধ, সকালের নরম আলো, নকুড়ের অনাগত শিশুর কথা ভাবতে ভাবতে হাজো কেমন যেন সোহাগকাড়া কচি ছেলের মত হয়ে যায়। ছেঁড়া গেঞ্জির গায়ে গামছাটা ভালো করে জড়িয়ে হাজো আদুরে গলায় ডাকে, "বাপুগো।"

"সে একটা সময় ছিল"—সাহাবাজপুরের পঞ্চায়েত নেতা ছিনাথ ঘোষ হাত নেড়ে বলে, "সে একটা সময় ছিল ভাই। সারা মাঠে লড়াই। ধানের লড়াই, জানের লড়াই। হাতিয়ারার মাঠ থেকে বহেড়া, সেখান থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত।" সভার লোকগুলো সে লড়াই-এর গল্প অনেকবার শুনেছে। এখন আবার শোনে। হাজো চোখ বোজে।

পুব দিকে আবির রঙ ছড়িয়ে সূর্য উঠছে। হাতিয়ারা গাঁয়ের মাটির ঘরগুলি, গাছগাছালি সেই রঙে রাঙা।

মেদিনী কাঁপিয়ে হাজোর সামনে যে জোয়ান মদ্দটা হেঁটে চলে তার হাতে পাকা বাঁশের দীর্ঘ লাঠি। হাজোর দেহে লোকটির প্রলম্বিত ছায়া পড়ে। লোকটির পায়ের দাপে মাটি কাঁপে। তার হাঁকে হাতিয়ারার মাঠে গভীর নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে। হাজো ডাকে "বাপু গো বাপু।",

ছিনাথ বলে, "লাঙল যার, জমি তার।"

হাজো তখন খুব ছোটো। গোরুর দড়ির খেঁটেও হাতে ধরতে শেখেনি। হাজোর বাপ বলেছিল, "এই লাঙলের ফাল দিয়ে মা বসুমতীর বুকে তুর নাম লিখে যাব রে শালোর ব্যাটা শালো। শালোর জমি কেনো কাগজে। কেন রে বাপু? চাষীর ছেলে, জমি চেনো চাষে, লাঙলের কাজে। জমি চেনো পিতৃপুরুষের ঘামে, ঘামের গন্ধে। শরীরের রক্তে শুঁকে দ্যাখো মাটির আঘ্রাণ পাবে; মাটিতে জিভ ঠেকাও, নোনতা ঠেকবে। জমির সোয়াদ আর রক্তের সোয়াদ একই। জমি চেনো রক্তে।"

ছিনাথ চিৎকার করে উঠল, "সেই লড়াই-এ প্রথম শহীদ অধর মালো। আজ

তারই ছেলে হাজো মালো...”

সে রাতও এমনি এক অন্ধকার রাত ছিল। সে অন্ধকার যেন ছোঁয়া যায়। আকাশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যেন অন্ধকার দুহাত দূরের পথঘাট গিলে ফেলেছে। অমন যে ক্ষিপ্রতম শেয়াল সেও এই অন্ধকারের চাপে কানামোড়ের বাঁধের ধারে এসে চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু নিরবচ্ছিন্ন ঝিঁঝিঁ এই ঘন অন্ধকারকে যেন ধারালো করাতে কেটে চলেছে।

কার্তিকের শেষ সেটা, তবুও আকাশে মেঘ ছিল। চাষীর মনে ভয় ছিল, পেয়ে হারাবার ভয়। আকাশে তারা ছিল না একটিও। এই ঘন অন্ধকারে হাতিয়ারা আর দু-তিন মাইলের মধ্যে সমস্ত গাঁ গঞ্জে লোকের ঘুম ছিল ঘন। মাঠের উত্তর কোণ থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস ছিল, সে বাতাসে ধানের গন্ধ ছিল।

সেদিন রাতে অধর মালোই মাঠের ভগবান। হাতিয়ারার তামাম মাঠের আগুলিদের সর্দার। মাঠের কোলে সন্দেহজনক ছায়া দেখলেই “কে যায় হো।” তার হাঁকে জমাট অন্ধকার ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়েছে। গেরস্থর ঘুম নাড়া খেয়েছে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন এসেছে। সে স্বপ্ন উষ্ণ জাউভাতের মত সফেদ, পবিত্র।

সে রাতেও অধর মালোর হাঁক দূরে ঝিঁঝিঁডাঙা সড়কের ওপারে বয়রা, হাতিয়ারার গ্রামবাসী সবাই শুনতে পেয়েছিল। হাঁক তো নয়, যেন বজ্রনির্ঘোষ—“কে যায় হো।”

পরদিন ঘুম ভেঙেই তুলসী তলায় ছুটে এসে যে লোকটাকে নিস্পন্দ পড়ে থাকতে দেখেছিল, তাকে এক লহমায় চিনতে পারেনি হাজো। কারণ লোকটার মুখ ছিল না। থ্যাঁতলানো মুখটাকে আড়াল করে জমাট বাঁধা রক্ত ছিল। রক্তে আর পাকা ধানের শিষে মাখামাখি হয়েছিল।

“অধর মালো জিন্দাবাদ। অধর মালো, অমর রহে।” চটাপট হাততালিতে হাজোর ঘোর কাটে।

“চৌহদ্দি বলো হে মালোর পো।” ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলে। সভাস্থলে গুঞ্জন কলরব হয়। হাজো চোখ বুজে সেই বাজপোড়া খেজুর গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাপ মরার পরদিন চারটে পুলিসের সঙ্গে হাজো সেইখানটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষেতের ওপর আলের গা ঘেঁষে তখনও চাপ চাপ জমাট বাঁধা কালো রক্ত। তারই একটা ধারা সরু হয়ে পাকা ধানের খেতে কোথা থেকে কোথায় যেন চলে গিয়েছে। ওইখানেই কি এবছর মেজ তরফের শ্যালো বসছে?

“ঈশান কোণে বাজে পোড়া খেজুর গাছ। পুবে হালদারের জমি। পশ্চিমে ইশাকের ভাগী জমি। মালিক কে জানি না, শুনেছি শহরে থাকে। উত্তরে গোবিন্দ বসাকের দু বিঘে দশ ছটাক নিজহালে। দক্ষিণে তিভঙ্গ, পরান আর গোলদারের তিনটে সরু লম্বা আলে। তারপর জলা।”

জনতা আবার সমস্বরে হই দিল। কেউ একজন দু টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল। হাজো মালোর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের কালির ছাপ পড়ল

কাগজের গায়ে।

আমিন চিৎকার করে বলল, "কাল সব মাঠে যাবা। থানাপুরী বুজারতের কাজ। মাঠেই জমির হিসেব মিলিয়ে দেব। শুধু কাগজে হবে না। দখল প্রমাণের জন্য সাক্ষী সাবুদ যেন আলের ওপর তোয়ের থাকে।"

ভোর যেন আর হয় না। সারারাত জ্বরের তাড়সে দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি হাজো মালো। তার ওপরে নকুড়ের বউটার আবার এখন তখন। ঘরের আর দুটো প্রাণীর চোখেও ঘুম আসেনি। হাতিয়ারার কারও চোখে কি ঘুম এসেছে। সকলের চোখেমুখেই নকুড়ের বউয়ের গবভোযন্ত্রণা সংক্রামিত হয়েছে। ঘোরের মধ্যে হাজো হাসে। "মেজ তরফের শ্যালো বসাতিছে।" হাজো বিড়বিড় করে বলে, নকুড়, দেখিস পামু লাগলে ওই শ্যালোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে, তোর বুড়া বাপের রক্ত, অধর মালোর রক্ত।"

মাঝরাতে স্বপ্নের মধ্যে হাঁক শুনেছে, "কে যায় হো।" শুনেই হাজো উঠেছে, "নকুড়, নকুড়।" নকুড় এসে বুকে হাত বুলিয়েছে। ফিসফিস করে হাজো বলেছে, "জমি চেনো কিসে। ঘামে আর রক্তে। ও জমিতে তোর বুড়া বাপের রক্ত আছে রে নকুড়, অধর মালোর রক্ত।"

বউ আর বাপকে বুঝ দিয়ে মাঠের দিকে যেতে একটু বেলা হল নকুড়ের। আষাঢ়ের মেঘের ফাঁক দিয়ে সকালের তেরছা রোদ্দুরে পথে গাছপালার ছায়ার জাফরি কাটা। মাঠের কাছাকাছি হতে নকুড়ের রক্তস্রোত উচ্ছল হয়ে উঠল। পা ফেলা নয়, যেন দাঁড়ের ঘায়ে দীঘির জলে শব্দ হচ্ছে ছলাৎ-ছল। নকুড়ের বুকে দাঁড়ের ঘা পড়ছে।

বাদশাহী সড়ক থেকে পীরের থানকে বাঁ পাশে রেখে নকুড় মাঠে নামল। তারপর দক্ষিণে বিলের ধার পর্যন্ত, মাঠের ভূগোল নকুড়ের রক্তে। চোখ বেঁধে দিলেও ওই সরু আলপথ দিয়ে সে বাজপোড়া খেজুর গাছটার কাছে গিয়ে ঠিক দাঁড়াতে পারবে।

প্রথম বর্ষার জলে মাটি সামান্য নরম পিছাল। মাটির ওপর চেন পড়ছে। চেনের ধার ধরে কালকের জনসভার পরিচিত মুখগুলো দৌড়চ্ছে। মাঠের হাকিম মাথায় সোলার টুপি চাপিয়ে কাজের তদারকি করছে। খেজুর গাছের কাছটিতে নকুড় একছুটে পৌঁছে গেল। মেজ তরফের জমিতে শ্যালো বসানোর কাজ বন্ধ রয়েছে। বুড়ো ফেকুরাজা আর তার ছেলে এ বছর এই তিন বিঘে নিজ চাষে নেওয়ার তালে ছিল। তার জমির ওপর দিয়ে লোহার ধাতব শব্দে চেন ছুটে চলেছে। নকুড় হাসল, বিজয়ীর হাসি।

কালকের সেই আমিন মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চৌহদ্দি বলে। জমির বর্ণনা দেয়। "খতেন চৌতিরিশ, দাগ নম্বর দুশো সতের। মেজ তরফের ফেকু রাজার এক একর দু ডেসিমেল..."

নকুড় ঘাড় নাড়ে। বড় ভালো লাগছে, এমন নিশ্চিন্ত সকাল তার জীবনে কোনোকালে ছিল কিনা নকুড় মনে করতে পারে না। জনমজুরের সকাল—দিনের শেষে পাঁচটা টাকা আর এক কেজি চালের আশ্বাস থাকল তো ভালো, না হলে যা হোক চুক্তি। দুমুঠো ভাতের চুক্তিতে এর, ওর, তার জমিতে বাড়িতে ব্যাগার খাটো। মাঠের হাকিম শোলার টুপি হাতে নিয়ে এখন নকুড়ের সামনে। হাতে বোধহয় কালকে বাপের টিপ দেওয়া কাগজ। তাকে ঘিরে সান্ধ্য মিটিংয়ের লোকগুলির অর্ধবৃত্ত।

মাঠের হাকিম চীৎকার করে বলল, "জমি চেনো কিসে ?"

নকুড় চেঁচালো "ঘামে হুজুর। বাপ, পিতামহ পিতৃপুরুষের ঘামে।"

সমবেত জনতা হই দিল।

আমিন চীৎকার করে বলল, "দং বর্গা—বর্গা দখল তেইশ কলম। হাজো মালো পিতা ঈশ্বর অধর মালো সাং হাতিয়ারা।"

জনতা চীৎকার করল, "অধর মালো জিন্দাবাদ।" মাঠের হাকিম তার কাঁধে হাত রেখে বলল "জিজ্ঞাসার দরকার নেই, তবু জিজ্ঞাসা করি, আল চেনো কিসে।"

জনতা নিস্পন্দ। নকুড়ের চোখ অনেকক্ষণই বাজপড়া খেজুর গাছের সেই কোণটিতে, যে কোণ তার বাপ তাকে আজ ইস্তক বহুবার চিনিয়েছে।

"আল চেনো কিসে ?"

আমিন বলে, "উত্তর দাও।"

আলের সেইনির্দিষ্ট কোণটার দিকে তাকিয়ে নকুড় বলে, "বুড়া বাপের রক্তে।"

জনতা হই দিল।

# কেস নং ১৬৫

দশটা দশের নৈহাটি লোকাল সাড়ে দশটাতেও শিয়ালদা না পেঁছিলে, মানুষ কী কী করতে পারে, আমি চিন্তা করলাম। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সম্ভবত সে দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরাতে পারে, মা টেরেজার দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্রের বিপরীত দিকের প্রস্রাবাগারে পেচ্ছাপ করতে যেতে পারে, ভাইটামিনের অভাবজনিত কারণে কয়েকদিনের দুর্বলতা আঠার মত শরীরে লেগে থাকলে এবং পকেটে দুটি দশ পয়সার কয়েন থাকলে লাল নীল আলো জ্বলা যন্ত্রে নিজের ওজন মাপতে পারে। আরও অনেক কিছু করা যায়— উড়াল পুলের ওপরের শোভাযাত্রা দেখা যায়; ঘুরেফিরে দুই মিনারের ঘড়ি দেখা যায়; একটু এগিয়ে গিয়ে গ্রোব-নার্শারির সামনে টবে সাজানো বোগেনভেলিয়ার শোভা দেখা যায়। যাই করা হোক, আমি ভেবে দেখলাম, সেটা হবে টাইম কীল্ করা। আর এখন, আমার কাছে টাইম্ ইজ্ মানি। মানির গুরুত্ব, তা সে যত সামান্যই হোক, যখন কম নয়, তখন—

দ্রুত হাতের ফাইল খুলে দেখে নিলাম—কাল রাত পর্যন্ত আমি আর অতসী মোটামুটি একশো চৌষট্টিটা কেস্ শেষ করেছি। কুড়ি দিনে দুশো কেসের বরাদ্দের হিসেবে দশ দিনে একশো চৌষট্টি, নেহাৎ কম নয়। ভালোই বলতে হবে, গড় পারফরম্যান্স দশের জায়গায় ষোলো দশমিক চার। শতকরা হিসেবে—সে যাই হোক, রেকর্ডটা সরকারি যেকোনো দপ্তরের তুলনায়, সবকটা পাঁচসালা যোজনার তুলনায় যথেষ্ট ভালো। এই হারে খাদ্য উৎপাদিত হলে আগামী দশবছরে, খাদ্যে নাকি আমরা স্বয়ংম্ভর হয়ে পড়েছি। তাহলে শিল্পে—প্রযুক্তিবিদের হিসেবে আমাদের স্থান বিশ্বে তৃতীয়, এতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা টেকনিক্যাল ইস্কুলগুলোর ছাত্ররাও আছে কিনা কে জানে? এক মক্কেল তো আমার টেপ্‌টা চারমাস আটকে রেখে, ওটার ওপর শিক্ষানবিশী ক'রে সেটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। নেহাৎ শালা বন্ধুর ভাই! মোটমাট লক্ষ্যমাত্রার দেড়গুণ ভাগ উৎপাদন সবসময়ই স্বাগত। কিন্তু অর্থনীতির ছাত্র

হিসেবে আমি জানি, সেটি হবার নয়। কেইন্‌স্, রিকার্ডো কিংবা স্বয়ং মার্কস সাহেবও যদি আমাদের যোজনাপর্ষদের সদস্য হতেন তাহলেও ব্যাপারটা সম্ভব হত না। এগারোটা বাজতে দশ—

তবু আমাদের উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে হবে, উৎপাদন বাড়াও এবং রপ্তানী কর। আমদানি করে উৎপাদন বাড়াও, রপ্তানী কর। রপ্তানীর বদলে—ট্রেন না অতসী। কার যে ঠিক কী হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না। মোটামুটি কতটা ট্রেন লেট হলে জনতার রোষ চাগাড় দিয়ে ওঠে, আমার জানা নেই। গত দু'বছরে আমি একবারও ট্রেনে উঠি নি। ফলতঃ শিয়ালদা বা হাওড়া স্টেশন সম্বন্ধে আমার নশিয়া না হোক কেমন যেন একটা ইয়ে আছে। এই যে গলগল্ করে লোক থেকে থেকে ভাতের ফেন উপচানোর মত উপচে পড়ছে—ব্যাপারটা আমি ক'দিন ধরে দেখছি। অতসী কতদিন ধরে দেখছে কে জানে? পোস্ট-গ্রাজুয়েটের বর্তমান বছরটা ধরলে বছর পাঁচের হিসেব পাওয়া গেল, এর মধ্যে পরীক্ষা ড্রপ করে থাকলে—সে যাই হোক, ডেলি প্যাসেঞ্জারির উপর অর্থাৎ এর সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যে'র ওপর একটা থিসিস করা যায় কিনা, অতসীকে ভেবে দেখতে বলা যেতে পারে। পুরো এগারটা—

এই ব্যাপারটাই আমাকে খেপিয়ে দিল। কাল রাত দশটার পর থেকে আজ বেলা এগারোটা। এই পঁচিশ ঘণ্টা কী ভয়ংকর আনপ্রোডাক্‌টিভ্। আমার কেসের সংখ্যা একশো চৌষট্টিতেই দাঁড়িয়ে আছে—অর্থমূল্যে একশো চৌষট্টি ইনটু দশ, এক হাজার ছশো চল্লিশ। টার্গেট পুরো দু'হাজার, কুড়ি দিনে দু'হাজার। অবশ্য অতসীর ফিফ্‌টি, আমার ফিফ্‌টি। এই অবস্থায় একটা চাকরী পেলেও আমার মাইনে এর চেয়ে বেশি হত না। হাতে আজ বাদে আরো ন'টা দিন—কেস বাকি ছত্রিশ, গড়ে দৈনিক চারটে, তবু, কমপ্লাসেন্সের জায়গা নেই। কেস্ চাই কেস্। এই মুহূর্তেই একটা কেস্ চাই—অতসী যদি নাই আসে 'আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সপ্তাহে'র কাজ কি থেমে যাবে, পৃথিবী কি থেমে যাবে! তাহলে কী দাঁড়াল—

এগারোটা পনের! মরিয়ার মত ফাইলের গিঁট খুলে আমি সামনের দিকে তাকালাম। স্টেশন চত্বরের পার্মানেণ্ট বাসিন্দারা ফিরে আসছে। আমাদের সমাজসেবী সংস্থার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, অফিস টাইম পার হওয়ার পর এরা এভাবেই ফিরে আসে। মহানগরীর এই বৃহত্তম স্টেশনের এপাশে-ওপাশে এখনও যেসব জায়গায় বেশ পাড়া-পাড়া গন্ধ আছে, মালটিস্টোরিড্ বড় একটা শিকড় গেড়ে বসে নি, সেসব জায়গায় সকালের সিফ্‌টের ভিক্ষা সেরে কেউ কেউ ফিরে আসবে বারোটা নাগাদ। যারা বর্ধমানের দিক থেকে চাল আনতে গেছে, তাদের ফিরতে আরো দেরী হবে। এমতাবস্থায় একজন মধ্যবয়স্কা ভিখারিণী আমার চাই। দ্যাখ ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভিখারিণী মেয়ে—কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্—সামনে ওই সার্বজনীন প্রস্রাবাগারের দেওয়ালে আমার একশো পঁয়ষট্টিতমা পেশাদার নিপুণতায় ঘুঁটে দিচ্ছে। নাই বা হল ভিখারিণী, মহিলা

হলেই তো—

আমি সাহস করে এগিয়ে গেলাম—এক্ষেত্রে সাহস প্রয়োজন। আমার পায়ের নীচে দিয়ে যে বিপুল জলস্রোত কলকল্ করে বয়ে যাচ্ছে তাতে শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ ভয়াবহ রোগের বীজাণু সিফিলিস থেকে টিউবারকিলোসিস; গনোরিয়া টু ফাইলেরিয়া। আর তার সঙ্গে আছে দেয়াল থেকে কাদা ও গোময়ের মিশ্রিত মিসাইল। তা সত্ত্বেও—

পিছন ফিরে স্টেশনের ঘড়িটার দিকে তাকালাম একবার; আরেকবার ঘুঁটেদানরতা রমণীর দিকে—টু বি মোর প্রিসাইস, রমণীর পেটের দিকে। পেটের দিকে তাকাবার এই শিক্ষাটা আমি অতসীর কাছে পেয়েছি। প্রোফেসন্যাল সিক্রেট-এর মত আমি ব্যাপারটাকে আগলে আছি গত দশদিন। সেই প্রথমদিনের প্রথম কেসটা—

অতসী বলল, 'নৃসিংহ ধরো ধরো···'

—'কাকে ?'

—'আরে ওই তো তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল, হাঁদারাম।'

গুরু নিতম্বিনি, তখন আমার দিকে পেছন করে সাউথ স্টেশনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কালো মেয়ে গট্‌গট্ গট্‌গট্ করে হেঁটে গেল।

কিছুটা দ্বিধার মধ্যে বলেছিলাম, 'হবে, কেসটা ?'—

'পেটের দিকে দ্যাখোনি ?'

আমি অতসীর দিকে বোকার মত চোখ করে তাকাতে অতসী বলল, 'পেটে কত ফাটা !'

—'তাতে কি ?

—'নিশ্চয় পাঁচটা ছটার মা।' ওটাই প্রথম কেস্। কেস্‌টা হয়েছিল।

ফর্ম্যাটটা এইরকম অনেকটা—

নাম : মালতীবালা দাসী

বয়স : ৩৩ বৎসর

সন্তান : ৩ পুত্র ৩ কন্যা—১ পুত্র ও ২ কন্যা মৃত।

স্বামীর নাম : আ মর ! ট্যাকাটা কিন্তু আদ্ধেক আগাম দিতে হবে।

এখানে আমি এবং বিশেষ করে অতসী 'বিশ্ব-স্বাস্থ্যসপ্তাহে'-র গুরুত্ব এবং আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা যথাসম্ভব সরলভাবে যখন ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি; তখনই এক যমদূতসদৃশ চেহারা মাটি ফুঁড়ে আমাদের চোখের সামনে হাজির হল। তাকে দেখে মালতী চীৎকার করে উঠল—'খানকির ছেলে, ট্যাকার গন্ধ পেয়েছ; অমনি হাজির হয়েছ। নিজের ইচ্ছেয় নাড়ি কেটে ক'টা টাকা পাব, তাতেও মড়ামুখো ভাগ বসাতে চাইছে।'

যাহোক যমদূতমার্কা সেই লোকটি শেষাবধি স্বামীর কলমে সই করে মালতীকে বন্ধ্যাকরণের অনুমতি দিয়েছিল। তিনদিন পর হাসপাতালে শুয়ে

শুয়ে মালতী বলেছিল, 'লোকটা রেল পুলিশের, একশো কুড়ি টাকা থেকে চল্লিশটা টাকা ওকে দিতেই হবে। নাহলে শিয়ালদার চত্বরে—'

এখানে ও ঘুঁটে দেয়, উঠোন নিকোয়। চান করে এয়োতিরা চুল শুকোয়, সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, রোদে পিঠ দিয়ে মাথার উকুন বাছে। কলতলায় কাপড় কাচে, বাসন মাজে। নিজেদের মধ্যে গল্প করে। সবচেয়ে বড় কথা পরিবারকল্যাণের জন্য—

আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার টার্গেট গ্রুপ দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষ। উত্তর কোলকাতার ছোট্ট জুরিস্‌ডিকশনের মধ্যে র‍্যানডম্‌ টেবল শুধু শিয়ালদা স্টেশনের আশপাশ দিয়ে আমার আর অতসীর বরাতে চব্বিশটা কেস্‌ বরাদ্দ হয়ে গেছে। আমি ইকনমিকস, অতসী সোসিওলজি, সুতরাং র‍্যানডম্‌ টেবলের নির্দেশ আমাদের মানতেই হবে। গত দশদিনে এই চত্বর থেকে তেইশটা কেস্‌ তুলেছি; যদিও ডাঃ পারুই বলেছেন, এর ভেতর সাতটি কেস্‌ এমনিতেই বন্ধ্যা ছিল, তা সত্ত্বেও ছুরি-কাঁচি হাতে নিয়ে তিনি তাদের নিয়মমাফিক বন্ধ্যা করেছেন। তাঁরাও নিয়মমাফিক টাকা পেয়েছে, নিয়মমাফিক যাকে যা দেবার তা দিয়েছে; কারণ তারা যে বন্ধ্যা একথা চেপে গিয়ে তারা যে অপরাধ করেছে—

এর জন্য আমাদের, আমার ও অতসীর অপরাধবোধ আধঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল। এক কাপ চায়ে ধুয়ে মুছে আমরা ফর্ম্যাটের নীচে প্রোমোটার সই করে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ কিনা সাত দশে সত্তর টাকা—

কালো টাকা নাকি সাদা টাকাকে বের করে দিচ্ছে। আমাদের টাকাও সাদা টাকা, যদিও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভারতের পরিবারকল্যাণ বাবদ বিদেশ থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে এবং আমাদের এই কেস্‌ পিছু দশ টাকায় ভারত সরকার পাঁচ এবং বিদেশীরা পাঁচ। কিন্তু এ টাকা সাদা টাকা। কালো টাকা একদিন একে বার করে দেবে। যেখানে কালো টাকা নেই—যেমন চীনে, সেখানেও পরিবারকল্যাণ—

বিদেশীরা কতটা করেছে জানি না, কিন্তু সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে এই কাজ···

ঘুঁটে দেওয়া শেষ হল। একশো পঁয়ত্রিতমা এখন হাতপ্রক্ষালণ করছেন। আমি আবার ওঁর পেটের দিকে তাকালাম। দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষের পেট কী অপার সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তবুও···

এখন আমার কাছে সমাধান পেটের দাগ, দারিদ্র্যসীমার নীচের আরো আরো মানুষের সৃষ্টির ক্ষতচিহ্ন। এবং ফলত—

আমার নজরে তিনি কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধা। ওই ওপাশে যে জনাছয় ভাঙা সান্‌কিতে খেতে বসেছে, তিনি তাঁদের কাছে গেলেন। ওদের মধ্যে একজন ওঁর কী কথা শুনে যেন, হাতে একগ্রাস ভাত নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে এদিকে তাকালো। তারপর ফিক্‌ করে হেসে বাঁহাতে ঘোমটাটা টেনে নিল। কিন্তু ওইটুকু সময়েই আমি চিনেছি, এতো···

আমার সেই সাত বন্ধ্যা নারীর একজন। জন্ম যেখানে শাসিত সেখানে ভয়

কীসের ? আর সব কিছুর উৎপাদন বাড়াও ; কিন্তু মানুষের—

'দুটির পর আর কখনই নয়'—আমি সাহস পেয়ে একশো প'য়ষট্টিতমাকে ফর্ম্যাট বার করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ক'টি ?'

আমি তাঁর পেটের দিকে চেয়ে আছি, যে পেট—

তিনি বোধ হয় লজ্জা পেয়ে কাপড় চাপা দিলেন। সেই প্রৌঢ়াকে বললেন, 'বল না দিদি।' প্রৌঢ়া একগ্রাস ভাত মুখে দিয়ে বলল, 'নেকো না বাপু, যাহোক—দুটোই হোক আর পাঁচটাই হোক, করবে তো বাপু ইয়ে! তার আবার…'

হিসেব, সংখ্যাতত্ত্ব—এর গুরুত্ব এদের বোঝানোর কোনো মানে হয় না। সপ্তম পাঁচসালা যোজনায় গ্রামোন্নয়নের বরাদ্দও যে এর ওপর কতটা নির্ভর করছে, তা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ট্রেনিং ক্লাসে মিসেস মহুয়া নাগচৌধুরী বুঝিয়ে বলেছিলেন। আমার এখনই মনে পড়ল, মিসেস নাগচৌধুরীর তিনটে বিয়ে হয়েছে অথচ তার পেটে—

"যেখানে খেতে পায় না, সেখানেই তো মা ষষ্ঠী দয়া বেশী করে, তা ধর না কেন…" প্রৌঢ়া একশো প'য়ষট্টিতমাকে বলল, 'যাক এবার তোর একটা গতি হবে…'

'ওরে মন হবেই হবে,' স্বগোতক্তি। অতসী ছাড়াই, বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় একশো প'য়ষট্টি নম্বর কেস বাগে এনে ফেলা গেছে প্রায়। এখন ফর্ম্যাট ভর্তি, বিকেলে হাসপাতালে জমা ; সন্ধ্যায় ডাক্তারের জিম্মা—বেড্ না থাকলেও ফ্লোর আছে, ফ্লোর ভরে গেলে ফুটপাত…

'ঠিকানা ফুটপাত, কি করে লিখি বলুন তো' আমি একশো প'য়ষট্টিতমাকে বললাম ফর্ম্যাটটি দেখাতে দেখাতে—'দেখুন এত কিছু লিখে ফেলেছি, শুধু আপনার নাম আর বয়স ছাড়া। নাম ছাড়া তো।…'

'নামে কি এসে যায় বাপু ?' একশো প'য়ষট্টিতমা বললেন। আর শুনেছি শেকস্‌পীয়র বলেছিলেন।—"দারিদ্রসীমার নীচের মানুষ ও শেকস্‌পীয়র" নিয়ে উৎপল দত্ত একটা প্রবন্ধের বই লিখতে পারেন। অর্থনীতির ক্লাসে দারিদ্র্যসীমা-সম্পর্কিত গোটা তিনেক পয়েণ্ট পার্টটুতে অনার্স ক্লাসে এস. বি. যা দিয়েছিলেন, তারপরে—

চোখে না দেখলে কোনো অনুমানই এতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এই ভাঙা সানকি, চতুর্দিকে ধুলো উড়ছে ; সার্বজনীন প্রস্রাবাগারের বহুদূরবিস্তৃত কলোচ্ছ্বাস—

কোলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। উড়াল পুল হয়েছে, মেট্রো রেল, চক্র রেল এবং রেল মানেই স্টেশনচত্বর, দারিদ্রসীমার নীচের মানুষরা পাতালপ্রবেশ করবে…

রামায়ণের সীতার দুটি বাচ্চা ছিল ; তারপর আর নয়। সীতা কি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন ? কোন্ কোন্ মহাপুরুষের

সন্তান কত মনে মনে ভাবতে গিয়ে হঠাৎই এসে গেল, এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীরও—

কী সমস্যাই না পোয়াতে হচ্ছে! ইউ. এন. ও. থেকে বিশ্বব্যাঙ্ক, যোজনা থেকে স্বাস্থ্যদপ্তর সবাই কী নির্লজ্জের মত দারিদ্র্যসীমার অগুণতি গোপনাঙ্গের হিসেব নিয়ে যাচ্ছে। কোন্ ছোটবেলায় শোনা; সেই যে দাসুর ঠাকুমা পূর্ববাংলার টানে বলতেন, 'কিসের লইগা বাঁচা, প্যাটটা আর···

'ওখানে কোনো রোগ আছে কিনা'—জিজ্ঞাসার রেওয়াজ আছে ফর্ম্যাট অনুযায়ী। থাকলেও নেই, না থাকলেও নেই। সমীক্ষকরা সালা দশ টাকা ঠেকিয়ে দুনিয়ার সব তথ্য যোগাড় করতে চায়; বিশেষত, এই বিদেশি সংস্থা এ থেকে যে কী সিদ্ধান্তে আসবে তা কীভাবে বৃহৎ শক্তিবর্গের কাজে লাগবে···

আমি আর কতটুকু জানি, একশো পঁয়ষট্টিতমা যা জানে তার চেয়ে শতকরা কুড়ি ভাগ বেশি। তবু এই ফর্ম্যাটে 'রিমার্কস' কলমে আমাকে কিছু লিখতেই হবে। তার আগে···

ফর্ম্যাটটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে যা পাওয়া গেল, তা সাজিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়···

নাম ঃ অতসীবালা দাসী। (এ মুহূর্তে আমার ভিতরে একটা অতসী অতসী ভাব জেগে উঠেছে, কারণ এখন বারোটা বেজে গেছে। আর একশো পঁয়ষট্টিতমা যখন নামপ্রকাশে একান্তই অনিচ্ছুক, তখনই অতসীই অবচেতনে··· যদিও সে চৌধুরী, একে দাসী লিখলাম, পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতের সমস্যা নেই, তবুও এমনটা হয়, দারিদ্র্যসীমার নীচে দাস-দাসী হয়ে যায় আর কি!)

বয়স ঃ (উনি নিরুত্তর) ২৮ বৎসর।

(লিখলাম ডাঁটো শরীর, বন্ধনহীন উচ্ছ্বাসের জায়গায় যেখানে তিনি ইয়ে তা যেভাবে অনম্র অথচ এই পরিপূর্ণতায়, তিরিশ আর পার করাই কী করে? সালা।)

ঠিকানা ঃ ১৬৫ / ২০০ এস. এস. এ্যাপ্রোচ্ রোড্ (শিয়ালদহ স্টেশন এ্যাপ্রোচ রোড, আমার দুশো কেসের মধ্যে একশো পঁয়ষট্টিতম কেস্ এমন একটা হিসেব আছে, কোন্ মদ্না আবার ভেরিফাই করবে।)

স্বামীর নাম ঃ (প্রকাশে অনিচ্ছুক) বিষ্ণু দাস (একশো পঁয়ষট্টিতমাকে যখন অতসী নাম দিয়েছি, তখন তার স্বামী হিসেবে অতসীর অগোচরে নিজের নাম নৃসিংহ—বিষ্ণুর অবতার তো, বসাবার সুযোগটা কেমন যেন ছাড়তে ইচ্ছে করল না, মাইরি। অতসী আর আমি কি সত্যিই কোনোদিন···কোথায় কি। দারিদ্র্যসীমার ক'ইঞ্চি ওপরে দাঁড়িয়ে আছি, দিন গেলে সীমার নীচে নেমে যাব কিনা···কি ফালতু চিন্তা।)

স্বামীর বয়স ঃ—৩২ বৎসর (আমারটাই দশ বাড়িয়ে দিলাম আর কি।)

সন্তান ঃ (দুই কিংবা পাঁচ যাই হোক না, তাতে কিছু যায় আসে কি। তবু আমাকে লিখতেই হবে, পেটের দাগের দিকে আলতো একটু চোখ বুলিয়ে) তিন, মৃত এক।

মাসিক আয়ঃ (যখন যা হয়, তার কি কোনো ঠিক আছে, কোনোদিন খাওয়া জোটে কোনোদিন জোটে না) মাসিক মাথাপিছু ১৮·৫০ টাকা (দারিদ্র্য-সীমাটা মাথায় রাখতেই হবে, অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে)।

বংশগত বা কোনো গুপ্তরোগ : (জিজ্ঞাসা না করেই লিখতে হবে) নাই।

এরপর স্বামীর সাক্ষর, সাক্ষীর নাম-ঠিকানা এগুলি কীভাবে লিখতে হয়, আমার অজানা ছিল না বলে আমি দ্রুত হাতে ফর্মটা ভর্তি করা প্রায় শেষ করে আনলাম। এরপরই সেই মারাত্মক কলমটি, মন্তব্য। এ সম্বন্ধে আমি এবং অতসী এতবার ব্রীফড্ হয়েছি যে প্রোমোটারের মন্তব্য, কলমটির পৃথক পৃষ্ঠাটিকে পরীক্ষার উত্তরপত্রের মত যত্ন করে আমরা ব্যবহার করেছি। প্রত্যেক কেসেই প্রথমে শুনে নিয়েছি, তারপর নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি দিয়ে মন্তব্যের ছটি-আটটি লাইন পূরণ করেছি। এই লাইনগুলিতে প্রস্পেকটিভ বন্ধ্যার সমাজমনস্কতা, পরিবারকল্যাণ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত চিন্তা সবকিছুরই টুদি পয়েন্ট উল্লেখ রাখতে হবে। সর্বোপরি এটি বিলেতে যাবে, যারা কেসপ্রতি আমাদের পাঁচ টাকা অনুদান দিচ্ছে। আমি অতসীবালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই যে অপারেশনে আপনি রাজী হচ্ছেন, এরপর তো আর ছেলেপুলে হবে না। কেন, তা সত্ত্বেও, কেন?'

'কেন আবার, টাকার জন্য,—শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রেই আমি এই উত্তরই পেয়েছি। তবু নিজের মত সেগুলিকে সাজিয়ে দিয়েছি—এত ক্রুড্ভাবে মেয়েছেলেরা টাকার কথা বললে, বিশেষত, যেদেশে মৈত্রেয়ী গার্গীর মত, সেখানে—

অন্য যুক্তি আমাদের সবসময়ই খুঁজতে হয়। আর্থিক নয় খানিকটা পরমার্থিক। টাকা মাটি, মাটি টাকা, কোলকাতায় জমির দাম যে রেটে বেড়ে যাচ্ছে, যারা মাটি কিনে রেখেছিল, তারা মাটি বেচে মফঃস্বলে চলে যাচ্ছে। মফঃস্বলে এ-মাটি টাকা আনছে, ফলত সেখানকার লোকরা রেলের সরকারী চত্বরে এসে পড়ছে। সোজা হিসেব...

তবু আমি অতসীবালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'টাকা দিয়ে কী করবে?'

'আ ম'লো, ট্যাকা দিয়ে লোকে আবার কী করে, খায়দায়, এট্টা পরনের সাড়ি কেনে, সধবা মানুষ, তা একটু আলতা সিঁদুর, কিনবে বইকি বাবা!—সেই প্রৌঢ়া বললো।

অতসীবালা এখন লজ্জা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে। দাঁত দিয়ে আঁচল কামড়ে বলল 'উহুঃ', তার সঙ্গে শরীরে মৃদু দোলানিতে সে এমন রহস্যময়ী হয়ে উঠল যে আমার ইচ্ছে হল তার বয়স আরো ছ'বছর কমিয়ে দিই। নেহাৎ কাটাকুটি হবে বলে আমি চেপে গেলাম। বললাম, 'তাহলে'?

'ব্যবসা করব।' বলে সে ছুটে কলতলার দিকে চলে গেল।

একে টাকা, তায় ব্যবসা—দারিদ্র্যসীমার নীচের মেয়েমানুষ হলেই এমন বেহায়া হতে হবে? আমি একটু যেন বিরক্তই হলাম। দারিদ্র্য নিয়ে দার্শনিকতা করতে পারি, তা বলে আমাদের দেশের দর্শন তো আর দরিদ্র নয়। যমের কাছে

গিয়ে সেই যে নচিকেতা বলেছিল—

'ব্যবসা করবে।' সেই বন্যা এবং অপারেশনের মারফৎ সরকারিভাবে বন্ধ্যা প্রৌঢ়া বলল, 'টাকা দিয়ে ও ব্যবসা করবে। কে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে কে জানে? দখ্নো থেকে সব্জি ওই হোথাকার ফুটপাতের বাজারে বেচবে। ভালো ঘরেরই তো মেয়ে ছ্যালো', প্রৌঢ়া চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে…

মন্তব্য কলম শেষ হয়ে গেল। প্রিমিটিভ এ্যাকুমুলেশন অফ্ ক্যাপিট্যাল। এই আধা-সামন্ততন্ত্রের যুগে নিজের গতরকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে উৎসর্গ করে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করে তা থেকে মার্কেনটাইল ক্যাপিট্যাল, ঠিকমত বিনিয়োগ ও সম্ভাব্য মুনাফা ক্রমশ ওই মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিট্যালে রূপান্তরিত করবে। ঠিক মুহূর্তে টাটা বিড়লা কিংবা হেনরি ফোর্ডের সমকক্ষ কোনো মহিলা পুঁজিপতির নাম মনে পড়ল না। কিন্তু অতসীর পুঁজি—

ভালো করে দেখা হয় নি চোখ মেলে, মন দিয়ে। মাত্র দশদিন এক সংগে কাজ, তার আগে তিনদিন সকলের সংগে ট্রেনিং, একশো চৌষট্টি পরিবার পরিকল্পনার যোগসূত্র তবু আমাতে অতসীতে, অতসীতে আমাতে কোনো কল্পনার যোগসূত্র—

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, তবুও—

অতসী এলো না, নৈহাটি লোকাল কি এখনও আসে নি?

বিকেল থেকে সন্ধ্যের মুখটায় এই সময় কোথা থেকে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া দিতে থাকে। এমনকি শিয়ালদা স্টেশনেও…

ভীড়ের মধ্যে দুজনে যেন যথেষ্ট কাছাকাছি নেই বোধ হয়, অতসী নৈহাটি হয়ে যেন কোথায়, কোথায়…ইস্ ঠিকানাটাও জানা হয় নি। জানতে হবে…

দশদিন একশো পয়ষট্টির পরিবার নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে করতে অতসী সম্ভাব্য কোনো পরিবারের কথা ভেবেছে কিনা! জানতে হবে…

দারিদ্রসীমার দুইঞ্চি ওপরের লোকেরা অর্থনীতি বা সমাজনীতিতে পোস্ট-গ্রাজুয়েট করতে করতে কী ভাবতে পারে! আমাদের কি কোনো প্রিমিটিভ্ এ্যাকুমুলেশন নেই? তাহলে পুঁজি কী করে তৈরী হবে, বাঁচার পুঁজি, অতসীকে বাঁচাবার পুঁজি? কে দেবে? বিশ্বব্যাংক না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক!

এসব ভাবনার সংগে জনস্রোত আমাকে ঠেলে ঠেলে শিয়ালদা মেন প্ল্যাটফর্মের দিকে নিয়ে চলে। একবার এনকোয়ারিতে খবর নিতে হবে, নৈহাটি লোকাল কি আজ সারাদিনই আসে নি? অতসী আজ আসতে পারে নি, কাল পারবে তো?

এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। বিপরীত দিক থেকে জনস্রোত এখন ঘরমুখী। সারাদিনে আর একটিও কেস্ হয় নি—সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫-৩০ টা পর্যন্ত আমার রোজগার মাত্র দশ টাকা। মাত্র একটি কেস দিয়ে আমার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ভারতের অর্থনীতি তৃতীয় বিশ্ব এবং সম্ভবত ইউনিসেফ্‌কে

আমি সাহায্য করেছি। তবু ওই সামান্য সামান্য করেই···

আমি একশো পঁয়ষট্টি অর্থাৎ অতসীবালার কাছে ফিরে এলাম। অতসীবালা মোটামুটি তৈরী—হাসপাতাল কাছেই। সেখানে মন্তব্য কলম বাদে প্রথম পৃষ্ঠাটা পুরোপরি জমা দিতে হবে। অতসীবালার নিজস্ব কনসেন্ট, আঙুলে টিপ্ লাগিয়ে তুলে নেওয়া হবে—আইডেনিটফায়ার আমি। হেলথ এ্যাসিস্টেন্ট আমার কাগজে একটি ছাপ্পা মেরে সেটি আমাকে ফেরত দিলে তারপর আমার প্রোমোটারের ভূমিকা পুরোপুরি শেষ হবে। তারপর...

অতসীবালা ছোট পুঁটুলিটা কোলে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সেই প্রৌঢ়া কোথা থেকে দৌড়ে এসে বলল, তিনদিনেই ফিরে আসিস বৌ। অতগুলো ছানা পোনার ঝক্কি আমি বেশিদিন সামলাতে পারব না। অতসীবালা শিয়ালদা স্টেশনের নিয়ন আলোকসজ্জা পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল। পিছনে পিছনে আমি। স্পেশাল ক্যাম্প কাছেই, কাজেই...

'দেখতে পাচ্ছেন ডক্টর, আমরা এই স্বেচ্ছাসেবক-সংস্থার ইয়েরা পরিবারকল্যাণ নিয়ে শিয়ালদা চত্বরে কেমন একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করেছি, আর তার ফলে...'

ডাক্তার আমার কথায় কান না দিয়ে অতসীকে বলল, 'পাশে গিয়ে শুয়ে পড়।' অতসীবালা বেঞ্চিতে আমার পাশে পুঁটলিটা রেখে শুতে গেল। হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে দরকারি কাগজ ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আজ মোটে একটা? শিয়ালদা কী পুরোপুরি ইয়ের আওতায়···'

'আনার জন্য অনেকেই তো পরিকল্পনা করছেন—মা টেরেজা, আমাদের মন্ত্রী প্রশান্ত শূর, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, তারপরেও যদি···'

'ছোটলোকদের যদি লোভের সীমা না থাকে তো আমরা আর কী করতে পারি?' ডাক্তার পর্দা সরিয়ে বেশ রাগতস্বরে এদিকে এগিয়ে এসে কথাটা কাকে বলল, আমাকে, না অতসীবালাকে। আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল, 'টার্গেট গ্রুপকে আপনারা ছুঁতে পারছেন না—এতো এর আগে তিনবার···'

'আমি টাকার ভাগ দিয়েছি, সব শালোর ছেলেকে ··'

—'মুখ খারাপ কোরো না', আমি অতসীবালাকে বললাম। আমার রাগও হচ্ছিল, সারাটা দিনে একটিমাত্র কেস্—আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসপ্তাহ নিয়ে অতসীবালা এরকম ছেনালি করবে···

'এটা নতুন নয়, আমি প্রথম দেখেই বুঝেছি, চেনা চেনা।' খসখস করে কাগজ লিখতে লিখতে বলল, 'কতবার? তা···'

'একশো বার হবে, হাজারবার হবে।'—অতসী চীৎকার করে বলল। 'তোমাদের যা পাওনাগণ্ডা বুঝে নাও। আমারটা আমায় দাও, শুয়ে পড়ছি। ও ছুরি কাঁচিও যা, ইস্টিশানের শেয়াল শকুনগুলোও তাই। থোকে একশোটা টাকা পাব বলে···'

অতসীবালাকে ঘিরে ছোটখাটো জটলা তৈরী হয়ে গেল নিমেষে।

ডাক্তার চেঁচিয়ে বলল, 'এভাবে বাঁচবে; বাঁচতে পারে! শালা, শরীরে এক-

ফোটা রক্ত নেই, ব্লাডপ্রেসার…'

'আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসপ্তাহে এটা কোনো ইস্যুই হতে পারে না। টার্গেট-পূরণ করতেই হবে। তা নাহলে।'

'কী হবে? আপনি টাকা পাবেন না, আমি পাব না, মাগীটাও পাবে না—'

'এছাড়া আর কী? এই শালা টার্গেট গ্রুপ। লোকে যদি জানে…'

জি. ডি. ও. দুজন কনস্টেবল (স্পেশাল ক্যাম্পে নিযুক্ত) আরো কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী ভিড় সরিয়ে দেয়। লোকজনের ভীড় হাল্কা হতেই সবাই অতসীবালার দিকে তাকায়। অতসী সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, সবশেষে আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি ডাক্তারকে বোঝালাম, 'দেখুন, সারাদিনে একটি মাত্র কেস, সেটাও যদি—বেচারি বড় আশা করে এসেছে। টাকা ক'টা পেলে দক্ষিণ থেকে সব্জি এনে…'

ডাক্তার হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে একপাশে সরে গেল। আমি অতসীবালাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে আশ্বাস দিলাম, 'সব ঠিক হয়ে যাবে…'

'অগত্যা সবাই যখন বলছেন'—ডাক্তার বলল। এবং অতসী এই সময় সকলকে চমকে দিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। আমরা তিনজনেই ওর দিকে ঘুরে তাকালাম আর ও তখন চোখ মুছতে মুছতে…

বেডের ধারে পা দোলাতে দোলাতে অতসী চুয়াত্তর সালে ওর গ্রামের সেই অপারেশন্ টিউবেকটমির রোমহর্ষক বিবরণ দিতে লাগল, 'পেটে তখন অষ্টম গর্ভের সন্তান। বড়ো পয়মন্ত হয় বাবু, অষ্টম গর্ভের সন্তান…'

'আমাদের কেষ্টঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তাই না, নাকি ভুল বললাম।' ডাক্তার বলল, 'তবে শালা আটবার গর্ভোযন্ত্রণা কী করে পোয়ায় বাপু, জানি না। আমি হলে তো…'

'কিছুই করতে পারতে না বাবু, আমার মুখে তখন কাপড় চাপা দেওয়া, চ্যাং দোলা করে একটা গাড়ীতে, আমার মিনসেও দলের মধ্যেও ছিল, আমি ওটারে মারতে চাই নি। অন্ধকার রাত, আমার বড় ভয় করে ডাক্তারবাবু। সেই প্রথমবার…'

হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। করিডর দিয়ে কোনো হোমড়াচোমড়া হেঁটে আসছিলেন দলবলসহ। অনেকগুলো জুতোর ঘসটানি, গলার আওয়াজ। কে যেন চিৎকার করে বলল 'আলো কই?' তারপর অন্ধকারেই তিনি বলে চললেন, 'ভারতবর্ষের শতকরা ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে; তাদের মধ্যে টার্গেট কাপল

ভট্‌ভট করে জেনারেটার চলতে শুরু করল। আমার আজকে আর কিছু করার আছে কি, কালকের কথা ভাবা ছাড়া। আমি ডাক্তারকে বললুম, 'তাহলে ডাক্তার…'

রাত আটটাতেও স্টেশানের সামনে উড়াল পুল থেকে মৌলালির মুখ পর্যন্ত পেল্লায় ট্রাফিক জ্যাম। এটাও কি টার্গেট গ্রুপের জন্য…

রাস্তায় রঙচঙে ব্যানার টাঙানো। একটা ব্যানারেও অতসীবালার চেহারা নেই, ডাক্তার বলছিল, 'রক্ত নেই, ব্লাডপ্রেসার…'

কালকে বাড়াতেই হবে, কেস আসুক না আসুক। কাল তো মৌলালির মুখটা এইখান থেকে। ডানদিকে ঝোপড়ার বদলে টিনের ঘর। এরি মধ্যে অনেকে সেজেগুজে ফুটপাথের এপাশওপাশ দাঁড়িয়ে গেছে। অতসী, যূঁই, মালতী—করপোরেশান্ ওদের জন্য দোকানঘর খুলে দিয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা হাসপাতালের দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে। টার্গেট গ্রুপ…

ভিজছে; ঝিপ্‌ঝিপে এই বৃষ্টিতে সারা কোলকাতা ভিজছে!

# সাতকাহন

এক : বিশ্বব্যাংকের ঝটিকা সফর

শ্রীযুত ডব্লু ডব্লু রিচার্ডসন যে বাংলাদেশ থেকে ইসলামাবাদ যাবার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন এবং দুদিনের ঝটিকা সফর শেষ করে অল্পক্ষণের জন্য দিল্লি ছুঁয়ে—তারপর ইসলামাবাদ রওনা হবেন, একথা দিল্লির তো জানা ছিলই না; কলকাতা কর্তৃপক্ষও ঘুণাক্ষরে ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেনি। তবু শেষ মুহূর্তে প্রোটোকলের সব নিয়মকানুন রক্ষা করে বিশ্বব্যাংকের উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন দলটিকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা জানানো গেছে বলে দিল্লি ও কলকাতা উভয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

এখন সেই সমীক্ষক দলটিই ধাপা, ট্যাংরা ও বিধাননগর পরিক্রমা শেষ করে দ্বিপ্রাহরিক বড়বাজারী ব্যস্ততার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে। স্ট্র্যাণ্ড রোড, হাওড়া ব্রীজ এ্যাপ্রোচ, ব্রাবোর্ন রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড নিয়ে এই বিশাল সাতমাথা বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষার বস্তু ছিল গত তিন দশক। শিয়ালদহর উড়াল পুল তাঁরা দেখেছেন—এখন হাওড়ারটি দেখবেন বলে এসেছেন। ওঁদের সঙ্গে দিল্লি ও কলকাতার দুই প্রতিনিধি যথাক্রমে টি. এম. এস. রামানুজম এবং অমিয়কান্তি খাসনবীশ যথাবিহিত লেপটে রয়েছেন। এঁরা দুজনেই এঁদের গাইড এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের লিয়াজঁ অফিসার, সংযোগরক্ষক।

এই দলটির সঙ্গে আরও যে চারজন সদস্য আছেন, তাঁদের পরিচিতি না দিলে দলটির গুরুত্ব বোঝা যাবে না।

প্রথমেই বলতে হয় ইতালি থেকে আগত বিশ্বখ্যাত বাস্তুকার শ্রীযুক্ত পাসকোলির কথা। ইনি উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাস্তুসমস্যা নিয়েই পড়ে আছেন, গত বিশ বছর। আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশ কিছু নগরের পরিকল্পনাও এঁর হাতে তৈরী। ইনি উন্নয়নশীল দেশের স্যাটেলাইট টাউনশিপের একজন মুখ্য প্রবক্তা। তিনি কলকাতার পরিপার্শ্ব দেখে তিলোত্তমাসম্ভব এই শহর সম্বন্ধে ফতোয়া দেবেন বলে এখানে এসেছেন।

তারপরেই আসে সুইডেনের জনস্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ ডাঃ গান্-এর কথা।

ইনি উন্নয়নশীল দেশের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে একজন অথরিটি—সম্প্রতি পরিবার কল্যাণের বিশেষ বিশ্বব্যাংক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছেন। ভারতে পরিবার কল্যাণের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বেশ আশাবাদী। শোনা যায়, এঁর সুপারিশেই একবিংশ শতকে নিরাপদে ল্যাণ্ড করা ইস্তক বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ও আরো স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশ ভারতের পরিবারকল্যাণ কর্মসূচীকে যৎপরোনাস্তি মদত দিয়ে যাবে।

দলটিতে মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ এরিকসন্ কিংবা পরিসংখ্যানবিদ কানাডার হিউবার্টের ভূমিকাও কিন্তু গৌণ নয়। প্রকল্পের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানের ম্যাজিক সম্পূর্ণ এঁদের মুখাপেক্ষী।

আজকের কর্মসূচীর শেষভাগে এই গোটা দলটা শ্রীযুত ডব্লু. ডব্লু. রিচার্ডসনের নেতৃত্বে এখন ঠিক উড়াল পুলের পশ্চিমদিকে, স্ট্র্যাণ্ড রোড ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে। গলায় ঝোলানো দূরবীনটাকে চোখে সাঁটতে সাঁটতে রিচার্ডসন সাহেব একটু পেছিয়ে গেলেন। তাঁর গায়ে গায়ে লেপ্টে লিয়াজঁ অফিসার রামানুজমও। আর ঠিক সেই সময়েই ঘটনাটি ঘটল।

## দুই ঃ একটি দুর্ঘটনা

ঘটনাটি ঘটল। ঘটবে, এমন একটা আশংকা কলকাতা পুলিশের তিন সার্জেন্ট, যাঁরা আরো জনা বারো কনস্টেবল-সহ এই ভি. আই. পি. দলটিকে কর্ডন করে রেখেছিলেন, তাঁরাও কল্পনা করতে পারেন নি।

এই বিশেষ দলটির জন্য রাজভবন বা মহাকরণের রাস্তাটি পাইলট কার হুটার্ বাজিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকটা ফাঁকা করে ফেলেছিল। কিন্তু বাকি ছয় মাথায় একটা দম আটকানো ট্র্যাফিক জ্যাম কোনো ভাবে ছাড়ানো, অন্তত এই পুলিশ দলটির পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্ভবত ওপর থেকে সেরকম কোনো নির্দেশও ছিল না।

আর এই সামান্য ত্রুটির সুযোগে কোথা থেকে চকিতে একটি চিটেগুড়বাহী ঠেলা হুড়মুড় করে এসে পড়ল—ঠিক যেখানে শ্রীযুত রিচার্ডসন দূরবীন দিয়ে এই সাতমাথা নিরীক্ষারত এবং লিয়াজঁ রামানুজম পুরোপুরি তথাগত। "সামাল, সামাল" রব দিয়ে ঠেলাটি সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর খেলনা-ঢেঁকির একপ্রান্তে দোল খাওয়ার ভঙ্গিতে এক শীর্ণ ঠেলাবাহক ঠেলাটির একপ্রান্তে দিব্যি ঝুলে পড়ল। তার সংক্ষিপ্ত কাপড় কোমর থেকে খুলে শূন্যে পর্দার মত এক লহমা ভাসে। আর এসময় সম্ভবত তার গুহ্যপ্রদেশ প্রকাশ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল বলেই, পাশে অপেক্ষারত কনস্টেবল অমোঘ লক্ষ্যে দুটি অনিবার্য রুলের গুঁতো কষায়। দোদুল্যমান লোকটি ধুপ করে রাস্তার ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

এটিকে একটা জবর রসিকতা বলে উপেক্ষা করলেও, ঠেলার সামনের দিকে,

অর্থাৎ ঢেঁকির যেদিক মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে, সেইদিকে নজর না দিয়ে কলকাতা পুলিশের ঝানু সার্জেন্টদের উপায়ান্তর ছিল না।

ঠেলাটির সামনের দিক থেকে গোটা তিনেক চিটেগুড়ের টিন ছিটকে রাস্তায় পড়েছিল। দুটির মুখ ভেঙে গিয়ে ঘন সিরাপের মত লাল চিটেগুড় রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তার স্বাভাবিক ঢাল খানাখন্দ অনুযায়ী প্রার্থিত বিস্তার লাভ করছিল। ঠেলার সামনের জোয়ালটি যে বৃষস্কন্ধ লোকটির কোমরে চাপানো ছিল—তার নিম্নাঙ্গ তখনো সেই জোয়ালের নিচে। ঠেলাটিকে প্রাণপণ চাগাড় দিয়ে তার থুবড়ে পড়া প্রান্তটিকে তুলে ধরার প্রয়াস সে চালিয়ে যাচ্ছিল।

স্বভাবতঃই চিটেগুড়-বোঝাই ঠেলার ওজনের সঙ্গে এই মানুষটির বৃষস্কন্ধ হলেও, ওজনের তুলনা চলে না। তার প্রশস্ত বুকে যতটা শ্বাস ধরে তা টেনে নিয়ে—"তেরী মাকি…" বলে সে একটা শেষ হেঁচকা দেয় এবং তাতেই—প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছে, তার নাক মুখ কান দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত পড়ে।

এটি দুর্ঘটনা এবং কলকাতা পুলিশ তাদের স্বাভাবিক তৎপরতায় এটি রোধ করার চেষ্টা করে—জনা চারেক কনস্টেবল অচিরেই সেই ঠেলাচালককে তারপর যা যা করণীয় সবই করে। আর এই কর্তব্যকালে চিটেগুড়ের আরো দুটি টিন কক্ষচ্যুত হয়—রাস্তায় পড়ে, ভাঙে। চিটেগুড় গড়ায়—গড়িয়ে চলে—এসব রাস্তার খানাখন্দ এবং স্বাভাবিক ঢাল অনুযায়ী চিটেগুড় খোয়া মাটিতে লেপ্টা-লেপটি হতে হতে বিস্তার লাভ করে।

বলাই বাহুল্য, এই দৃশ্য বা দৃশ্যাবলী বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষক দলটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শ্রীযুক্ত রিচার্ডসন দৃশ্যাবলীর কয়েকটি শট্ নেন। দূরবীনের বদলে এসময়ে তাঁর গলায় একটি মূল্যবান এস. এল. আর ক্যামেরা শোভা পাচ্ছিল। আর এই ক্যামেরা নিয়েই গোল বাধল।

## তিন : এস্. এল. আর. ক্যামেরা ও জনতা

ক্যামেরা নিয়েই গোল বাধল।

কলকাতা পুলিশের তিনজন সার্জেন্ট এবং জনা বারো কনস্টেবল, যারা জায়গাটিকে কর্ডন করে রেখেছিল—তাঁরা আদপেই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি।

আসলে প্রোটোকলের নিয়মানুযায়ী গোটা দলের নেতৃত্ব দেবার জন্য পুলিশের একজন ডি. সি. এ. সি. অথবা ইন্স্পেকটরের অভাব খুবই অনুভূত হচ্ছিল। তাঁরা হয়ত ছিলেনও—কিন্তু কি ভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল এই দশমিনিটে তাঁরা সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন—সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুদূরে দাঁড়ানো একটি ওয়্যারলেস্ ভ্যান থেকে সংকেতবার্তা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। কারণ, পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। কী করা উচিত ভাবতে যতটা সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক দ্রুততার সঙ্গে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

চিটেগুড়বাহী ঠেলাটির দুর্ঘটনার পরে ইতিমধ্যে রাস্তার সর্বদিকেই একটা

জনতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ঠেলার চাপে বিধ্বস্ত সেই বৃবক্লুঙ্ক লোকটি সহ পুলিশের ছবি এবং তারপরই চারপাশ থেকে ভনভন্ করে মাছির মত এসে পড়া জনাপঞ্চাশ কাচ-কাচা, ছোঁড়া-ছুঁড়ি, বুড়োবুড়ির ছবি। ওরা এসেছিল ভাঙা সানকি হাতে, টিনের কৌটো হাতে। চিটেগুড় প্রত্যাশী, লোভী চোখমুখ, আকুপাকু। রিচার্ডসনের এই দুটি শটই জনতাকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মার্কিন সোস্যাল অ্যানথেপলজিস্ট এরিকসন পরে একটি সাময়িকপত্রে সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন—আসলে এই দৃশ্যে এমন এক কনট্রাস্ট ছিল, যা কিনা গোটা সভ্যতার ইনহেরেন্ট কনট্রাস্ট। বিধ্বস্ত ঠেলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল ইণ্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভেলাপমেন্টের দুটি বিশাল সাদা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি। চারজন হোয়াইটের পাশে, র‍্যাদার পাদদেশে প্রবহমান চিটেগুড়ের স্রোতে নিগ্রয়েড্ শ্রেণীভুক্ত তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি—এরা সকলেই উড়াল পুলের নিচে ঝোপড়িজাত এবং এক অন্য সমাজ ব্যবস্থার শরিক আর কলকাতা সেসময়ে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে গলছে, জ্বলছে। ওই গরমে মাথা গরম কিছু ছেলে ছিল জনতার মধ্যে। তাদেরই প্রতিভূ হবে হয়ত, তিনটি ছেলে পুলিশের দুর্বল বেষ্টনী ভেদ করে রিচার্ডসনের এস. এল. আর ধরে হ্যাঁচকা টান মারে। কোনো স্লোগান ছিল না—কোনো প্রস্তুতি ছিল না—শুধু একজন প্রাকৃত ভাষায় বলেছিল "শালা মাজাকির আর জায়গা পাওনি—ফটো মারাতে এয়েচো।"

অবস্থা সামাল দিতে খাসনবীশ বলেছিল, "বিদেশী অতিথি ভাই, দে আর ট্যুরিস্টস······" তার অসমাপ্ত কথার মধ্যেই তার পেটে একটি ঘুষি পড়ে এবং একই সুরে আরেকজন বলে ওঠে "চামচেগিরির জায়গা পাওনি শা—পুরো ভরে দেব।"

এরপর পুলিশের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। বার্তা পেয়ে বা না পেয়ে সাতমাথার একটি মাত্র খোলা মাথার দিক থেকে দ্রুত দুটি কালো গাড়ির আবির্ভাব ঘটে। চতুর্দিকে কর্ডন, সার সার লাঠি ঢাল ইট, বোতল ভাঙা—দুমাথায় দমবন্ধ ট্র্যাফিকে আটকে পড়া হরেক যানবাহনের পরিত্রাহি আর্তনাদ, কাচ ভাঙার শব্দ—চিটেগুড়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়া বেসামাল কিছু মানুষ—এক কুরুক্ষেত্র, প্যানডিমোনিয়াম।

এরই ফাঁকে রামানুজম্ এবং খাসনবীশ কোনোমতে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষক দলটিকে গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে, সোজা পাইলট কারের পিছু ধরে।

ছটারের তীব্র আর্তনাদে ওই দৃশ্যে দ্রুত যবনিকা নামলেও, দুটি মাথায় ট্র্যাফিক জ্যাম ছাড়াতে তারপরেও সাড়ে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে।

স্বস্তির শুধু এইটুকু যে সমীক্ষক দলটির সকলেই সুস্থ ছিলেন এবং শ্রীযুত রিচার্ডসনের এস. এল. আর. ক্যামেরাটিও খোয়া যায় নি, শুধু ক্যামেরার স্ট্র্যাপটি ছিঁড়ে গিয়েছিল।

চার ঃ বিলম্বিত মধ্যাহ্নভোজ ও কিছু টেবল্ টক্

ক্যামেরার স্ট্র্যাপটি ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে, রিচার্ডসনের খুব একটা খেদ ছিল না কারণ ক্যামেরাটি এবং সর্বোপরি লিভিং অর্থাৎ কিনা জীবন্ত শট্গুলি বেঁচে গিয়েছিল।

পরিসংখ্যানবিদ হিউবার্ট এবং সমাজতাত্ত্বিক এরিকসন্-ও একমত ছিলেন যে পরবর্তীকালে প্রোজেক্টরের সাহায্যে ছবিগুলিকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করার একটা অবকাশ আছে।

পাঁচতারা-আতিথ্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বিশ্বব্যাংক দলটি দ্রুত তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরে পায়। কিছু আগে চিলড্ বিয়র তাদের বিলম্বিত মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী ক্ষুধা তৈরী করেছিল। কর্তৃপক্ষ সবিনয়ে তাঁদের কিছু ইণ্ডিয়ান ডেলিকেসি পরিবেশন করেছিলেন এবং এই প্রতিনিধি দলটি থেকে থেকেই 'সাধু, সাধু' ধ্বনি দিয়েছিলেন।

পাসকোলি কিছু টিনড্ ফুড্কে শাশ্বত ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক বলে মন্তব্য করেছিলেন। কানাডার হিউবার্ট জানালেন, ভারতীয় 'কারি', কানাডা ও ইউ কে-র খাবারের বাজার, রেস্তোঁরা কিভাবে জয় করেছে। কে. সি. দাসের রসগোল্লা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন খাসনবীশ। এবং ইনডিয়ান সুইট্সের প্রচারকল্পে টাগোরের অবদানের কথা বললেন পাঁচতারা হোটেলের ম্যানেজার। রামানুজম দক্ষিণ ভারতীয় দহিবড়া, ইড্লি, দোসার সর্বভারতীয় বাজার এবং রপ্তানি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন। জানাতে ভুললেন না, ভারতের বিভিন্ন মেট্রোপলিসে এখন চার চাকার ঠেলাগাড়িতে দাক্ষিণাত্যের ওই 'ডেলিকেসি' খাদ্যরসিক মহলে কী পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সুইডেনের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এই চমৎকার পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের খাদ্যাভ্যাস এবং তৃতীয় বিশ্বের ক্যালোরি ইনটেক্ সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব দিলেন। আর এই প্রসঙ্গে দুর্ঘটনায় আহত সেই বৃষস্কন্ধ লোকটির প্রসঙ্গ এসে গেল। লোকটির তাগদ প্রশংসনীয়, এবিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন। লোকটির চেহারায় আন্তর্জাতিক ভারোত্তলকদের কিছু কিছু সম্ভাবনাও ছিল। ভারত এথ্লেটিক্সের ময়দানে এত পিছনে পড়ে আছে বলে রিচার্ডসন একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু খাসনবীশ যখন জানালেন বৃষস্কন্ধ লোকটির দৈনিক খাদ্য তালিকায় গোটা ছয়েক আটার রুটি, পঞ্চাশ গ্রাম ডাল এবং একশো গ্রাম ছাতু ছাড়া অন্য কিছু থাকার সম্ভাবনা নেই, তখন পরিসংখ্যানবিদ্ হিউবার্ট রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কারণ ক্যালোরি মূল্যে ঠেলাচালকটির ইন্টেক জীবন ধারণের উপযোগী কাম্য ক্যালোরি মূল্যের এক পঞ্চমাংশও নয়।

শ্রীযুক্ত রিচার্ডসন্ বললেন এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ উন্নত দুনিয়ার হিতার্থে বুভুক্ষু মানুষের এই ব্যাক্লগকে একবিংশ শতাব্দীর আগে মুছে না ফেলতে পারলে গোটা সভ্যতার ভবিষ্যৎই বিপন্ন হতে পারে।

মধ্যাহ্নভোজনের আসরে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও

এ বিষয়ে একমত হলেন যে, সভ্যতার ভবিষ্যৎ এক 'ভিসাস, সার্কেল' বা পাপচক্রে পাক খেয়ে মরছে।

সুইডেনের স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ এই উপলক্ষে অনিয়ন্ত্রিত জন্মহারের সমস্যার প্রসঙ্গটিও এনে ফেললেন এবং চীন তার প্রোডাক্শন ব্রিগেড থেকে শুরু করে প্রোডাক্শন টিম পর্যন্ত সর্বব্যাপী জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্যাম্পেন চালিয়ে কীভাবে একদিকে কৃষির প্রাথমিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়ে চলেছে, অন্যদিকে মার্কিন সহায়তায় শিল্পায়নের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরলেন। বলাই বাহুল্য, পরিসংখ্যানবিদ হিউবার্টের সাহায্য না পেলে তাঁর বক্তব্য সকলের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে উঠত না।

সমাজতাত্ত্বিক এরিকসন যখন "এশিয়ান মোড অফ্ প্রোডাকসন" প্রসঙ্গে এসে পড়লেন, তখনই শেষ রাউণ্ড স্কচ্ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল।

মোরাদাবাদী কাজ করা গামলার স্ফটিক স্বচ্ছ বরফে স্নিগ্ধ হতে হতে টেবিলে স্কচ হুইস্কির দুটি জাম্বো বোতল এসে হাজির হল। সোল্লাসে সকলেই শেষবার চিয়ার্স এবং উইশ করলেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠক নির্ধারিত ছিল। যদিও বিশ্বব্যাংকের এই ছোট কনটিনজেণ্ট সব ব্যাপারে কথা বলার অধিকারী নয়, তবুও এঁদের মতামত বা সুপারিশ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে শুরু করে সর্বত্রই যে একটা বিশেষ গুরুত্ব পাবে, এমন একটা ধারণা সরকারী মহলে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল। ফলতঃ দলটি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে জনসংযোগ বিভাগের তৎপরতায় আধঘণ্টার জন্য এই সাংবাদিক বৈঠক, রিচার্ডসনের অনুমতি নিয়েই নির্ধারিত ছিল। বিকেল ছটা বিয়াল্লিশ মিনিটে একটি বিশেষ প্লেন বিশ্বব্যাংকের এই দলটিকে নিয়ে দিল্লীর পথে উড়ে যাবে।

## পাঁচ : সাংবাদিক বৈঠক

"বিকেল ছটা বিয়াল্লিশ মিনিটে একটি বিশেষ প্লেন বিশ্বব্যাংকের এই দলটিকে নিয়ে দিল্লীর পথে উড়ে যাবে"—প্রেস্ সেক্রেটারি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বললেন ; "সেজন্য আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা কেবল সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ প্রশ্নের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবেন।"

সংবাদিকরা অভ্যাসবশেই একটু হৈ হৈ করলেন—একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষক দলের সঙ্গে মাত্র আধঘণ্টার এই বৈঠকে যে সাংবাদিকরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেন না, সেকথাও বললেন।

পাঁচতারা হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলটি কানায় কানায় পূর্ণ—বৈঠকে কাজু-বাদাম ও কফি বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাথমিক যোগাযোগের পর প্রশ্নোত্তরের পালা শুরু হল।

প্রশ্ন : আপনাদের এই সমীক্ষক দলটির কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : দলনেতা হিসেবে আমি বলতে পারি, এটি নির্ধারিত সফরসূচীতে

না থাকলেও আমরা এই সফরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি।

প্রশ্ন : দেড়দিনের এই সফরসূচীতে আপনারা কি দেখলেন?

উত্তর : আমরা ধাপা, ট্যাংরা, বিধাননগর, শিয়ালদহ ও হাওড়ার পুল দেখেছি।

প্রশ্ন : এই জায়গাকটি দেখে আপনাদের কি ধারণা?

উত্তর : দলনেতা হিসাবে, দলের সকলের হয়ে আমি বলতে পারি কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।

প্রশ্ন : কী দেখে আপনাদের এই ধারণা হল—যদি দয়া করে বলেন—

উত্তর : ধাপার বিস্তৃত এলাকাকে নগর উন্নয়নের আওতায় আনা হয়েছে। বস্তি উচ্ছেদ অভিযান চলছে। অগ্রগতি ভালোই—তবে আমরা জেনেছি এ নিয়ে একটা পলিটিক্যাল গেম চলছে। বাট উই নো, দে আর অল পার্ট অফ দা ডেমোক্রেটিক প্রসেস। জবরদখল বস্তী ভাঙবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে—আবার জবরদখলকারী আসবে; আবার···অ্যাণ্ড দিস্ ইজ্ এ প্রসেস।

প্রশ্ন : এই জবরদখলকারী কারা?

উত্তর : ওয়েল, দলনেতা হিসেবে, আমি পরিসংখ্যানবিদ হিউবার্টকে অনুরোধ করব, এ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক পরিসংখ্যান দিতে।

হিউবার্ট জানালেন—তাঁর পরিসংখ্যান প্রভিশনাল। ১৯৮১ সালের আদমসুমারি সম্পর্কে তিনি ততটা নিশ্চিত নন। তবু যেটুকু পাওয়া গেছে—কমপিউটারে প্রাপ্ত সেই ফলটুকু তিনি সাংবাদিকদের জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। হিউবার্ট বললেন, "কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে আগত চৌদ্দ লক্ষ লোক বাস করে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গ্রামাঞ্চল থেকে আগত লোকের সংখ্যা ষোলো লক্ষ। এবং ভারতের বাইরে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আগত লোকের সংখ্যা ষোলো লক্ষ—হিসেবটি গত তিন দশকের।" সাংবাদিকরা ভারতের বাইরের লোক প্রসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করতে শুরু করলে দমনেতা রিচার্ডসন তাঁদের জানালেন, এটি ভারতীয় উপমহাদেশের ইনহেরেন্ট সমস্যা, এবং এ সম্পর্কে মন্তব্য করার অধিকার তাঁর দলের নেই।

এরপর আবার সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ প্রশ্নের পালা শুরু হল।

প্রশ্ন : ট্যাংরায় আপনারা কি দেখলেন?

উত্তর : শিল্পের বিকাশ, বস্তী উন্নয়ন, উন্নততর পয়ঃপ্রণালী, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছু। এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সবকটি দপ্তর আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিছু বিলম্ব ঘটছে, ইউ নো, এটাও থার্ড ওয়ার্লডের একটা ইনহেরেন্ট সমস্যা।

প্রশ্ন : আর বিধাননগরে?

রিচার্ডসন এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য স্থপতি পাসকোলিকে ডাকলেন। পাসকোলি জানালেন, বিধাননগর দেখে তিনি মুগ্ধ। টুইন সিটি হবার সমস্ত সম্ভাবনাই সে বিধাননগরে আছে, তা তিনি সংক্ষিপ্তভাবে উদাহরণ সহযোগে

ব্যাখ্যা করলেন। ধাপা, ট্যাংরা, কেষ্টপুরের বিস্তৃত হিন্টারল্যাণ্ডের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতেও তিনি ভুললেন না। বিধাননগরের পানীয় জলে অতিরিক্ত আয়রন সম্পর্কিত সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে রিচার্ডসন জানালেন, "একমাত্র আয়রণ উইল অচিরে এই আয়রন এলিমিনেট করতে পারে।"

বলাই বাহুল্য, এই সুসমাচার সমবেত হাততালিতে অভিনন্দিত হল।

এরপর শিয়ালদহ এবং হাওড়ায় উড়াল পুল, যানবাহন, ফুটপাত সমস্যার কেন্দ্রে আবার ঝোপড়ি সমস্যা এসে গেল। প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ দিক নিল।

প্রশ্ন ঃ এই ঝোপড়ি বা জবরদখল সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক কি ভাবছে?

উত্তর ঃ দলনেতা হিসেবে আমি আপনাদের একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে বলব। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্র এদেশে বিশ্বব্যাংকই সৃষ্টি করেছিল। ভারত সরকারের সহযোগিতায় আমরা বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থাকে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ এবং উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে টেনে আনতে পেরেছিলাম। অস্বীকার করার নয়, এর ফলে ভারত খাদ্যে ক্রমশঃ স্বয়ংভর হয়ে উঠেছে। মার্কিন অনুদানে পি. এল. ৪৮০-র আমদানি কমেছে।

প্রশ্ন ঃ ওই দশকেই শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ কিন্তু দুবেলা পেট ভরে খেতে পেত না।

উত্তর ঃ একদিকে যখন বৃদ্ধি অন্যদিকে পভার্টি লাইনের নিচে লোক বেড়ে যাওয়া, এটা উন্নয়নশীল দেশের ইনহেরেনট কনট্রাডিকসন। সমাধানের জন্য সরকার সাতের দশকের গোড়া থেকেই যা যা ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা আপনারা জানেন—'গরিবী হটাও' এবং 'বিশ দফা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। "আই মীন ইট্—বিলম্ব হলেও অসম্ভব নয়।"

শ্রীযুক্ত রিচার্ডসন এবার পরিসংখ্যানবিদ হিউবার্টের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী সম্বন্ধে বিশদ তথ্য দিয়ে গ্রামীণ ভারতের যে চিত্র তুলে ধরলেন— তাতে প্রায় নিশ্চিন্ত করে বলা গেল, ১৯৯৫ সাল নাগাদ শতকরা দশ জনের বেশি গরীব থাকবে না। নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ পাসকোলি বললেন কলকাতার রাস্তায় দুচাকার ঠেলা ও রিকশার প্রয়োজনে ফলত একবিংশ শতকেও শতকরা দশ বা পাঁচ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচের মানুষের উপযোগ থাকবে। এবং এভাবে ঠেলা ও রিকশার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে ভারত এবং কলকাতা একবিংশ শতকে পেঁৗছবেই। সমীক্ষক দলের সকলেই বললেন, "উন্মুক্ত আমদানি নীতিতে আপনাদের প্রযুক্তিতে যে বিপ্লব ঘটছে, নগর ও গ্রামের রূপায়ণে সেই বিপ্লবেরই প্রতিফলন ঘটবে"

সাংবাদিক সম্মেলনের হর্ষোৎফুল্ল করতালিময় সমাপ্তির মুখে দুঃসংবাদটি এল।

ছয় ঃ একটি শোক প্রস্তাব।

দুঃসংবাদটি এল এবং সেটি বহন করে নিয়ে এলেন সাতমাথার সংযোগ স্থলের সেই কর্তব্যরত সার্জেন্ট, সঙ্গে লিয়াজঁ অফিসার খাসনবীশ।

চিটেগুড়বাহী ঠেলাটির সেই বৃষস্কন্ধ বাহক মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির হাসপাতালে কুড়ি মিনিট আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

শ্রীযুক্ত রিচার্ডসনের নেতৃত্বে সমগ্র দলটি এক মিনিট নীরব থাকে এবং তারপর দলনেতা হিসেবে রিচার্ডসন্ সেই সার্জেনট-মারফত মৃত বৃষস্কন্ধর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সাংবাদিকদের বিরাট দলটি নতুন সংবাদের লোভে সার্জেন্ট ও খাসনবীশকে চেপে ধরে।

সাত ঃ একটি নিরাপদ টেক অফ্

কলকাতার অভ্যস্ত ট্র্যাফিক এড়িয়ে শ্রীযুক্ত রিচার্ডসন যথাসময়ে এয়ারপোর্ট পেঁছান এবং ঠিক ছটা বিয়াল্লিশ মিনিটে দিল্লীগামী বিশেষ বিমানটি আকাশে ওড়ে। আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ থাকলেও আবহাওয়া ভালই ছিল।

# দেয়াল

॥ **বিশালাক্ষী** ॥

শ'ড়োর এই ব্রহ্মডাঙায় তিথি নক্ষত্র দেখে প্রথম কোপ দিয়েছিল খোদন ভল্লা। পুরুত তখন ঘণ্টা নাড়ছিল। ন-তরফের কাছ থেকে ধার করা জোড়া বলদ গলায় জবার মালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লাঙ্গলটি চালু হবার আগে মন্ত্রপুত কোদাল—যাতে লাল টকটকে করে তেল সি'দুর মাখানো ছিল, কপালে ঠেকিয়ে "জয় মা বিশালাক্ষী" বলে শ'ড়োর এই টাঁড় জমিতে প্রথম কোপ দিয়েছিল খোদন ভল্লা। সেই কোপে আড়াই হাত দূরের একটা পাথুরে চাঙড় চড়াত করে ফেটে যায় আর মা বসুমতীর গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে একটি কচি হাত।

সেই কাক-ডাকা ভোরে শ'ড়োর জনা চল্লিশ মানুষ হা হা করে আর্তনাদ করে ওঠে। সাতসকালে ব্রহ্মডাঙায় অহল্যা ভূমিতে কোদালের পয়লা কোপ চোপানোর আগে খোদন দু-পাত্তর চড়িয়েছিল। খালি পেটে গে'জিয়ে ওঠা সেই অমৃত—তার হাঁটু কব্জি আর কনুই-এর অস্থিসন্ধিতে কেমন যেন চারিয়ে পড়েছিল। খোদন বয়সের ভার টের পায়।

তিন দিন তিন রাত ক্রমান্বয়ে বৃষ্টিতে এই টাঁড় জমিও কিঞ্চিৎ সরস। কোথাও কোথাও মাটি ফেটেছিল—শিসল, মোথা ঘাসের মাথা উ'কি দেবার সবুজ সম্ভাবনা ঘন হয়েছিল। মাটিতে জো এসেছিল, ঘ্রাণ এসেছিল।

কিন্তু গগনমুখো এই কচি হাত, যা কিঞ্চিৎ পুব দিকে হেলে সূর্যোদয়ের দিক নির্দেশ করে, তা ভেতরে ভেতরে চল্লিশ চাষার বুক কাঁপিয়ে দেয় যেন। রাতে খোদনের তো কাঁপ ধরেই ছিল। সে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁপে ওঠে, "হেই মা বসুমতী, কুথাকে লুকায়ে রাখিলছিলি আমার দুখিনী মায়েরে—হেই সীতা মাই গো!'

সমবেত চাষা এবং যাদের এয়োতীরা তখনও পবিত্র ছিল, তারা একযোগে উলু দিল। পাঁচু বায়েন কখন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল—তার ঢাকে বর্ষার সোঁদা লেগে ছিল। কাঠি পড়ে ঢাকে। আওয়াজ উঠল ড্যাব-ড্যাবা-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাবা-ড্যাব্।

তখন খোদন ভল্লা, মাটিতে মুখ গ‍ুঁজে হাঁটু গেড়ে চিত্রার্পিত। যতক্ষণে আশ-পাশের লোক নখে-কোদালে, পাথরের চাঙড় সরিয়ে আলগা মাটি খামচে ধরে, অনেকটা সেই ভয়াবহ গর্ভগৃহ থেকে আলোতে টেনে আনার নিপুণ জটিল কায়দায় সদ্যোজাত এক শিশুর গলিত শব টেনে বের করে—ততক্ষণে খোদনের ফিসফিস গুজ্‌গুজ্‌ করে মাটির কানে কানে ফুসমন্তর পড়া শেষ। পূবদিগন্তের চাপা লাল আলোর সামনে কালো মেঘের আঁকিবুঁকি মাঠে এক স্তব্ধতার সঞ্চার করে। সকালের পাখিরা ডাকতে ভুলে যায়। কে যেন বলে ওঠে, কাছ থেকে যারা সেই গলিত শব প্রত্যক্ষ করে, তাদেরই কেউ—"বিটি-ছাওয়ালই বটে হে…।"

চল্লিশ চাষার হা হা ধ্বনি প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পৌঁছায়। খোদন আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে, শুদ্ধলয়ে বুকে চাপড় মারে। এই শোকের মূলে নাদনঘাটির আগমার্কা আরকের প্রভাব ছিল। ফলত তার বুক ফাটা কান্না ব্রহ্মডাঙার ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। আকাশে তার ঢেউ লাগে—দুলে দুলে বিশালাকৃতির মেঘের সঞ্চার হয়।

শুঁড়ার ব্রহ্মডাঙা অন্ধকার করে, চরাচর অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। সেই বৃষ্টিতে খোদন ভল্লা ভেজে। সদ্যোজাত এক শিশুর গলিত শব ভেজে। চল্লিশ চাষা আকাশের দিকে একপলক তাকিয়ে কোদাল, ফাবড়ী, শাবল, লাঙ্গল হাতে তুলে নেয়। তারাও ভেজে। "জয় মা বিশালাক্ষী" ধ্বনিতে শুঁড়ার টাঁড় জমিতে ক্রমে ফাটল ধরে। এ সেই প্রত্যাশিত ফাটল। এর সঙ্গে আমন ধানের স্বপ্ন জাউভাতের গন্ধ জারিত হয়।

পবিত্র এয়োতীদের উলুধ্বনিতে বৃষ্টি আসে।

এখন খোদন ভল্লা কী করে একমাস পরের গলিত শব দেখে সেটিকে আপন বংশজাত, রক্তের আত্মীয় নিজের নাতনী বলে সনাক্ত করে সেটির সদ্‌ব্যাখ্যা ভল্লাদের গাঁয়ের কেউ দিতে পারে নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা খোদনের আতঙ্কের শরিক ছিল নির্ঘাত। ওই গলিত শিশুর শব দেখে তারাও একযোগে আর্তনাদ করে উঠেছিল। কারণ শুঁড়াতে এই ব্রহ্মডাঙা এতকাল জমিদারবাবুদের তৌজিতে পতিত বলে পড়েছিল। বড় বড় পাথরের চাঙড়, লাল কাঁকরে এ জমিতে ফনীমনসা, কাঁটা ঝোপ, শিয়ালকাঁটা, কিছু খেজুর গাছ ছাড়া আর কোনো সবুজ সম্ভাবনা কস্মিনকালেও ছিল না। আর সবাই জানে ভল্লাপাড়া, বায়েনপাড়া, এমনকি দূর দূর গাঁয়ের রাজবংশী, কাঁড়ার, ঘাটিদের সবাই জানে শুঁড়ার এই ব্রহ্মডাঙা সবকটি গাঁয়ের শিশুমেধ যজ্ঞের, সদ্যোজাত সমস্ত বিটি-ছাওয়ালের গণকবর। ব্রহ্মডাঙায় বাস করেন সেই ব্রাহ্মণ, যাঁকে কেউ দেখে নি, শুধু তাঁর কথা শুনেছে, অথবা ভাগ্যে থাকলে এই পাথুরে মাটিতে তাঁর শিমুল কাঠের খড়মের চটাস্ চটাস্ শব্দ শুনেছে। আর আছেন মা বিশালাক্ষ্মী। তিনি তাঁর কন্যাসন্তানদের এই প্রান্তরে স্থান দেন।

এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিগৃহীত এই টাঁড় জমিতে, বনবিভাগের আর্থানুকুল্যে যখন "সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প" গৃহীত হয়, তখন ফিসফিস

গুজগুজ করে এই বার্তাটি সব মহলেই আলোচিত হয়েছিল। আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যারা মাটির নীচে অনন্তকাল ধরে স্বপ্নে বিশালাক্ষ্মীর সঙ্গে নানাভাবে দেয়ালারত, এই প্রকল্প তাদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাবে। খোদিন ভল্লাই জানে প্রত্যন্ত দেশের সতেরটি গাঁয়ের এক হাজার চব্বিশটি পরিবারের অধিকাংশ নারী গত দশ বছরে প্রাকৃতিক নিয়মে রজঃস্বলা হয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে গেলেও আদমস্মুমারির হিসেবে তাদের কারো ঘরে একটির বেশি কন্যা সন্তান নেই—কারো কারো আবার তাও নেই। সেই সব নবজাতকরা—বিটি-ছাওয়ালেরা জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাটির নীচে গাঢ় অন্ধকারে, বিশালাক্ষীর কোলে ঠাই পেয়েছে। তারা সবাই হাসিতে কান্নাতে মা বিশালাক্ষীর সঙ্গে দেয়ালায় মেতে রয়েছে।

॥ একটি সমীক্ষা ॥

শঁড়াকে কেন্দ্র করে সাড়ে পাঁচ কি. মি. ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকলে—সে বৃত্তের পরিধি কোনো নদীমাতৃক এলাকার স্নেহ থেকে কমপক্ষে দুকোশ দূরে পড়ে থাকবে। ফলত চাষ আবাদের স্বর্ণিল সম্ভাবনা এখানে ক্ষীণ। এরা কোথাও, কোনো এক সময়ে চোয়াড় বা সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় নদীমাতৃক পলিগঠিত সমভূমিতে বাস করত! তারপর চাপ খেতে খেতে এক সময় দুপাশের নদী পেরিয়ে···। থাক সে হলো গিয়ে মানুষের পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস, যা এসব সমীক্ষায় নিতান্তই ফর্মাবশে ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা হতে দেখা যায়।

১৯১৯ সালের আদমস্মুমারি অনুযায়ী এতদঞ্চলে প্রতি একশ পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৮৩। একারণে পঞ্চাশ সালে আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের গণিকাপল্লীতে এসব এলাকা থেকে যে পরিমাণ নারীদেহ যোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, পরবর্তী দশকে তা পাঁচ, দশ শতাংশ হারে, অনিবার্য ভাবে কমতে থাকে। এবং ১৯১৯ সাল নাগাদ অসমর্থিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে ওইসব অস্ট্রিক নারী অধ্যুষিত পল্লীগুলি ক্রমশ আর্যাবর্তের এবং সংশ্লিষ্ট বিহার এলাকা থেকে যোগান দেওয়া নারীদেহে প্লাবিত হয়েছে।

ফলত শঁড়ার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমগ্র বিক্রয়যোগ্য নারী সমাজের ডিভ্যালুয়েশন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এর পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ১০২৪টি পরিবারের কুড়ি শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ খনিতে, অ্যাসিড কারখানায় কাজ পায়। ফলত শঁড়ার চতুষ্পার্শে এই বাঁধা মজুরির পুরুষদের কদর বাড়ে। আর তার ভয়াবহ প্রতিফলন ঘটে বিয়ের বাজারে। এখানকার যে দুই তিনটি সমাজে গণবিবাহ প্রচলিত ছিল তা উঠে যায়। এবং এই সমাজের পুরুষরা আর্যাবর্ত আগত ভিন্ন গোত্রের নারীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে অধিকতর আগ্রহ দেখায়। শোনা যায় এই সমাজের তিনজন সীতারামপুরবাসী যুবক চাকরির সুবাদে ১৯১৯ ও ১৯২৪ সালে শাদাকালো টিভি যৌতুক হিসেবে পেয়েছে। এদের টানে টানে ভল্লা,

ঘাটি এবং আদি ক্ষত্রিয় আরো আরো সমাজে বিয়ের বাজারে পুরুষ ক্রমশঃ দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। একটি তালিকা থেকে চলতি বাজার দামে বিভিন্ন ক্যাটিগরির বিবাহযোগ্য পুরুষের মূল্যমান স্পষ্টতই বোঝা যাবে—

১। সরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্প শ্রমিক ; ন্যূনপক্ষে ৩০ হাজার টাকা

২। বেসরকারি কিন্তু স্থায়ী শিল্পশ্রমিক ; ন্যূনপক্ষে ২০ হাজার টাকা।

৩। ক্ষুদ্র সংস্থায় শ্রমিক কিংবা পিওন দারোয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ; ন্যূনপক্ষে ১৫ হাজার টাকা।

৪। ঠিকা শ্রমিক, ঠিকাদারি সংস্থায় নিযুক্ত ; ন্যূনপক্ষে ১০ হাজার টাকা।

৫। স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে নিযুক্ত ক্ষুদ্র সংস্থা এবং সমমানে বিড়ি বাঁধা কারিগর, শালপাতার যোগানদার ইত্যাদি ; ঐ

৬। খেতমজুর কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষপাতে অন্তত ২৪০ দিনের টাকা মজুরি প্রাপক, ন্যূনপক্ষে ৫ হাজার।

৭। সম্পূর্ণত বেকার, বয়স্ক, বৃদ্ধ, কিঞ্চিৎ অকর্মণ্য ; ন্যূনপক্ষে ৫ শত টাকা। এমতাবস্থায় একাধিক কন্যার কথা তো ভাবাই সম্ভব নয়, একটি কন্যার দায়ভার বহন করাও কোনো সুষ্ঠু স্বাভাবিক দম্পতির পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু যেহেতু প্রাকৃতিক ভারসাম্যে পুরুষ ও নারী শিশুর জন্মহার ৫০:৫০, ফলত অধিকাংশ নারী শিশুর ভবিতব্য শুঁড়ায় ভুষুণ্ডী প্রান্তরে বিশালাক্ষ্মীর আদিগন্ত কোলে।

১৯৮১ সালের আদমসুমারিতে দেখা গেছে অবশ্যই এখনও অসমর্থিত যে শুঁড়া ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নারী শিশুর জন্মহার আরও দশ শতাংশ কমে প্রতি একশ পুরুষে ৭৩-এ দাঁড়িয়েছে।

বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো যেত, একবিংশ শতকের দরজা যখন অল্প অল্প করে ফাঁক হবে—তখন শুঁড়া ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিবাহযোগ্যা নারী বলে কোনো পণ্যই আর পাওয়া যাবে না এবং দুশ বছরের তেরটি কৌম সমাজ জ্যামিতিক হারে বর্ণসংকর সৃষ্টি করে এক মহান ভারতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে তুলবে।

প্রকৃতির ভারসাম্য অর্থাৎ কিনা ইকোলজিক্যাল ব্যালান্সের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে মানুষের শিকড় সম্পর্কিত এই সমস্যার স্থান পাওয়া উচিত কিনা, তা এখন বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখছেন। সময়ান্তরে সে সম্বন্ধে সমীক্ষাও প্রকাশিত হবে।

॥ গর্তলক্ষণ ॥

শুঁড়ার মাঠে সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পে সেদিন নেতাদের মধ্যে যেমন তফসিলী সম্প্রদায় নিবন্ধন সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যও ছিলেন, তেমনি চল্লিশটি চাষার ভিড়ে গা ঘষাঘষি করে দাঁড়িয়েছিল সুফল কাঁড়ারও।

সুফল গ্রাম পঞ্চায়েত অনুমোদিত "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্পের নিয়মিত

তালিকাভুক্ত শ্রমিক। কারণ অর্ধাহার অনাহার সত্ত্বেও তার শরীরে সেই ভাস্কর্য প্রোথিত, যা কাস্তে অথবা লাল পতাকা হাতে মিছিলে অগ্রবর্তী হলে বিদ্রোহ কায়া পায়—শাল-পিয়ালের বন থেকে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি শোনা যায়। ফলত সুফল স্নেহধন্য স্থানীয় নেতৃত্বের এবং সেই সুবাদে গ্রামসমাজের।

সে সমাজের মানুষেরা জানে সুফলের বৌ বড় ফলবতী—জন্মের পর দুটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেও মাত্র বার বছরের দাম্পত্যে সুফলের জীবিত সন্তানের সংখ্যা তিন—বড়টি কন্যা, ন-বছরের। তারপর পুত্র দুটি।একটি, পাঁচ। একটি তিন। ভগবানকে সুফল কটি ফল দিয়েছিল, এবং কি কি ফল দিয়েছিল তা সঠিক না বলতে পারলেও পুজোর শেষাশেষি সুফলের বউ আতর জানাল সে গর্ভবতী হয়েছে।

গ্রামসমাজে প্রসব বেদনা উঠলে আজকাল আর চাঁপাবালার ডাক পড়ে না, কিন্তু গর্ভের প্রথম অবস্থার লক্ষণ নির্ণয়ে চাঁপাবালা এখনও অপরিহার্য। আর না ডাকলেও চাঁপাবালা এ ব্যাপারে নিদান হাঁকতে কার্পণ্য করে না। বরাত জোরে ছেলে হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেলে চাঁপার কিঞ্চিত প্রাপ্তিযোগও ঘটে যায় কখনো সখনো।

চাঁপার বয়স চার কুড়ি হয়ে গেছে। সুফলের ঠাকুর্দার কথা চাঁপা বলতে না পারলেও সুফলের বাপ আর সুফল যে তার হাতেই হয়েছে একথা চাঁপাবালা সুফলের বউ আতরকে অনেকবার শুনিয়েছে। ফলত শুঁড়ার চাপড়া ভাঙার আগের সন্ধ্যায় চাঁপা যখন পূর্ণগর্ভার লক্ষণ নিরীখে নিদান দিল "রাজকন্যে হবে গো, লিচ্চয় দেখে লিও"—তখন সুফল ফ্যালফ্যাল করে আতরের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। রক্তাল্পতা হেতু আতরের চোখ ইতিমধ্যেই মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

সুফলের বুকের কাছে মত্তমাদলের টোকা তো গোটা বর্ষার রাত ধরে জেগেই ছিল, তারপর যেদিন ভল্লার বুকফাটা আর্তনাদ তাকে সেই তাণ্ডবের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

'গাজন হে, গাজন—শিবের নাচন। পাগলা শিব, বুড়ো শিবের নাচন' হাজার ঢাকে কাঠি পড়ে, হাজার ঝাঁঝ বেজে ওঠে। শুঁড়ার মাঠ থেকে দ্রুত দৌড়ে আসতে গিয়ে বাড়ির দোরগোড়ায় এই প্রথম বর্ষাতে সে ধুতুরা ঝড়ের বাড় বাড়ন্ত লক্ষ্য করে।

আতর সেদিনই সন্ধ্যায় মহুলীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয় এবং পুরো একটা দিন গর্ভযন্ত্রণার শেষে পরদিন বেলা তিনটেয় একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়।

॥ ধুতুরা রহস্য ॥

আতরের গর্ভের সুবাদে সুফল সরকারি প্রকল্প থেকে দুদিনের জন্য মোট আট কেজি গম পায়। তা থেকে ছ কেজি সদা ময়রার দোকানে ঝেড়ে দিয়ে সুফল নগদ সাতটাকা পঞ্চাশ পয়সা পেয়ে যায়। নতুন চকচকে পঞ্চাশ পয়সার একদিকে

ইন্দিরা গান্ধীর মুখ ছিল। আধুলিটি মোহর বলে ভাবতে সুফলের ভালো লাগে; এবং হাসপাতালমুখো যেতে যেতে এই মোহর দিয়ে কন্যাসন্তানের মুখ দেখতে বাসনা হয়। বিশালাক্ষ্মীকে স্মরণ করেই সুফলের বুক থেকে একটা ফাঁকা আওয়াজ বেরিয়ে আসে, "মাগো, মা বিশেলক্ষী।"

কন্যা শিশুটি তখন নিদ্রিত ছিল। আতরের একাচিলতে কাপড়ের সিক্ত প্রান্তদেশ বুকের দুধে আর্দ্র ছিল।

"দুধ দেইলাছিস?" সুফল কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করে, আতর মাথা নাড়ে। স্তনাগ্রে সেই মমতা থাকে, শিশুর ঠোঁটের স্পর্শে যা বত্রিশটি নাড়ীতে দোল দেবার ক্ষমতা রাখে। সুফল তাই নিজের দিব্যি দিয়েছিল, "কান্দুক, কেইন্দি মরি যায়, আপদ যাক, দুধ দিইলছ, ত—তুর সোয়ামীর মরা মুখের দিব্যি।"

তিনদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর বাচ্চা নিকেশ করতে হাত কাঁপে। এর আগে একটার বেলায় তাই হয়েছিল— তো সেটি তিন বছর বয়েসে জলে ডুবে সেই শুঁড়ার টাঁড়মাটিতে নিজের জায়গা করে নিল। সুফল জানে, তিনদিনের বাচ্চার মুখে বিষ দেওয়া দুরূহ কাজ, এমনকি মধু মেশালেও সে তফাত ধরে ফেলে। সে অমৃতের স্বাদ পেয়েছে—মায়ের শরীরের তাপ পেয়েছে।

ফলত, ঠিক হয় সেদিন রাত্তিরেই সুফল বৌকে নিয়ে পালাবে। ব্যাপারটা সহজ নয়। এক তো আতরের শরীর, তারপর হাসপাতাল জুড়ে হৈ হৈ শুরু হয়ে যাবে। একটু দূরে কয়লা গুদামে সারা রাত ঘণ্টা পড়ে। রাত দুটোর ঘণ্টার দিকে আতরকে কান রাখতে বলে সুফল চলে গেল।

বাড়ি ফেরার পথেই, বাড়িতে নয়—শুঁড়ার ব্রহ্মডাঙায় কাজ শেষ করে মা বিশালাক্ষ্মীর কোলে নবজাত কন্যাকে সঁপে দিয়ে পুকুর ঘাটে একটা ডুব দিয়ে ভোর হবার আগেই সুফল আর আতর ঘরে ঢুকবে—ঠিক হয়।

তিনকোশ দূরের পথে আজ আর বাড়ি ফেরা নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশ-পাশের ঝুপড়িতে দুদণ্ড একটু পিঠটাকে ঠেকিয়ে নেওয়া। চার আনায় একটা চারপাই পাওয়া যায়। কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাবার আনন্দে ওই চার আনার অপব্যয়কে প্রশ্রয় দিতে বড় বাসনা হল সুফলের। জীবনে সে ভাড়া করা চারপাইয়ে শোয় নি।

শোয়ামাত্র ঘুম। ঘুমের মধ্যে বিরাট একটা টাঁড় অঞ্চলে ধুতুরার বিশাল বিস্তার লক্ষ্য করে সুফল একটু মুখ টিপে হাসল। সতেজ পুরু ধুতরোর পাতা। ধুতরোর শাদা, একটু বেগুনী আভা যুক্ত ফুল—নীলকণ্ঠের কানে দোলে। বিষে বিষে নীল নীলকণ্ঠ হে-গাজন হে—গাজন হে—বাজনার তালে তালে স্বপ্নে দোলে সুফল। একটা শিশুরই মতো দোলনায় দোলে। ঘুম গাঢ় হয় কারণ স্বপ্নে ধুতুরা বীজের ঘন আঠা লেগে থাকে।

।। দেয়ালা ।।

দমকা ঠাণ্ডা বাতাস দ্রুত একপশলা বৃষ্টি সুফলকে আচমকা জাগিয়ে দেয়। চারপাইয়ে শুয়ে সুফল প্রথমে আকাশ দ্যাখে এবং স্পষ্টতই বোঝে মেঘ একটা

কালো চাদরের মতো প্রায় মাথার কাছে নেমে এসেছে। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়।

আকাশে চাঁদ নেই। ফলত রাত ঠাহর করা দুরূহ হয়ে পড়ে। সুফল ঝোলানো ব্যাগটি কাঁধে নিয়ে দ্রুত হাসপাতাল-মুখো হাঁটা দেয়। তার মধ্যে দ্বিধা ছিল—দুটোর ঘণ্টা পড়েছে কি পড়ে নি।

হাসপাতালে মেয়েদের ওয়ার্ডে দোরগোড়ায় দুটি কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। একটু এগিয়ে ডানদিকের কোনা ঘেঁষে পাতা খাটটির দিকে তাকিয়েই সুফলের বুক ধক্ করে উঠল। আতর নেই।

সুফল সামনে কাউকেই পায় না—কিন্তু যেহেতু নৈশ অভিযান গোপন, অভিসন্ধিমূলক সুফল কাউকে ডাকতে সাহসও পায় না। তাছাড়া বৃষ্টির তোড় বেড়েছে। রাত পাহারার কুকুরও এখন এই আকাঙ্ক্ষিত ঠাণ্ডায় ঘুমে কুণ্ডলী—সেখানে শাদা বকের মত সেইসব সুখী সুখী নার্সেরা, কিংবা আয়ারা—পাহারাদারটিকেও সুফল কোথাও দেখতে পেল না।

দুবিঘের চৌহদ্দিতে বাথরুম, পায়খানা—আউটডোর। এমনকি পাকুড়তলাতেও যে গুটিকয় দোকান ঘর আছে সর্বত্র শিকারি হায়েনার মতো ঘুরে এল সুফল। বৃষ্টির ছাঁটে এখন তার শীত বোধ হচ্ছে। জামাকাপড় ভিজে জবজবে—তবু কানের ভেতরে, মাথার ভেতরে একটা গুমোগুমো আগুনের আঁচ বোধ করে সুফল। মাথার ওপর থেকে একফালি মেঘ সরে যেতেই পাণ্ডুর শীর্ণ চাঁদ বেরিয়ে আসে। বৃষ্টিটা একটা ভেজা দমক তুলে সহসাই থেমে যায়। আর তখনি কোল মাইনসের রাত পাহারা ঢং ঢং করে দুটো ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।

এরপরে সুফল তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটি নিয়ে—ধুতরার নির্যাসে প্রস্তুত ঘন দুধের মত ভয়ঙ্কর এক বিষের বোতল নিয়ে—সে বোতলে স্থিরভাবে রাখা পুপসি কোম্পানির রবারের স্তনবৃন্ত নিয়ে হন্যে হয়ে খোঁজে। শিশুমেধের প্রবল তাড়না রক্তে ঢাক বাজায়।

সাড়ে ছটাকার মূলধন নিয়ে বিনা টিকিটে প্রথমেই সে অণ্ডাল যায়। কোলিয়ারির কাছে ধাওড়ায় আতরের এক মাসি থাকে। মাসি আর তার দুটি মেয়ে গতর বেচে। সেখান থেকে সীতারামপুর—পাটুলি এদিকে খয়রাসোল, দুবরাজপুর—পায়ে হেঁটে, বাসে ট্রেনে কোশ কোশ রাস্তা পার হয় সুফল। আতরের দেখা পায় না। শেষ দুদিন ভীমগড়ের রেল স্টেশনে স্পেশাল চেকিং-এ ধরা পড়ে সিউড়িতে জেল খাটে। মুক্ত সুফল নিঃস্ব হয়ে সিউড়ি কোর্ট প্রাঙ্গণে ভিক্ষা করে। সেই থলিটি সুফল যা হোক করে বাঁচিয়ে রাখে এবং তার সঞ্চয় বলতে প্লাস্টিকের শিশিতে সযত্নে রাখা ধুতরার আরক ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

সুফল হতাশ হয়ে ভাবে এ একরকম ভালোই। মা-বিটি একসঙ্গে হারিয়ে গেছে, হয়তো মরেছে, রেলে, অতলস্পর্শী কোনো গভীর কুপে। তবুও এক সংশয়।

ধুতুরার নির্যাস ভর্তি শিশিটিকে যত্নে আগলে রাখে। তের দিনের দিন সুফল তার পরিচিত আঙিনায় ফেরে।

তখন বিকেলের শেষ আলো মরে গেছে। সুফলকে দেখে তার তিন কাচ্চা বাচ্চা আদুড় গায়ে ছুটে আসে। আর সেই সময়ই বাঁশের চ্যাঁচারির বেড়া সরিয়ে আঁতুড়ের পরিচিত গন্ধ উড়িয়ে সুফলের ঠিক তিন হাত সামনে এসে দাঁড়ায় আতর।

এক ঝটকায় আতরকে সরিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢোকে সুফল। হাতে ধুতরার নির্যাস—প্লাস্টিকের শিশির মুখে পুপসি কোম্পানির রবারের নিপল্ লাগিয়ে বাঁশের দোলনায় ন্যাকড়া জড়ানো সদ্যোজাত কন্যার দিকে এগিয়ে যায় সুফল।

তের দিন বড় বেশি সময়—এ শিশু তার শিকড় গেড়ে ফেলেছে মাটির ভেতরে। সুতরাং সমগ্র ঘরে সঞ্চারিত ধুতুরার নির্যাস সম্পর্কে সে আশ্চর্য নির্বিকার। ভয়, ক্ষুধা, মৃত্যু সম্বন্ধে সে আশ্চর্য নির্লিপ্ত।

দোলনায় মৃদু দোলা লাগলে সুফলের তের দিনের রাজকন্যা হাসে। দোলনার ওপারে এসে আতর নিবিষ্ট শিশুর মুখ দ্যাখে। সুখে দুঃখে সম্পৃক্ত এক ভয়ঙ্কর দম্পতির ছায়া পড়ে বাঁশের দোলনার ওপর। দোলনা দোলে, এই পুরুষ নারীও দোলে—শিশুটিও দোলে। তার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে।

আতর ফিসফিস করে বলে "কী কইরব বলু। নাড়ীতে টান লাইগল—পালায়ে গেলাম।"

সুফল শুকনো একটু হেসে বলল "দেয়ালা করছে, স্বপনে মা বিশেলক্ষীর সঙ্গে বিটি আমার কথা বইলছে।"

ভাঙা চালা, দরমার বেড়া নড়িয়ে সুবাতাস বয়।

শুঁড়োর টাঁড় মাটির কবরে শায়িত নারী শিশুরা পাশ ফেরে। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। এ তাদের দেয়ালার সময়।

এ বড় নিশ্চিন্ত সময়। দোলনার দু পাশে ঘন হয়ে এইসব ভয়ঙ্কর দম্পতি যখন দাঁড়ায় তখন দেয়ালারত শিশুর সে বড় সুখের সময়।

বেঁচে থাকবই এমন প্রত্যয় পেলে গর্ভস্থ শিশুও বড়ই সুখী হয়। সুফল ও আতর জানে।

# ঠাকরুণ

ভাদ্রের এই সময়টাতে চরের এই জায়গা সামাল, সামাল। শুধু এ বছরেই নয়, ফি বছরই শ্রাবণ ভাদ্রে গোটা চর তলিয়ে যায় জলের নীচে। মাঝে মাঝে বাঁশের খুঁটির ওপরে দাঁড়ানো কিছু কুঁড়ে টুইঘরের মত বিস্তীর্ণ এলাকাতে জেগে থাকে। রাতে সেখানে টেমি জ্বলে।

নুরপুরের কাছে মা গঙ্গা দ্বিধা হলেন · এদিকে ভাগীরথী, ওদিকে পদ্মা। বিশ মাইল নীচে ফরাক্কার বিশাল বাঁধ। পশ্চিমে আড়াআড়ি ন্যাশানাল্ হাইওয়ে। মাঝের এই বদ্বীপ ভৌগোলিক আকারে এক পবিত্র যোনিসদৃশ পলিগঠিত সমভূমি। বড় উর্বর, বড়ই উর্বর--সুবালার মত, এই চরবাসিনী পবিত্র সন্তানবতী জননীদের মত।

সুবালা এখানে ঘর বেঁধেছে সাত বছর হল। তার প্রতিবেশী পঞ্চাশ ঘরও কম-বেশি তাই। অধিকাংশই বাংলাদেশি উদ্বাস্তু। বাংলা আটাত্তর সনে তাড়া খেয়ে এপারে এসেছে।

একেই বোধহয় ঘরবাঁধা বলে। প্রতি বছরই বানভাসিতে ঘর গেরস্থালি ধুয়ে মুছে যাওয়া। তারপর কার্তিকের শেষে জলে টান ধরতেই হুড়মুড় করে আবার মাঠে নামা। যে যার বাস্তুর দখল নাও। স্থানীয় পুলিশের কাছে এ হল গিয়ে, 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রব্লেম'। তাদের খাতায় এই পঞ্চাশ ঘরই সোস্যালি আউট্কাস্ট।

কার্তিক-অগ্রহায়ণে একটু একটু করে পাটকাঠি হোগলা, ভাঙা চোরা দরমা চাটাই জোগাড় করে আবার পঞ্চাশ ঘর মানুষের ঘর বাঁধা। অনেকটাই প্রবৃত্তি তাড়িত বন্য পশুপাখী যে ভাবে ঘর বাঁধে নির্দিষ্ট মরশুমে, তেমনি।

এই দখলী হাঙ্গামায় সত্যিই বেঁচে থাকার জান্তব তাগিদ আছে। বিশাল চরভূমি এরপরই ঝিঙে, শসা, পটল আর তরমুজে সবুজ হয়ে উঠবে। মাঠের সনাতন অভ্যাসে হাড়কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে পঞ্চাশ ঘরের মাঠ পাহারা চলবে। শেয়াল আছে, খটাশ আছে, নিশাচর বাদুড় আছে, সর্বোপরি মানুষ আছে।

কিন্তু ভাদ্রের এই সময়টাতে চরের এই জায়গা সত্যিই 'সামাল সামাল'। শুধু ঘর গেরস্থালি নয়। এ হল বেঁচে থাকার তাগিদ। সিকি মাইল দূরে হাইওয়ের ওপর ঝোপাঁড় তৈরী শুরু হয়ে গেছে। দুটো মাস বেশ কিছু সংসার ঘর বাঁধবে সেখানেই। পাশেই একের পর এক ধাবা। ওয়েসাইড হোটেল। মূল খদ্দের বাস ট্রাকের ড্রাইভার, খালাসী। খাদ্য চোলাই মদ, তরকা, চাপাটি, মাংস। মুখশুদ্ধি নারীমাংসে। ভাদ্রে মরণ বড় সস্তা, ফি বছরই জলের টানে সেই মরণ টানে—গোরু ছাগল থেকে করে মানুষ ইস্তক। চরের সেইসব সন্তানবতী পবিত্র নারীরাও মরে। খিদেয় আর লোভে, পাপে আর জ্বালায় পুড়ে পুড়ে মরে। এ দাবদাহে প্রবল বর্ষণে বন্যাতেও শান্তি নাই, শান্তি নাই।

সুবালা, তার চার ছানাপোনা নিয়ে এই চরেই থাকে। হাইওয়ে আর চরে পঞ্চাশঘরের যাযাবরী সংসারের সঙ্গে সুবালার ঘরও ঋতুর নিয়মে নড়ে চড়ে—ঘর ভাঙে আর বসে। বর্ষায় চরভূমি ছেড়ে হাইওয়ের বিস্তৃত বাঁধের ওপরে। হেমন্তে আবার সেই চরে।

জীবনযাত্রার এই পদ্ধতি, যা কিনা একান্তই নদীমাতৃক, চরের মানুষদের বড় একটা অবসর দেয় না। সম্বৎসর কাজ হয়ত নাই, কিন্তু কাজ খোঁজা আছে। পাঁচমাইল দূরে গঞ্জ থেকে শুরু করে হাতের কাছেই ধাবার চার পাঁচটা হোটেল পর্যন্ত। কিছুই না পাওয়া গেলে পুরুষেরা অসামাজিক কাজ খোঁজে। চুরি, ডাকাতি, চলন্ত লরী থেকে মাল ছিনতাই। অনতিদূরে বর্ডার থেকে চোরা-চালানির কাজ—গোরু-মোষ, মেয়েমানুষ কিছুই বাদ নাই। আর মেয়েরা পুরুষ খোঁজে, পয়সা দিতে পারে এমন পুরুষ।

সুবালা এরই মধ্যে তবু অবসর পায়। এ অবসর ছিনিয়ে নেওয়া অবসর, গেরস্থালির ফাঁকে ভাদ্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে উন্মনা এয়োতির অবসর। অবসরে, স্বপ্নে, ভাগীরথী কখন আত্রাই হয়ে যায়।

আত্রাই এর কোল ঘেঁষে এমনি পবিত্র এক চরভূমিতে ওপারেই তো ছিল—হোগলা আর দরমার ঘর। তিন তিনটে ছানাপোনা, আর সেই মানুষটা। এমনি চেনা, একান্ত জলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়া জলজ হাওয়া, শীত লাগা, জ্বর লাগা, ঘোর লাগা। থেকে থেকে হাওয়ায় ভেসে আসত গান। মানুষটা বলত, "প্রাণডা কাইন্দা ওঠে রে, ইডা হইল গিয়া তোর আব্বাসের গান—ভাটিয়ালি।"

কারা গায় এখানেও। এখন মানুষটা নাই। কেরোসিনের টেমি নিভে গেলেও ঘরের মধ্যে একটা চাপা আলো থেকে যায়। মেঘের ফাঁক দিয়ে যে আলো আসে, সেই আলো, আকাশের নীল নক্ষত্রের আলো। সুবালা সেই আলোতে মুখ দেখে আপন সন্তান সন্ততিদের।

শুধু মানুষটা নাই বলে মাঝে মাঝে অন্ধকার যেন হা হা করে গিলতে আসে। তখন মাটির নীচে গভীর গর্তে সাপেদের হিস্‌হিস্‌ শব্দ যেন বড় স্পষ্ট হয়। অন্ধকারের বুক থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে ওঠে। কালো একটা মেঘ এসে

হঠাৎ চোখের সামনে থেকে তারাভরা আকাশটা মুছে দিলে বাঁধের ওপর থেকে শেয়াল ডেকে ওঠে।

আর এখন আরেক জ্বালা। ভাদ্রের এই সময়টায় নদীর রাক্ষসী বিস্তার। ঝুপ্ ঝাপ্ করে সারারাত ধরে পাড় ধসছে! নদীর নিজের দেওয়া পলি নদী ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বড় ভয় করে, গভীরে কোন্ চোরাস্রোত কে জানে, কতদূর ইস্তক নরম মাটির বুকে ফাটল ধরিয়ে ফেলেছে। রাতে ঘুমের মধ্যে নদীর চোরাস্রোত যেন সুবালার বুকের ওপর দিয়েও বয়ে যায়। সুবালা আতঙ্কিত চোখ মেলে চাটাই এর ওপর উঠে বসে। পায়ের নীচের মাটির আর্দ্রতা, স্থায়িত্ব লক্ষ্য করে। নিজেকেই প্রবোধ দেয়—না ভয়ের কিছু নাই।

পরিচিত শব্দগুলোকে সুবালা চিনে নিতে নিতে ঘুমোতে চেষ্টা করে। হোগলার বেড়া চুঁইয়ে দূরে পদ্মায় গাওয়া যে গানের সুর ভেসে আসে সুবালা সে গানের সুর চেনে। ভাটিয়ালী। এ সেই উজান বেয়ে যাওয়ার গান। রাতে অনেকদূরে ছপ্‌ছপ্ শব্দ শুনে সুবালা চিনতে পারে, মাছমারাদের নৌকো এখন জাল ফেলার জায়গা খুঁজছে। এভাবে পরিচিত শব্দগুলোকে ছুঁতে ছুঁতে চোখের পাতা যখন বুঁজে আসে, তখনই মানুষটার কথা বড় মনে পড়ে সুবালার। ভয়মাখা ঘুমের মধ্যে লাট খেতে খেতে, নীল নীল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে লোকটার মুখ চোখের পাতায়, লেগে থাকে। সুবালা 'দ' হয়ে শোয়। ওই সুখের স্মৃতিতে যতটুকু উমু পাওয়া যায় সুবালার এই দুদণ্ডের ঘুম তার সমস্ত সুখটুকু জারিয়ে নিয়ে ঘন হতে চায়, স্বাদু হতে চায়। মাথায় লাল ফেটি হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। লোকটা মাঠ পেরিয়ে যায়। ও পারেই জলাভূমি।

এই ঘুম স্থায়ী হয় না। দুঃখী মানুষের ঘুম স্থায়ী হয় না। সুখের স্বপ্নে যখনই দুলুনি আসে—তখনই এক আর্ত চীৎকার হাহা করে অন্ধকার, চাপ চাপ অন্ধকার ধেয়ে আসে।

সেদিনই খবর এসেছিল, খ্রীস্টান মিশনারীদের এক সেবাদলের তত্ত্বাবধানে যেমন মেঘনার চরে হয়েছে, তেমনি পদ্মার পাড়ে চর মছলন্দপুরের বিশ ঘর নমঃশূদ্র আর তিরিশঘর নিকারি মুসলমানদের নিয়ে জমি জিরেতের পাকা বন্দোবস্ত হবে। জমির ভাবনায় স্বপ্ন সবুজ হয়। তারপর তাতে পাকা সোনার রঙ ধরে। সেটাও ভাদ্র মাসই ছিল। সেদিনও ছিল চাপড় ষষ্ঠীর ব্রত। ছেলের মঙ্গল কামনায় এয়োতিরা এই ব্রত পালন করে। মছলন্দপুরের সুবালাও নিয়ম পালন করে আগের দিন চাপড় তৈরী করেছিল। সাতটি ক্ষীরের চাপড়, সংগে ধান দুব্বো, লক্ষ্মীর কাসুন্দি সবই তৈরী ছিল।

জমিবিলির খবরটা বিকেল নাগাদ চাউর হয়েছিল। নিকারীদের দিক থেকে এসেছিল সাত ঘর—তাদের সাতমাথা আর নমোদের তিনঘরের মোট দশমাথা এক হয়েছিল ষষ্ঠীতলায়। এ ষষ্ঠী বড়ই জাগ্রত। ফলতঃ হিন্দু-মুসলমান

নির্বিশেষে সারা বছর পালি পড়ত। বাহান্ন সপ্তাহে বাহান্ন ভাগে এই পালির রেওয়াজ স্বীকৃত ছিল মছলন্দপুরে।

নাটোরের সেরেস্তা থেকে কাশেম আলি আর ঘরের মানুষটা সাতদিন হাঁটাহাঁটি করে একটা নকশা জোগাড় করে এনেছিল। খানকয়েক দহ, হাজামজা জমি বাদ দিয়ে সাকুল্যে দুইশো তিরিশ বিঘে জমির স্বপ্ন স্পষ্ট হয়ে ঝুলেছিল পঞ্চাশ ষাট ঘর খেতমজুর, ভূমিহীন চাষার চোখের সামনে।

এই আশ্বাস চোখের সামনে থাকলেই দ্রুত রঙ বদলায় মেজাজের। সন্ধ্যার পর ঘরের মানুষটা কটা বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি—পোয়াটাক কচ্ছপের মাংস আর এক বোতল ধেনো নিয়ে ঘরে ফিরেছিল।

তখনো কোলের শেষ দুটো জন্মায়নি—বড় মেয়েটা সবে দশে পা দিয়েছে—মাঝেরটার সাত আর কোল পোঁছাটা তখনও কোলেই। মাঝের একটা বাচ্চা ওলাউঠায় মারা গিয়েছিল বছর পেরোবার আগেই। ঝাঁঝালো সর্ষেবাটা আর কাছিমের মাংসর সুবাস যখন বাতাসে ভাসছে চোখের সামনে নিদেনপক্ষে সাত আট বিঘে সুফলা জমির স্বপ্ন পাখা মেলছে, তখনই অন্ধকার থেকে তক্ষক ডেকে ওঠে। তিথিটি পঞ্চমী, শুক্লা পঞ্চমী, মোটা অন্ধকার মেঘের আস্তরণ সরিয়ে ভাঙা চাঁদ একবার আকাশে উঁকি দেয়। নিকারীদের এদিক থেকে তখন মহরমের মহল্লা আর জারীগানের শব্দ ভেসে আসছিল।

এই পরিবেশ আদিম মানুষকে প্রাণিত করেছে। ফলতঃ রাত ঘন হলে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দের মধ্যে মিশে যেতে যেতে সে মানুষটা নিবিড়ভাবে শরীর খুঁজছিল, সুবালার শরীর।

একটা মাত্র ননদ একপ্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে—তারপাশে বড় মেয়ে, আদর—তার পাশে ছেলে মানিক। আরেক প্রান্তে তখন সমস্ত নেশার শেষে এক সম্পৃক্ত উদ্দামতা আগুন হয়ে জ্বলছিল, গলছিল।

সে অবস্থায় ঘুম ঘন হয়ে নামে। নরম চাপা অন্ধকার ঘুম। আর তখনি বাজ পড়ে। অদূরের গুমগুম শব্দে মেদিনী কাঁপছিল, সুবালার পিঠের নীচে। চোখ বোজা অবস্থাতেই সুবালা বুঝেছিল ঝুরঝুর কার তার কাদার দেয়াল ঝড়ে পড়ছে—হোগলার কুচি আকাশে কালো হয়ে উড়ছে।

মানুষটা বিভ্রান্ত অবস্থায়, শুধু আর্ত চীৎকার করে উঠল—"খানসেনা, মাঠপানে পলাও।"

চতুর্দিকে শুয়োরের খোঁয়াড়ের সম্মিলিত চীৎকার—বিভ্রান্ত শ' দেড়েক মানুষ মাঠের ওদিকেই ছুটছে। দূরে দূরে আকাশ ফাল করে আগুন জ্বলছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্যেই মানুষটার সোহাগী বোন কোথা থেকে কোথায় যে হারিয়ে গেল! শুধু একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা যায় থেকে থেকে এখনও স্বপ্নেরই মধ্যে "দাদাভাই গো।" বিশালাক্ষ্মীর দহ পেরিয়ে তখন ছুটছে সবাই। দহ পেরোতে গিয়ে অন্ধকারে কোলের আট মাসের বাচ্চাটা কীভাবে যে হাত ফসকে কোথায় পড়ল সুবালা এখনও তাকে ঘুমের মধ্যে শীতল অন্ধকারে খোঁজে। জলের অতলে

'বুধ সাঁতার দিয়ে মাটি তুলে আনে। কচি মুষ্টিবদ্ধ একটা হাত, তার গায়ে তখনও আঁতুড়ের রসুন তেল, কালোজিরের গন্ধ, সুবালা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে পারে না।

যে সব মানুষের উষ্ণ নিশ্বাস ক্রমাগত পাঁচ ক্রোশ রাস্তা পিছনে তাড়া করে আসছিল তা যেন কখন ফিকে হয়ে গিয়েছিল। পূব দিকের আকাশ ফাটিয়ে চরাচর লাল করে সূর্য যখন উঠল, তখন মানুষটা বলল "আর ভয় নাই, আমরা অইসা পড়ছি।"

আর তখনই আদর ককিয়ে কেঁদে উঠল। সেই কান্নায় সকালের যে সব পাখি বাসা ছেড়ে বেরিয়ে এতক্ষণ কিচ্‌মিচ্‌ করছিল, তারাও যেন কিছুক্ষণের জন্য শান্ত, স্তম্ভিত হয়ে গেল। আদরের বোবা আর্তনাদে ভাষা ছিল না।

মানুষটা সোহাগ করে ডাকল "আদর, মা মাগো—আদরিণী মা আমার।"

সুবালা চীৎকার করে উঠল "আদর কথা ক না, কী হইছে তর। কথা ক—আদর!"

সেই থেকে আদর আর কথা বলেনি। তারপর সাত সাতটা বছর কেটে গেল। আদরের মুখে কথা এলো না।

এই ভয়ঙ্কর বোবা আর্তনাদ সুবালার ঘুমের শেষ পর্দাটাকেও ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেয়।

সুবালা উঠে বসে। মা ষষ্ঠীর মানত মনে করে কপালে হাত ঠোকে।

মা ষষ্ঠীর কথা মনে হলেই মছলন্দপুরের ঠাকরুণের মূর্তিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই বিশাল পঞ্চবটিতে—ছোট চারচালায় অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী ঠাকরুণ। আসলে তা হয়ত নিছকই প্রস্তরখণ্ড—প্রাকৃতিক খেয়ালে এক পালল শিলা। তার গঠন আকৃতি বিশালাকার যোনিসদৃশ। ষষ্ঠী তো আদি জননীই—সন্তানবতী নারীদের পরম আরাধ্যা। বারো মাসের সাকুল্যে সাতাশটি ব্রতে এয়োতির সিঁদুর চর্চায় সেই পালল যোনিখণ্ড লালে লাল। এ সেই আদিমতম রজঃস্বলা প্রকৃতির প্রতীকমাত্র। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণাত্মিকা যোনিময় অবস্থিতি।

ভাবতে ভাবতে সুবালার শরীরে কাঁপ ধরে। কোনোমতে উঠে অন্ধকার ঠাহর করে লক্ষ্মীর কুলুঙ্গির সামনে এসে ধপ্‌ করে বসে পড়ে। পাঁচমাসের গর্ভ এরই মধ্যে শরীরটাকে ভারী করে ফেলেছে।

ভাবের আবেশে সুবালা কাঁদে—"বল দিয়ো মা, আমি মহাপাতকী, সাত সাতটা বছর তোমার পানে ফিরাও চাই নাই। তুমি অন্তর্যামী, সবই তো জান। মানুষটা সেই যে সাত বছর আগে, আমরই রাইখ্যা উধাও অইল! আপন মাইয়ারে দোষী কইরো না ঠাকরুণ! আপন মাইয়াডারে দোষী কইরো না ঠাকরুণ। তোমারই পোলাপানের মুখ চাইয়া আমি পাপ করছি ঠাকরুণ। এই সাতটা বছর তোমারে আমি ভুইল্যা আছিলাম ঠাকরুণ।"

সুবালা মাটিতে মাথা ঠোকে। অপরাধের ভারে সে অবসন্ন। অপরাধ কি কম! এই সাতটা বছরে আরো তিনটে বাচ্চার মা হয়েছে সুবালা। পাপের ফসল, তবু তো আপন গর্ভজাত—"গভ্ভো ফেলা যে মহা পাপ ঠাকরুণ। প্রাণে ধইরা পারি নাই মা গ। তর অধম সন্তানেরে খ্যামা দে মা—"

ভাসান প্রামাণিক—চরে থিতু হয়ে বসার সময় দেয় নি। বছর পেরোতে দেয়নি। তখনও সুবালা খোঁজে—সেই বিশালক্ষ্মীর দহের শীতল জলের তলে, সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে হারিয়ে যাওয়া কোলের ছেলেটার নরম হাতটাকে খোঁজে। এ স্মৃতি ধূসর হবার আগেই ভাসান প্রামাণিক এসে হাজির হল।

কাল ভোর হলেই ভাগীরথীতে চান সেরে লক্ষ্মীর আসন পাতবে সুবালা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, "আর নয়, মা—সাত বছর পরে আবার যখন তর আসন পাইতলাম, পাপের পথে আর নয়।"

চোখের জল সুবালার গাল বেয়ে নামে। "মা তুমি ত সবই জান—ওপার থেকে আইছিলাম এট্টা বোবা মাইয়া, আর এট্টা পোলার হাত ধইরা। পরের তিনডার বাপের নাম আমি জানি না।" সুবালা কাঁদে আর বলে "ভাসানেরে তো তুমি জানো—ও আমারে জাগা দিছে, ঘর দিছে, সরকারি তেরপল দিছে, আমার হাকিমেরে দিছে। ভাসান ত উডারে ভালোবাইসা দিছে, আমি তো উডারে গভ্ভে ধরিছি দশমাস দশদিন—উডা কী আমার পাপের ফসল, কও মা, কও।"

"পরের দুইডারেও তো আমি গভ্ভে ধরছি মা গ কও, জানিনা উয়াদের বাপ কেডা—কোন লরীর ডিরাইবার না খালাসী, না ধাবায় ফূর্তি কইরতে আসা আমুদে বাবুদেরই কেউ, নাকি কোনো চাষা—রাতে গোরুর গাড়ী লইয়া গঞ্জ ফেরতা হাতে দুইটা টাকা গুঁইজা দিয়া—জানি না, মা গ—"

সুবালা কঁকিয়ে কাঁদে। নিজের কান্না নিজেরই কানে এসে লাগে। একটানা ইনিয়ে বিনিয়ে বোবা কান্না। এই কান্না আবার টানে সুবালাকে—হতাশায়, অন্ধকারে।

ঘরের কোণে চাপড়ের সব সরঞ্জাম প্রস্তুত। শুধু সারাটা দিন উপোস করে বিকেলে চাপড় ভাসানো। সেই জলে, যেখানে ডুব দিয়ে আছে সাতরাজার ধন মাণিক, সুবালার বড় ছেলে—সে নাকি রোজগারের জন্য ফরাক্কা গেছে, সেও তো আর ফিরল না। পাঁচ-ছ'টা মাস কেটে গেল। আপন গর্ভে সস্নেহে হাত বোলায় সুবালা, গুনগুন করে বলে,

"চাপড় গেল ভেসে—ছেলে উঠল হেসে।"

জলের উথালপাথালের মধ্য থেকে মায়ের আঁচল ধরে ছেলেরা জল থেকে উঠে আসে। এত জল, এত ভয়ঙ্কর জল মায়ের শরীরে। সেই জলে হারিয়ে যায়, তলিয়ে যায়। সুবালার ক'মাসের কাঁচ ছেলেটা। জলের মধ্যে এখনও সুবালা চোখ বুজে তাকে খোঁজে। তার গায়ে যে এখনও আঁতুড়ের কালোজিরে আর রসুন তেলের গন্ধ।

তেষ্টায় গলাবুক ওর শুকিয়ে কাঠ। পাউলি তুলে গলায় ঢক ঢক করে জল ঢালল সুবালা। আর তখনি বাঁধের কোল থেকে পরপর শেয়াল ডেকে উঠল। রাত দু'প্রহর হল।

দরমার দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল সুবালা। দরজাটা কাঁপল থরথর করে—বাইরে হাওয়া ছেড়েছে—ভাদ্রের এই সময়টাতে এরকম হয়। হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জল বাড়ে। প্রথমে একটু একটু করে, তারপর ফুঁসে ফুলে—চরের এই পঞ্চাশ ঘর, খড়কুটোর মতো ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

একটু ঠাহর করলেই বোঝা যায়, বৃষ্টির ঝাপট ইতিমধ্যেই ঘরের একটা পাশকে আলুগা করে দিয়েছে। হাইওয়ের ঝোপড়ির জন্য তেরপল জোগাড় না হলে, ওখানে বসে ভিজতে হবে। উপায় অবশ্য একটা আছে—ভাসানের ধাবার হোটেলের পেছনে একটা ঘর; কিন্তু সেখানে রাতের বেলা আদরকে নিয়ে থাকতে সুবালারও ভয় করে। ট্রাক ড্রাইভার, খালাসি, চোরাচালানির দল, ছিনতাইয়ের দল—সারারাত ধাবায় এদেরই আনাগোনা। এদের মধ্যে আদরকে নিয়ে রাতে থাকা চোখ বুজে কুয়োয় ঝাঁপ দেওয়ার সামিল।

কোলের দুটো নেহাতই ছোটো। ওদের ভরসায় এই ভাদ্র পাড়ি দেওয়া—ক্লান্তিতে হাই তুলল সুবালা। যা থাকে কপালে, কাল সকাল থেকেই সে গেরস্থালির টুকিটাকি সরিয়ে ফেলবে হাইওয়ের ধাড়ের ঝোপড়িতে। ইতিমধ্যেই বেশ ক'ঘর চলে গেছে। আদরকে নিয়েই চিন্তা। বোবা মেয়েটার জন্য হাইওয়ের ধারে সারাটা রাত সুবালাকে জাগতে হয়। কাউকে বিশ্বাস নেই। বিশেষ এই রাতের ধাবা হল ভাসান পরামাণিকের রাজত্ব।

ভাসান না করতে পারে কি। সাতবছর আগে সেই যে ঘরের মানুষটা এখানে এই চরে তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল, তারপর এই চরের এই সংসারটুকু, বছর ঘোরার আগেই হাকিম পেটে এল—সবাই তো ভাসানের দেওয়া।

ভাসান নাকি চর থেকে রিফিউজি মেয়ে তুলে কোলকাতার বাজারে চালান দেয়। বুকের ভেতরটা সুবালার কেঁপে ওঠে।

বলতে গেলে সেই মানুষটার এই একটাই স্মৃতি পড়ে আছে। সুবালা তো তবু সংসারের স্বাদ পেয়েছে। মন্ত্রপুত পুরুষ মানুষ, ছাদনাতলা, উলুধ্বনি, শাঁখের শব্দ। বোবা মেয়েটাকে কে যে নেবে?

ছেলেরা এই চরে হয় ডোবে, নয়ত হাত পা হলে জল পেরিয়ে চলে যায়। তারা কেউ থাকে না। কোলের দুটোর মাথায় হাত বোলায় সুবালা।

মাণিক গেছে, ভেসে গেছে, পদ্মায় বা ভাগীরথীর জলে। ফরাক্কায় সে কাজ খুঁজতে গেছে। বিশাল জলরাশিতে ভাসতে ভাসতে সেই মানুষটার একটাই জীবিত বংশধর, কোথায় হারিয়ে গেছে। এই দুটোও হারিয়ে যাবে; এই ভাদ্রে জলের তোড়ে—নয়ত হাত-পা হলে সাঁতরে নদী থেকে দূরে সাগরে কিংবা উজানে। "চাপড় গেল ভেসে—ছেলে উঠল হেসে", সুবালা গুনগুন করে।

বয়স হচ্ছে সুবালার, এখন আর আগের মত ওঠ বললেই উঠতে পারে না।

প্রথম দুটো বছর ভাসান তাকে সুখেই রেখেছিল। সুবালা ঘর পেয়েছে, চাষের জন্য চরের ওপরে একটু জমি পেয়েছে। আর ভাসান তার চোরাচালানির দলে, খাবার মেয়েমানুষের কারবারে রুটি তরকা, মাংস মদের কারবারে ফিরে গেছে। ভাসান কি আদরের জন্য কিছু বিহিত করতে পারে? দুটো বছর তো সে সুবালারই সঙ্গে ছিল, স্বামী-স্ত্রীর মতই ছিল। না কি, আমিনা, বিন্দুর মেয়ে, শিউলি এদেরই মত আদরকেও বেচে দেবে ভাসান?

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে সুবালার। ঘুরে ফিরে আবার সেই মানুষটা স্বপ্নের দোরগোড়ায় এসে হানা দিচ্ছে। মাথায় লাল ফেট্টি পরা হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। চাপা স্বরে সেই ডাক—"সুবালা, আমার সোহাগ বালা।"

একটু কান পাততেই ঠাহর হয়, সেই মানুষটা না—ভাসান। এই রাত দুপুরে ভাসানই সোহাগ করে তার নাম ধরে ডাকছে। লোকটা কুটিল, নিষ্ঠুর, না করতে পারে এমন কাজ নেই—তবু ডাকে বড় মিষ্টি করে।

কাঁচা ঘুমটুকু ছেড়ে সুবালার উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই রাত দুপুরে ভাসান আসার অর্থ সুবালা বোঝে, যখন থেকে এই চরে বাসা বেঁধেছে তখন থেকে বুঝছে।

চুলটা ঠেলে মাথার পেছনে হাত খোঁপা করে নিতে নিতে একরাশ বিরক্তিতে দরমার ঝাঁপ সরায়।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ভাসানের মাথায় ছাতা নেই। সুবালা মুখ ঝামটা দেয়, "মরবার আর সময় পাও নাই, মিনসা। কইছি না, আইজ, কাইল দুইডা দিন আমারে খ্যামা দিতে হইবো। আমার বরত আছে।

একটু আগেই সোহাগ ঝরে পড়ছিল ভাসানের গলায়। এখন সে সাপের মতই হিসহিস করে উঠল, "গতর বেইচ্যা খায় যে মাগী, তার আবার বরত। তর বরতর নিকুচি কইর‍্যাছে। খদ্দের খাড়য়ে আছে। ন্যাকামু-খ্যাকমু রাইখ্যা চলু।"

"এই বাদলায় আমি যাইতে পারুম না। নিজেরটার লাইগ্যাও তো মাইনষের দরদ থাকে। হাকিমডার গা জ্বরে পুইড়া যাইতাছে।" সুবালা ঘরের দিকে ফিরতে উদ্যত হয়। পিছন ফিরেই বলে, "লক্ষণ ভালো ঠেকে না—জল বাড়বো, হয়ত ভোরের আগেই ঝাপটা দিব। আমি পারুম না ছোটঠাউর, যাও গিয়া। আমার ঘর সামাল না দিয়া—"

ভাসান সুবালার পথ আগলে দাঁড়ায়, "বাবুদের আমি খাড়া করাইয়া রাখছি। কইলকেতার বাবু। ভোর হইলেই যাবে গিয়া।"

পেছনের অন্ধকারের দিকে ভাসান একটু গলা তুলেই ডাক দিল, "আসেন না বাবু, দ্যাখেন আইসা—"

অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটো ছায়ামূর্তি দুকদম সামনে এগিয়ে আসে। কোলকাতারই বাবু বটে—পরিপাটি সাজগোজ, হাতে ঘড়ি। এই বাদলা মাথার

করে, ভিজে নেয়ে কোলকাতার বাবু তার গতর দেখতে এসেছে। সুবালার হাসি পেল—একটু যে লোভও পেল না, তাও নয়। হয়ত পঞ্চাশ কিংবা একশো। তাগিদ অনুযায়ী শরীরের দর। ভাদ্র-আশ্বিনের এই কঠিন সময়টা তখন চরে বানভাসি, হাইওয়েতে অস্থায়ী ঝোপড়ি—সরকারি রিলিফের খিচুড়িটা, গমটা জুটলেও টাকার পুঁজি তো ফেলনা নয়।

গত হপ্তায় তো ঘরে একটুও দানাপানি ছিল না। পাঁচটা টাকা দিয়ে কটা প্রাণীর মুখে অন্ন তোলার কেউ ছিল না। ছ'বছরের হাকিমকে ধাবায় পাঠিয়েছিল, যদি ভাসান ঠাকুরের দয়া হয়। হাজার হলেও ভাসান তো জানে হাকিম তারই। ভাসান টাকা দেয়নি। শরীরের গতিক যা ছিল তাতে পাঁচ মাসের উঁচু পেটের ওপর মানুষ তুলতে ভরসা হয়নি। আর সবার ওপরে ছিল ঠাকরুণ—ভাদ্রের এই চাপড় ষষ্ঠীর কথা সুবালা অনেকদিন ধরেই ভেবে রেখেছে। সামনে ভয়ঙ্কর দিন—ভাগীরথী—পদ্মা দুই বোন মিলেমিশে যাবার জন্য আকুলিবিকুলি। সন্তানদের জন্য মঙ্গল কামনার এর চেয়ে ভালো দিনক্ষণ আর কী হতে পারে?

ফচ করে টর্চ জ্বাললো একজন। সুবালার মুখের ওপর সে আলো পড়ে, তার গলাবুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমে নীচে নেমে গেল।

সুবালা এই নির্লজ্জ আলোর সামনে হাসল। তার দেবীপ্রতিমার মত মুখ, ঝকঝকে দাঁতের সার, একমাথা কোঁকড়া চুল—নমঃশূদ্র ঘরের ঘনীভূত এক অস্ট্রিক সৌন্দর্য হাসল।

ভাসান বলল, "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা, নেহাত আপনারা বইললেন,—"

ছয় সন্তানের মা এবং এখনও গর্ভবতী সুবালা নিজের মধ্যেই লজ্জা পেল। কীসের সঙ্গে কী? একবারের জন্যও তার মনে হল, তবুও তো মাথার চুলে তেল পড়েনি সাত দিন। তবু তো গায়ে খার ঘষিনি একমাস। কালই একবাড়ীতে ধান ভেনে পাঁচটা টাকা পেয়েছি। তিন কোশ যাওয়া আসায় মজুরী পোষায় না। তাইতে আজ দুটো ভাত পেটে পড়েছে। তাতেই এত?"

কোলকাতার বাবুদের একজন বলল, "কী হল, যাবে? না হলে আমরা এগিয়ে যাব। ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে ধাবার অভাব নেই। আর ধাবা পেলে মালও পাব, মাগীও পাব।" দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল।

মাগী কথাটা সুবালার কানে একটু লাগল কতই বা বয়স হবে ছেলে দুটির—তার বড় মেয়ে আদরের চেয়ে চার পাঁচ বছর বেশি। আর সাতটা বছর কাটলেই তার মাণিকও তো এমনিই হত। সে যে সেই কাজ খুঁজতে ফরাক্কায় গেল—আর এল না।

ভাটির টানে যারা ভেসে যায়, জোয়ার এলেও তারা আর ফিরে আসে না। সাতবছর ধরে গাঁ ঘরের, সেই চর মছলন্দপুরের পরিচিতিটা একটু একটু করে ধুয়ে মুছে গেছে, এখন শুধু সে আছে আর তার শরীর আছে।

মাঝরাতে উঠে একদিন তাকে না দেখে বোবা মেয়েটা তো ধাবার দিকে হাঁটা দিয়েছিল। রাতে আচমকা ধাবায় আদরকে দেখে সুবালা রাস্তার মাঝেই ঠাস

করে তার গালে চড় কষিয়েছিল। পিছনে মাতাল গোঁজেলের হল্লা ছিল—কুৎসিত ইঙ্গিত ছিল। একটা খালাসী তো আদরের হাতই চেপে ধরেছিল। বড় ভয় করে আজকাল। বোবা মেয়েটা বড় বড় চোখ মেলে সাঁঝবেলায় যখন সুবালার সাজ দেখে তখন বড় ভয় করে, লজ্জা করে। ভাসানের দেওয়া পাউডার তখন মুখে গলায় জবালা ধরিয়ে দেয়। ভুরুর ঠিক মাঝখানে কাঁচপোকাটিপ আঙ্গারের মত জবলতে থাকে। সুবালা নিজেও তখন ভেসে যেতে চায়—জলে, ভাটির স্রোতে।

আজ যেতে মন চাইছে না সুবালার, মোটা অঙ্কের টাকার হাতছানিতেও না। শেষবার নিজেকে সামাল দিয়ে ভাসানের হাত ধরল সুবালা—"মা ষষ্ঠীর কিরা, কাল চাপড়ের বরত আছে, মানতের পুজা। তুমি আমারে ছাড়ান দাও ভাসান ঠাউর। বাঁশি আছে, লক্ষ্মী আছে, বিন্দু আছে—ধাবায় কি মাগীর অভাব আছে!"

ভাসানের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবালা একটু গলা তুলেই বলল, "তোমার তো ধম্মাধম্ম নাই ঠাউর। নেহাত মা ষষ্ঠীর নামে আছি তাই বলা।"

ভাসান অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। সেও গলা তুলে বলল, "ম্যালা প্যাচড় পারিস না সুবালা। কাপড়টা বদলাইয়া আয়। বেউশ্যের আবার ষষ্ঠীপুজা।"

অন্ধকারের দিকে মুখ বাড়িয়ে ভাসান বলল, "চলেন বাবু, আপন্যারা আগান। আমি অরে লইয়া আইতাছি।"

সুবালার দম আটকে আসছিল, বমি পাচ্ছিল, বুকের খুব কাছে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। পায়ের নীচে মাটি দুলছিল। নিজেকে ঝাঁকি দিতে গিয়ে সুবালা কঁকিয়ে ওঠে, "আমার গভ্ভের ছাওয়ালডার কথাও ভাব্‌বা না ভাসান ঠাউর? তুমি কি মানুষ না পশু?"

এর উত্তরে ভাসান জানাল, কোলকাতার চার বাবুর কাছ থেকে তার একশোটা টাকা নেওয়া হয়ে গেছে। এটা আগাম—খুশি হলে আরো দেবে। ওরা উত্তরবঙ্গ থেকে এখন কোলকাতা ফিরছে। নেহাত কপালজোর না হলে এমন ফুর্তিবাজ খদ্দের ধাবায় বড় একটা জোটে না। এখন সুবালা যদি না যায়, তবে ভাসান নাচার। টাকা যখন নেওয়া হয়ে গেছে, কথা যখন দেওয়া হয়ে গেছে—ভাসানের কাজ ভাসান করবে।

ভাসানের সাপের মত নিথর চোখ অন্ধকারেও জবলছিল। ভয়ে সিঁটিয়ে যেতে যেতে অস্ফুটে সুবালা বলল, "কী করবা তুমি, ভাসান ঠাউর, আমার কোন্ সব্বোনাশটা তুমি বাকি রাখছ?"

ভাসান তার স্বভাবসিদ্ধ চাপা গলায় বলল, "মুখে কাপড় গুইজ্যা তোর আদরডারে আইজ ধইর‍্যা লইয়া যাব। রাইত পোয়াইতে এখনও দুপহর বাকি আছে সুবালা।"

কাপড় বদলে, মুখচোখ একটু মেজে ঘষে সুবালা যখন ভাসানের পিছু পিছু বেরিয়ে এল তখনও ঘরের আর চারটি প্রাণী অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। পশ্চিমে, পুবে ভাগীরথী আর পদ্মার গর্জন হয়ত তাদের কানে যাচ্ছে না। মেঘের সঙ্গে মেঘের ধাক্কা লেগে আকাশ কালো হয়ে উঠছে। মেঘের গুরুগুরু শব্দে, চরের আলগা

মাটিতে ফাট ধরছে। পায়ের নীচে মেদিনী কাঁপছে। সুবালা আর্ত কণ্ঠে বলল, "আমারে ছাইড়্যা দাও ভাসান ঠাকুর। আমার বড় ডর লাগে।"

আর তখনই সুবালার ঘরের ঠিক পিছন থেকে ক' ক' করে নিরবচ্ছিন্ন একটা শব্দ তীব্রতর হয়ে উঠতে উঠতে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

ভাসানের পিছন পিছন যেতে যেতে সুবালা একবার মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দিকে তাকাল। ভাসান বলল, "সাপে ব্যাঙ ধরছেরে সুবালা, আর ছাড়ান নাই।"

হাইওয়েতে ওঠার আগেই মুষল ধারে বৃষ্টি নামল।

ঘণ্টা মিনিটের হিসেব ছিল না। সুবালার শরীর ভিজছিল। মাঝরাতে যে ঝড় মাথায় নিয়ে সুবালা ঘর থেকে বেরিয়েছিল, হয়ত সেই ঝড়েই পরে কোনো একসময় এ ঘরের চালাটাও উড়ে গেছে। তখন সুবালার চেতন ছিল না। তখন সুবালা সুবালাতে ছিল না।

সেই যে ভাসান টর্চ ধরে ঘরটার দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল, সুবালা মনে করতে চেষ্টা করে তখন পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিল। ঘরের এককোণে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। বাইরে ঝড়ের মাতন থেকে থেকে দরজায় ভেঙে পড়ছিল। ঘরের ভেতরে টেপ্‌রেকর্ডে বিলিতি বাজনা বাজছিল। ধাবার কল্যাণে বাজনার যন্ত্রটা সুবালা ভালোই চেনে। বর্ডার থেকে ভাসানও দু-চারবার ওই বাজনার যন্ত্রটা এনেছে—ওই যন্ত্রেই সে একবার আব্বাসের গান শুনেছিল—চরে, তার ভাঙা ঘরে বসে।

বিলিতি বাজনা চালিয়ে কোলকাতার চারবাবু উদ্দাম নৃত্য করছিল। সুবালা ঘরে ঢুকতেই দমকা হাওয়ায় মোমবাতিটা নিভে গিয়েছিল। আর এক তীব্র চীৎকার দিয়ে চারটে জোয়ান শরীর সুবালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর আর সময়ের হিসেব নেই। কখন যেন সুবালা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।

এখন সুবালা নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। এই ঘর তার চেনা। মেঝেতে মান্ধাতা আমলের শতরঞ্চির ওপর শতচ্ছিন্ন তোষকে বহুবার চিত হয়ে শুতে হয়েছে সুবালাকে। আজ যেখানে বাহারি নক্‌শাকাটা চাদর, সুবালা জানে, সবদিন সেটা থাকে না। খদ্দের বুঝে ভাসান প্রামাণিক চাদরের বন্দোবস্ত করে। নিজেকে খুঁজে পেতে সুবালা চাদর তোষক খামচে ধরে। হাতে এতটুকু জোর নেই। কোমরের কাছ থেকে নিম্নাঙ্গ অসাড়। উঠে বসতে গিয়েও সুবালা পারে না। মাথায় কেমন একটা ঘোর এখনও লেগে রয়েছে।

ফাঁকা ছাদের মধ্যে দিয়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে সুবালার মুখেচোখে, উদোম বুকে, নাভিতে। তোষক চাদর ভিজে জবজবে। আকাশে মেঘের পরে মেঘ—ঠাহর হয় না সকাল না সন্ধে। ঘরের দেয়ালে কোনো জানালা নেই। দরজাটা খোলা—হাওয়ায় মাঝে মাঝে খুলছে, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দরজাটা

খুলে গেলে ভাসানের খাবার পিছন দিকের দেওয়াল দেখা যায়। সেখানে সিনেমার পরিচিত অর্ধনগ্ন যুবতীদের পোস্টার সাঁটা—বৃষ্টিতে কোনোটা আধখোলা হয়ে উড়ছে, কোনোটা ভিজেই দেয়ালের গায়ে সেঁটে রয়েছে।

ঘরের দিকে চোখ ফেরাল সুবালা। দুটো পরিত্যক্ত মদের বোতল, ক'টা গ্লাস, দু-তিনটে কাঁচের প্লেট। ঘরভর্তি সিগারেটের টুকরো। ঘরের এককোণে কুণ্ডলী-পাকিয়ে থাকা খাবার কালো সাদা কুত্তীটাকেও দেখতে পেল সুবালা।

বাইরের দিকে কান পেতে মানুষজনের গলা পাবার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ, বারবার ভাসানের নাম ধরে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকারও চেষ্টা করল। কালরাতে গলা দিয়ে কখন নেমেছে সুবালার খেয়াল নেই, এখন ঝাঁঝালো মদের একটা তেতো ঢেঁকুর বুক-গলা জ্বালিয়ে দিয়ে মুখে এসে হাজির হল। বমির দমকে মাথাটা তুলতেই দেখল, কোমরের নীচ থেকে সমস্ত বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

নিজেকে ফিরে পেতে পেতে সুবালার বুঝতে অসুবিধা হল না, এ রক্ত তার রক্ত, তার গর্ভস্থ অপরিণত সন্তানের রক্ত। সুবালা আবার তলিয়ে যেতে থাকে—তন্দ্রায় নয়, গাঢ় ঘুমে নয়; অন্য এক অবলুপ্তিতে যেখানে ইন্দ্রিয়গুলি ছোট একটা বিন্দুর মত উথাল-পাথাল সমুদ্রে দোল খেতে খেতে ডোবে আর ভাসে, ভাসে আর ডোবে।

একবার চোখের সামনে মছলন্দপুরের সেই ষষ্ঠীতলা ভেসে ওঠে। ষষ্ঠী এখানে যোনিময় সিন্দুর চর্চিত, অনন্তকাল রজঃস্বলা। আদরকে পাশে বসিয়ে ডালের চাপড়, ক্ষীরের চাপড় তৈরী করে সুবালা। আদর চাপড় ষষ্ঠীর কথা পড়ে—আদর কথা বলে—এক বামুনের সাত ছেলে, সাত বৌ মাগো, সাত ছেলে আর সাত বৌ। ছোট ছেলের দুই ব্যাটা—আর বৌ সব বাঁজা মাগো, আর বৌ সব বাঁজা। আদর চাপড় ষষ্ঠীর কথা পড়ে—দুলে দুলে আদর কথা বলে।

পুকুর কাটে উরা, মাগো, পুকুর কাটে উরা। পুকুরে জল নাই, গভীর পুকুর তল নাই—মাগো সেই পুকুরে জল নাই।

তারপর ষষ্ঠীর আদেশে বামুন ছোট বৌ-এর ছোট ছেলেকে কেটে পুকুরে রক্ত দেয়। সুবালা দেখে—জ্বরে হাকিম পুড়ে যাচ্ছে, চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে হাকিমের রক্ত পড়ছে। রক্তে তোষক-চাদর ভেসে যাচ্ছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরয় না, তবু চীৎকার করে উঠতে চায় সুবালা—"ঠাকরুণ, দুইডারে তো লইছ, ওইডারে ছাইড়্যা দাও, ঠাকরুণ—ওইডারে ছাইড়্যা দাও। ওডারেও আমি গভ্ভে ধরেছি।"

সুবালার স্বর স্পষ্ট হওয়ার আগেই ডুবে যায় শ্বাসনালীতে, ফুসফুসে। এয়োদের শাঁখ, উলুর শব্দের মধ্যে চাপড় পড়ে—পুকুরে জল উঠেছে যে। চাপড়ের আশীর্বাদে, বামুনের ছোট নাতির রক্তে উথালপাথাল করে জল ওঠে। "চাপড় গেল ভেসে—ছেলে উঠল হেসে"—এয়োতিরা চাপড় ভাসায়, উলু দেয়। শাঁখ বাজে। তাদের আঁচল ধরে ছেলেরা জল থেকে উঠে আসে।

ঠাহর করে দেখল সুবালা, সত্যিই শাঁখ বাজছে। তবে কি ভাগীরথী আবার

ফুঁসে উঠেছে। তবে কি চরের ঘর-গেরস্থালি আবার বানে ভেসে গেছে। হাইওয়ে কিছুটা দূরে। অন্ধকার অতি দ্রুত ঘন হয়ে নেমে আসছে। সুবালা সমস্ত শক্তি একত্র করে বসবার চেষ্টা করে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

ঘোরের মধ্যে শুধুই মেঘের গুরুগুরু। দুই নদীর মিলিত গর্জন, শাঁখের শব্দ। চোখ বুজেও সুবালা দেখে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তার শেষ জারজ সন্তান দুটিও ভেসে ভেসে দক্ষিণে চলেছে।

ভাসানের ধাবার পেছনে এই ঘরটার দিক থেকে ছোটো একটা শুঁড়িপথ পেরিয়ে গেলেই ডানদিকে ভাগীরথীর চর, তারপর আর দুটো বাঁক ঘুরলেই নদী।

ধাবায় যারা দেহ বেচে, সকালে ধোয়া পাখলানোর জন্য ভাগীরথী যেতে তারা এই পথটাই নেয়। সুবালারও অচেনা নয় এই পথ। ওদিকে, ধাবার সামনেটায় হাইওয়ে, লোকজনের সামনে পড়ে যেতে হবে বলে কিছুটা আবডাল। তাছাড়া হাইওয়ে অনেকটা উঁচুতে। নদীর বালিয়াড়ি এপাশটায় ধাপে ধাপে নেমে গেছে নদীগর্ভে।

কোমরের কাপড়টা শরীরের ওপর একপাক জড়িয়ে নিয়ে সুবালা হাঁটে। এত ঘন অন্ধকারে আন্দাজমত পা পড়ে না, শরীরে ধাক্কা লাগে—পেটের ভেতর সেই ধাক্কা কঠিন হয়ে লাগে। বালির বুকে রক্তের আলপনা আঁকতে আঁকতে সুবালা নদীতে যায়।

আজ যেন অতদূর হাঁটার আগেই নদীর জল সুবালার পা ছুঁয়ে দেয়। অবসন্ন সুবালা বসে পড়ে। এতো তার চেনা বালিয়াড়ি। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর ভাবনা সুবালাকে গ্রাস করে। হামাগুড়ি দিয়ে একবুক জল ভেঙে সে সামনে আরো হাতপাঁচেক এগিয়ে যায়। এখন রাত, আকাশে যদিও তারা নেই—চোখের সামনে বৃষ্টির গুঁড়িগুঁড়ি পর্দা ; তবুও যতদূর নজর যায় চরের পঞ্চাশ ঘরের কোনো অবশেষ দুপাশের চরের ওপর নজর পড়ল না।

একটু এগিয়ে এসে পিছন ফিরে হাইওয়ের দিকে তাকাল। মাঝে মাঝে ট্রাকের আলো জ্বলছে, নিভছে—সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ধাবার কাছাকাছি কটা মশাল, পেট্রোম্যাক্স। একটা মাত্র রাত্রি, একটা মাত্র দিনে—আর কী কী ঘটেছে জানার জন্য সুবালা মাথাটা ঘাড়ের ওপর আর সোজা রাখতে চায়, পারে না।

জলের মধ্যে মুখ গুঁজে সুবালা কাঁদে। চোখের জলে আর বন্যার ঘোলা লাল জলে একাকার হয়ে যায়। আরও একবার চরের ওপর জীবনের এতটুকু লক্ষণ খুঁজে পাবার জন্য সুবালা মাথা তোলে। শরীরে যতটুকু রক্ত তখনও অবশিষ্ট আছে—সেই রক্তে যতটুকু প্রাণ আছে, সবটুকু একত্র করে সুবালা চীৎকার করে উঠল, "আদর—আদর রে!"

আবার জলের ভিতর মুখ গুঁজে দিতে দিতে দেখল, মছলন্দপুরে সুবালার

পাশে বসে সাত বছরের আদর সুর করে চাপড়ার মন্ত্র পড়ছে—"চাপড় গেল ভেসে, ছেলে উঠল হেসে।" এ মন্ত্র এয়োতিদের মন্ত্র, সন্তানবতী রমণীদের মন্ত্র।

সহসাই সুবালার মনে হল, কে যেন তার আঁচল ধরে টানছে। সেই চাপড় ষষ্ঠীর দয়ায় ছোট বৌ-এর আঁচল ধরে ছোট ছেলে যেমন পুকুর থেকে উঠে এসেছিল—তেমনি টান, মৃদু, কোমল। নাক গুঁজে দিলেই জলে এখনও আঁতুড়ের কালোজিরে, রসুন তেলের গন্ধ পাওয়া যাবে। বিড়বিড় করে সুবালা বলে—"চাপড়া গেল ভাইস্যা—মাণিক উঠে হাইস্যা"—ঘোলা জল গলার ভেতর ধাক্কা দেয়। তবু সুবালা চেঁচিয়ে বলে; "চাপড়া গেল ভাইস্যা, আমার নোটন ওঠে হাইস্যা।" সেই তাড়াখাওয়া জন্তুর মত পালাতে গিয়ে হাতের ফাঁক দিয়ে বিশালাক্ষ্মীর দহে কোলের আট মাসের যে বাচ্চাটা পড়ে গিয়েছিল, এখন জলের মধ্যে সুবালা যেন তার কচি মুষ্টিবদ্ধ হাতের স্পর্শ পায়।

ষাট ষাট ষষ্ঠীর ষাট। ষাট বালাই, ষষ্ঠীর ষাট। সুবালার মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটে ওঠে। আঁচলে তার বড়ই টান লাগছে।

শুধু শেষবার জলের মধ্যে মুখ গুঁজে দেবার আগে সুবালা ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখল তার আঁচল ধরে হাজারে হাজারে ছেলে জল থেকে ডাঙায় উঠে যাচ্ছে। তাদের মাথায় লাল ফেটি, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি; তারা জল থেকে জমির দিকে হেঁটে গেল।

পরদিন সকালে এই বদ্বীপ অঞ্চলের পঞ্চাশঘর মানুষ নুরপুরের কাছের এই ধাবা থেকে মিছিল করে জঙ্গীপুর রওনা হল। এই বিধ্বংসী বন্যায় তারা সর্বস্বান্ত। তাদের খাবার নাই। মাথা ঢাকার তেরপল নাই। পরনের কাপড় নাই। এখন তারা হাইওয়ের ধারেই থাকবে। ভাদ্র-আশ্বিনের জলের এই বাড়বাড়ন্ত কমে গেলে কার্তিকের মাঝামাঝি যখন জলে টান ধরবে তখন এসব মানুষরা আবার চরে নামবে।

চরের পঞ্চাশ ঘর, আরও এপাশ ওপাশ কিছু চরের লোক নিয়ে মিছিলে লোক পাঁচ-ছশোর কম হল না।

এদের হাতে লাল পতাকা ছিল না। কারণ কর্তাব্যক্তিরা বলেছেন, এত তাড়াতাড়ি পতাকার যোগান দেওয়া যাবে না। তবে হাতে হাতে কলাই-এর সানকি ছিল, বাটি ছিল। মিছিল করে জঙ্গীপুরে মহকুমা শাসকের কাছে গেলে নিদেনপক্ষে একপোয়া চিঁড়ে আর এক খাবলা গুড় তো পাওয়া যাবে।

অসংগঠিত এইসব মিছিলের সামনে ফীবছর যেমন দেখা যায়, এ বছরও ভাসান পরামাণিককেই দেখা গেল।

# চামচা-সমাচার অথবা বাবুলালের শ্রেণী-অবস্থান

আমি সুধাংশু সরকার ওরফে বাবুলাল।

ধর্ম্মাবতার, চিনতে পারছেন ? পারছেন না তো ! জানতাম, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। চিনবেন কী করে ? মুখ দেখে আমাকে চেনার কোনো উপায়ই ওরা রাখে নি।

আপনি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমার দুটো চোয়ালের হাড়ই ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। কলার বোনের অবস্থাও তাই। বুকের গোটাকতক পাঁজর নাকি পিঠেলাগানো কব্জা থেকে খুলে গেছে।

মানুষ তো মানুষকে চেনে মুখ দেখে। গোটা মুখটার মধ্যে কোনোমতে আমার একখানা চোখ আর নাকের ফুটো দুটো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত বাকি সবটাই তো ব্যাণ্ডেজ-প্লাস্টারে ঢাকা। নিম্নাঙ্গে খানিকটা বাদ দিয়ে আবার প্লাস্টার। পাছার একটা পাশ থেকে পুরো একটা পা একদিকে—অন্যদিকে হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। ব্যাণ্ডেজ আর প্লাস্টারজড়ানো মিশরের মমির মত আমার শরীরটা দেখে আপনি কেন, আমার মা-ও আমাকে চিনতে পারতেন না।

তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল, ধর্ম্মাবতার—আপনি চিনলেও চিনতে পারেন আমাকে। এই তো একমাস আগে আপনি আমাদের পাড়ার সরু গলিটাতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। আপনি নিজেহাতে আমাদের সার্বজনীন কালীপুজোয় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন। আপনার সঙ্গে আমাদের নতুন এম. এল. এ ছিলেন, পাড়ার আরও সব মান্যগণ্য লোকজন ছিলেন। আমিও ছিলুম ধর্ম্মাবতার, কালীপুজোর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমিও ছিলুম। আপনার টুসুকিকে মনে আছে, সেই যে মেয়েটা—আপনার হাতে উন্মোচনের দড়াটা তুলে দিয়েছিল ? সেই টুসুকির পাশেই তো আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আপনি দড়া টানতেই মূর্তির সামনে টাঙানো পর্দা দুপাশে সরে গেল—আমরা হাততালি দিলাম. টুসুকি আর পাড়ার কাঁচ-কাঁচা মেয়েরা শাঁখ বাজাল, বড়রা উলু দিল। তারপরেই এল.

পি. রেকর্ডে সানাই বেজে উঠল। আপনি সেই ফাঁকে আড়চোখে একবার টুসকির মুখ, একবার তার ডবডবে বুকজোড়ার দিকে তাকালেন—আমি দেখেছি, ধর্মাবতার।

টুসকির ভালো নাম সুজাতা। বয়সের দোষই বলুন আর যাই বলুন, টুসকির একটু দুর্নাম আছে বাজারে। হ্যাঁ ওই বুকজোড়ার জন্য, কচি-কাঁচা ছেলেপুলেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্ট করার জন্য। আমার সঙ্গেও ভাবসাব ছিল এক সময়, আমি বোধহয় বিয়েও করতে চেয়েছিলুম। তা আমার ধরুন চাল নেই, চুলো নেই—মা আছে, ও পাড়ার তিরিশ বছরের ভাড়াটে হিসেবে দেড়খানা ঘর আছে—তাহলেও যাকে বলে সুপাত্তর, আমি তো তা ছিলাম না কোনোদিনই। টুসকির সঙ্গে বিয়ে হয় নি বলে আমি যে দেবদাস হয়ে গিয়েছি, এমন যেন ভাববেন না ধর্মাবতার। ভালো ছেলে পাওয়া যাবে না, টুসকির বিয়ে হবে না। আর ধরুন গে আমিও ভালো ছেলে, যাকে বলে চাকরে, রোজগেরে ছেলে নই বলে আমারও মেয়ে জুটবে না। আমরা, ও পাড়ার ছেলে-মেয়েরা এ ব্যবস্থাটা মেনেই নিয়েছি, ধর্মাবতার। তবু দরকারমত পাই—এখনও পেয়ে যাই টুসকিকে, গলির অন্ধকারে, আমার ঠেকে—গলির মোড় পেরিয়ে বড় রাস্তাটার ডানদিকে রুপালি রেস্তরাঁয়। গায়ে-টায়ে একটু-আধটু যে হাত রাখা যায় না তাও নয়। তবে টুসকির আজকাল খাঁই বেড়েছে, খদ্দেরও পেয়ে যাচ্ছে দু-চারটে। ফলে সব সময় চাইলেই টুসকিকে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন নয়, ধর্মাবতার। টুসকির জন্য এখন নগদ মাল ছাড়তে হয়।

সেদিন লালপেড়ে শাড়িতে টুসকিকে বড় সুন্দর লাগছিল। তা নাহলে ধর্মাবতার, ধরুন আপনার মত বড় মানুষের নজরও তো অনেককে ছেড়ে টুসকির ওপরেই—যাক্ সে কথা। ওইদিনই রাতে পচার দোকানে, মানে ওই রুপালি রেস্তরাঁতে চা খেতে খেতে টুসকিকে আমি সেই কথাটা বললুম। টুসকি মানতে চাইল না—বলল, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, তায় জজসাহেব—আপনার নজর নাকি অতখানি নিচু হতে পারে না।

টুসকির খদ্দেরদের মধ্যে তবে কি কোনো ধর্মাবতার নেই—চৌরঙ্গিপাড়ায় ওর খদ্দেরদের মধ্যে একটাও জজসাহেব নেই?

অপরাধ নেবেন না ধর্মাবতার। আজ সাত-আট বছর চামচেগিরি করে আমার শালা নজরটাই একদম খারাপ হয়ে গেছে। শালারা জেনেশুনেই বোধহয় আমার একটা চোখ সেজন্যেই কানা করে দিয়েছে। চোখটার ওপরেও একটা ঠুলির মত ব্যাণ্ডেজ। আপনি আমাকে চিনবেন কী করে? শুধু একখানা চোখ, আর দুটো নাকের ফুটো, ঠোঁটের একটা অংশ দেখে কি মানুষ চেনা যায়, ধর্মাবতার?

তবে একটু চেনা দেবার চেষ্টা করি, ধর্মাবতার। কেসটা তো আপনি জানেন। যদিও সরকারি পক্ষের উকিল যখন এই কেসটার ধারা-উপধারার ফিরিস্তি পড়ছিলেন, তখন আপনি নাকের ফুটোয় তর্জনি ঢুকিয়ে নাকের চুল ছিঁড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবু আমি জানি, আপনি সব শুনেছেন, এমনকি

কিছু না শুনেও আপনি সব জানেন। উকিলসাহেব যখন আমার নাম ধরে ডাকলেন, আর পুলিসের হাবিলদারটি আমাকে কাঠগড়ার দরজা খুলে ভেতরে ঠেলে দিল, তখন আপনি ব্রিটিশ পিরিয়ডে তৈরি হওয়া এই বাড়িটার কড়িকাঠ দেখছিলেন। রোজই দেখেন, আজও দেখছিলেন। এতে দোষের কিছু নেই, ধর্মাবতার। কারণ ওই সরকারি উকিল, আমার পক্ষের উকিল—আমি এখনও ঠিক জানি না এই কেসে কেউ এসেছে কিনা, আসলে এসব তো ঘোতনদা, মানে আমাদের এম. এল. এ. ই ব্যবস্থা করে এতকাল করে এসেছে, সবাই বিশ্বাস করি নাকের চুলই ছিঁড়ুন বা কড়িকাঠই গুনুন, আপনি সর্বজ্ঞ, ভগবানের মত। আমরা তো সেইজন্যই, ভুল হলে ক্ষমা করবেন, আপনাকে ধর্মের অবতার বা সরকারি উকিল দুবার যেমন বললেন, মাই লর্ড—তাই মনে করি।

ধর্মাবতার, আমি আপনার সঙ্গে আমড়াগাছি করছি এরকম ধারণা করবেন না যেন। আমরা তাবৎ চামচারা—জানেন তো লোকে আড়ালে আমাকে ঘোতনদার চামচে বলত, অস্বীকার করব না এই আমড়াগাছিটা মোটামুটি রপ্ত করেছি—করতে হয়েছে। কিন্তু মাইরি বলছি আপনার সঙ্গে সেভাবে আমড়াগাছি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু একটু চেনা দিতে চাইছি—আমার নিজের স্বার্থে, বিচারের স্বার্থে, মী-লর্ড।

আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন, মী-লর্ড? আমাকেই দেখছেন, নিতান্তই অভ্যাসবশে যেমন দেখেন? আপনি আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মুখের দিকে তাকিয়েও কেমন করে না দেখতে হয় কোনো কোনো ভদ্রলোক সেটা জানেন। আমি অনেক দাম দিয়ে এটা জেনেছি ধর্মাবতার, তবে আপনার কথা আলাদা। ঈশ্বরের মত আপনিও না তাকিয়েই, দেখতে পান, মী-লর্ড। আমরা সবাই অন্তত তাই বিশ্বাস করি।

সাতষট্টি না আটষট্টি শেয়ালদার লোয়ার কোর্টের কাঠগড়া। আপনি হুজুর এই রকমই চেয়ারে বসে। বয়সটা কম ছিল বলে কিঞ্চিৎ চন্মনে কিংবা আমার ভুলও হতে পারে। চেয়ারে ছারপোকা থাকলে, সেই চেয়ারে বসেও মানুষ অনেক সময় উসখুস করে। আপনাদের মাথার ওপরে চেয়ারের পেছনে এখন এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরাজী। শেয়ালদা কোর্টে দেখেছিলাম গান্ধীজী। চেয়ারের পেছনে মাথার ওপরে গান্ধীজীদের ছবি থাকে কেন, আমি ঠিক জানি না। ঘোতনদার পার্মানেন্ট উকিলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনিও বলতে পারেন নি। ওঁদের কেউই তো ধর্মাবতার ছিলেন না। গান্ধীজী শুনেছি নাকি, বইতেও পড়েছি, আফ্রিকাতে কিছুদিন ওকালতি করেছেন। কিন্তু সেই কারণেই ধর্মাবতার তিনি আদালতে মাথার ওপরে ঝুলছেন, এটা যদি ফ্যাক্ট হয়, ইন্দিরাজীর ছবি ঝোলার মানেটা কেমন যেন বোঝা যায় না। তিনিও কি কোথাও ওকালতি করতেন? প্রশ্নটা আমি ঘোতনদাকেও করেছিলাম। ঘোতনদা বলেছেন, কিছু কিছু প্রশ্ন নাকি আমাদের মানে চামচাদের করতে নেই। এটাও সেরকম প্রশ্ন।

তা সে যাই হোক—শেয়ালদা কোর্ট, আজ থেকে আট বছর আগে! ধম্মাবতার, আপনার সঙ্গে আমার সেটাই প্রথম সাক্ষাৎকার।

আমার তখন শুধু ভালো নামটাই ছিল। চারবছর আগে কুঁতে-কঁকিয়ে ইস্কুলের স্যাররা বলতেন নাকের পাশ দিয়ে কানের পাশ দিয়ে তরে গেছি—মানে এইচ. এস. পাশ করেছি। জুটমিলে লক্‌আউট—বাবা বেকার, এটা-ওটা করে কিছু পয়সা আনেন। মা বাড়িতে খবরের কাগজের ঠোঙা বানান। চামচা-উৎপাদনের জন্য এর চেয়ে উর্বর মাটি আর কোথায় পাবেন, ধম্মাবতার? ফলে চামচা হওয়া আমার পক্ষে একেবারে দৈবনির্দিষ্ট ছিল বলতে পারেন, মী-লর্ড।

আমার এক মামা জ্যোতিষচর্চা করতেন। তিনি বাবাকে বলেছিলেন, শনি না কী যেন বক্রী, মানে কি বাঁকা—ত্রিভঙ্গমুরারি হওয়ার জন্য জুটমিলে লক্‌-আউট হয়েছিল। সেই শনিকে সোজা করার জন্য আমাদের বাড়িতে মায়ের তৈরি ঠোঙা-বেচা পয়সাতেই শনিবার উদ্‌যাপিত হত সারাবছর ধরে। শনির ইমপর্টান্স আমি ইস্কুল-লাইফে খানিকটা বুঝেছি—শনিবার ইস্কুলে হাফ-ছুটি হত। আমরা ম্যাটিনিতে একত্রিশ পয়সার টিকিটে দেবানন্দের ছবি দেখতে যেতাম। দেবানন্দকে জানেন তো, ধম্মাবতার—ফিলিমস্টার।

এরপর শনির ইমপর্টান্স বুঝলাম আমাদের বাড়িতে। ফি-শনিবার দুধরে, আটারে, কলারে—তারপর গামলা গামলা সেই আটাগোলা, ফলমূলের জোগাড় দিতে দিতে মায়ের আটগাছা ব্রোঞ্জের চুড়িও একদিন হাপিশ হয়ে গেল। বক্রী শনিকে বাবার জীবদ্দশায় আমি আর সোজা হতে দেখি নি।

আমার বাবা একটু-আধটু ইউনিয়ন করতেন, ধম্মাবতার। সেই ইউনিয়নের নেতা ছিলেন এক মন্ত্রী—ফুল-মন্ত্রী নয়, হাফ্‌ না সিকি, কী যেন। বাবা তখন মাঝে মাঝে হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনে ইউনিয়নের চাঁদার জন্য কৌটো নাড়তেন। কৌটোর মধ্যে কিছু তামার পয়সা তিনি বাড়িতে নিজেই ফেলে দিতেন। সেই তামার পয়সাগুলো সুদ্ধ ঝাঁকালে বেশ আওয়াজ হত, ঝম্‌ঝম্‌, ঝম্‌ঝম্‌।

বাবা গোড়ার দিকে ইউনিয়ন অফিসে কৌটোর সব চাঁদা জমা দিয়ে আসতেন। কিন্তু ধম্মাবতার, দিনের পর দিন চলে গেল—বছর ঘুরতে চলল—তখন লোকজনও আর চাঁদা দিত না। বাবাও আর চাঁদার কৌটো নিয়ে ইউনিয়ন অফিসে জমা দিতে যেতেন না। দু-চার টাকা যা হত, রাতে বাড়ি ফিরে কৌটো খুলে বের করে নিতেন। আবার তামার পয়সা ভরে 'সংগ্রামী শ্রমিকদের সাহায্য তহবিলে'র লেবেল লাগিয়ে পরদিন ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়তেন।

এভাবে ভালো না চললেও, চলে যাচ্ছিল ধম্মাবতার। কিন্তু চলল না খুব বেশি দিন। বাবার মধ্যে কিছু কিছু মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা যেতে আরম্ভ করল।

একদিন কৌটোর চাঁদার পয়সা দিয়েই কেনা ইঁদুর-মারা বিষ খেয়ে বাবা আত্মহত্যা করলেন।

জুট-মিলের গেটে বাবার স্মরণসভায় সেই সিকি-মন্ত্রীকে আমি স্বচক্ষে

দেখলাম। অত কাছ থেকে কোনো মন্ত্রীকে আমি এর আগে দেখি নি।

আমার পরনে কোরা থান, গলায় চাবিসহ কাছা, হাতে কম্বলের আসন। মা-ও আমার সঙ্গে এসেছিলেন, সদ্য-বিধবার পোশাকে। স্মরণসভায় আমাদের ওইভাবেই যাওয়ার নির্দেশ ছিল ইউনিয়ন থেকে। জনগণকে সচেতন করা এবং শ্রমিকদের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলা, সেই সিকিমন্ত্রী—ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট, এজন্যই আমাদের মঞ্চের ওপর তাঁর পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন অশৌচের পোশাকে।

ধর্মাবতার, সেদিন ওই অশৌচ অবস্থাতেই চামচাগিরিতে আমার দীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। সেই মন্ত্রী বেগ দিয়ে, আবেগ দিয়ে যখন আমার বাবার গুণপনা বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছিলেন, আমার কান্না পাচ্ছিল ধর্মাবতার। মা মঞ্চের ওপরেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এতে করে সংগ্রামী ঐক্য কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমার জানা নেই, তবে শ-খানেক শ্রমিক ছাঁটাই করে বাবার স্মরণসভার দেড়-মাস বাদে জুট মিল খুলেছিল।

আমার মা বিশ্বাস করত, বক্রী শনি সোজা হওয়ার জন্যই মিল খুলেছে। বাবা আর ক'টা দিন বেঁচে থাকলে কি কি সুরাহা হত, মা কাঁদতে কাঁদতে ইনিয়ে বিনিয়ে তাই বলতেন তার জ্যোতিষ ভাইয়ের কাছে, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে। ছাঁটাই হওয়া একশো শ্রমিকের মধ্যে বাবাও যে থাকতে পারতেন, এ যুক্তিটা মায়ের মনে ধরত না।

সেদিন মিল-গেটের স্মরণসভাতেই বাবার ইউনিয়নের বন্ধু হারুজ্যাঠা, আলি চাচা মন্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন "ওঁকে ধর—আমরা তো রইলুমই, ওঁকে ধর।"

আমি প্রকাশ্য মঞ্চে ওঁর পা জড়িয়ে ধরলুম। তখন জানতাম না ধর্মাবতার, সবক্ষেত্রে নয় হয়তো অধিকাংশক্ষেত্রে চামচাগিরির সূত্রপাত হয় এক ভয়ঙ্কর অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকে।

আমি পাবলিকের সামনে সিকি-মন্ত্রীর চামচাত্ব বরণ করে নিলাম, মী-লর্ড।

তো শেয়ালদা কোর্টে সেই প্রথম আমার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। আপনার সঙ্গে, দেশের আইনকানুনের সঙ্গে এমনকি গোটা রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই আমার প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ধর্মাবতার, সেটা ছিল স্টেট ভার্সাস সুধাংশু সরকার ওরফে বাবুলাল অ্যাণ্ড আদার্সের কেস। আমার পাশের পাড়ার দুটো ছেলে বঙ্কু আর গদাইকে মেরে ফ্ল্যাট্ করে দিয়েছিলাম। ওরা ছিল অন্য পার্টির লোক, ঘোঁতনার চামচে। আপনার কী কেসটার কথা মনে আছে, মী-লর্ড? সেটাও ছিল কালীপুজোর সময়। তখন মূর্তিটুর্তি উন্মোচনের ব্যাপারে এত মন্ত্রী এম. এল এ. বা ধর্মাবতার আনার রেওয়াজ ছিল না। উন্মোচন থেকে শুরু করে পুজো শেষ করে বিসর্জন দেওয়াটা পর্যন্ত সমস্ত কাজটা পুরুত মশাইই করতেন। সঙ্গে পাড়ার দু-চারটি ভক্তিমতী মা মাসী তাদের ভাইঝি-বোনঝি থাকত, ব্যস্।

আমাদের ছিল ন্যাবলাদা। ছোটবেলা থেকেই ন্যাবলাদার দেবদ্বিজে অসম্ভব ভক্তি। আপনিও দেখেছেন ন্যাবলাদাকে। এই যে একমাস আগে আমাদের

পাড়ার কালীপ্রতিমার আবরণ উন্মোচন করে এলেন, সেখানে ন্যাবলাদাও ছিল। ন্যাবলাদা এই পুজো-ফুজো নিয়ে কালী, শিব, শনি, এটার ওপর দিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে গেল, ধম্মাবতার। আমাদের পাড়ার মোড়ে যে ছোট মন্দিরটা দেখেছেন, হ্যাঁ ফুটপাতের ওপর, ওটা ন্যাবলাদারই প্রতিষ্ঠিত মন্দির। ছোট্ট, চারফুট বাই পাঁচফুট একটা ঘর। মাথাটা চারচালা ধরনের। মন্দিরের মাথায় ছোট্ট স্টেনলেস স্টিলের ত্রিশূল। ন্যাবলাদা মন্দিরের একহাত রোয়াকটার ওপর বসে থাকেন। সারাদিন বসে বসে কতলোককে যে চন্নামিত্তি, ঠাকুরের চানজল, বিতরণ করেন তার ইয়ত্তা নেই। পেতলের একটা বারকোশ পাতা আছে, ভক্তরা সেখানে পয়সা ফেলে যায়।

বিশেষ বিশেষ তিথিতে ওই বারকোশে জমা টাকা পয়সা কতটা হতে পারে আপনাকে একটা আন্দাজ দিই ধম্মাবতার। শুধু শিবরাত্রিতেই কচি-কাঁচা মেয়েদের হাতে শিবলিঙ্গ ধরিয়ে দিয়েই ন্যাবলাদার রোজগার হাজার দেড়েক টাকা। এর মধ্যে আমাদের ফিফ্‌টি ন্যাবলাদার ফিফ্‌টি। মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময়েই আমাদের সেই মন্ত্রী ব্যবস্থাটা পাকা করে দিয়েছিলেন।

মন্দিরের সামনে একটা ছোটমত বাজার কালক্রমে গড়ে উঠেছে। আলুপটল, শাকসবজির পাশে ইদানীং সেখানে ফলের দোকান, প্ল্যাস্টিকের জিনিসপত্তর দোকানও বসতে শুরু করেছে। ওটা থেকেও, বলতে কি আমাদের কিছু আমদানি আছে। দুবেলা ছাপানো স্লিপে নয়তো কৌটোয় চাঁদা তোলা হয়, ধম্মাবতার। যেদিন যার চাঁদা তোলার পালি, সেদিন তার কমিশন তিনটাকা।

তো ততদিনে ধম্মাবতার এটা সেটেলই হয়ে গেছে, আমরা—ওই চত্বরের চামচারা মোটামুটি বাজার আর মন্দিরের, কলকাতা করপোরেশনের খানিকটা রাস্তা আর ফুট-পাথের ওপর পর্যন্ত খবরদারি করব এবং এভাবে এখানকার চামচাদের জন্য কিছু আয়ের মানে জীবিকার সংস্থানও করে দেব। লোকাল পুলিশ, মানে ও.সি, এ.সি. ডি. সি-রা-ও বছরে হাজার পাঁচেক টাকার দস্তুরিতে আমাদের চামচাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা পাকা করে দিয়েছিলেন। বলতে পারেন রাষ্ট্রই এই ব্যবস্থাটা অনুমোদন করে দিয়েছিল, ধম্মাবতার।

লাস্ট তিনবছর ব্যবস্থাটা ঠিকই চলছিল। বখরা নিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ছোটোখাটো ঝুটঝামেলা যে ছিল না তা নয়—ছিল। ছোটোখাটো ঝাড়পিট, একটু কড়কে দেওয়া, এসব ছিল। কিন্তু সাতষট্টির ভোটের পর আমাদের সিকি-মন্ত্রীর মন্ত্রীত্বটা দুম্ করে ফুটে গেল। আমরা চামচারা একটু ঝামেলায় পড়ে গেলুম।

উঠতি রংবাজ হিসেবে আমার তখন একটু আধটু নামডাক হয়েছে। আমাদের সিকি-মন্ত্রীর জাতীয়তাবাদী দলের দুচারজন ছোটোখাটো নেতাও তখন আমাকে সমীহ করতে শুরু করেছে। এই অবস্থাতে সাতষট্টির ভোটটা এসে সবকিছু গুবলেট করে দিয়ে গেল।

টাটকা ভোটার হলেও ধম্মাবতার, ভোট ব্যাপারটা আমি গোড়া থেকেই বুঝতে

শুরু করেছি। রাষ্ট্রপতির এক ভোট, সিকি-মন্ত্রীর চামচা বাবুলাল সরকারেরও এক ভোট—এ হল ভোটের একটা হিসেব। আর ন্যাবলাদা, শিবমন্দির, সাবর্বোজনীন কালীপুজো, করপোরেশনের রাস্তা-ফুটপাতের বাজার নিয়ে ভোটের আরেকটা হিসেব আছে, ধম্মাবতার। আর এই হিসেবটা, আমরা যারা চামচা-বাহিনীর সক্রিয় মেম্বর তাদেরই রাখতে হত। মন্ত্রী শুধু নেতৃত্ব দিতেন। একদিকে জনগণের নেতৃত্ব আর একদিকে চামচাদের নেতৃত্ব।

তো মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব চলে গেলেও চামচাদের নেতৃত্ব দেওয়া খুব ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে, ধম্মাবতার। চামচারা নেতাকে যা দেয় তা হল অকৃত্রিম আনুগত্য। আর মন্ত্রী ওই শিবমন্দির, কালীপুজো—করপোরেশনের বাজার-ফুটপাতের বিলি-বন্দোবস্ত করে দিয়ে খানিকটা নিজের আর খানিকটা চামচাদের মাল কামানোর বন্দোবস্ত করে দেন। গণতন্ত্রে গিভ্ এণ্ড টেকের এইটাই হচ্ছে গিয়ে আমরাস্তা, ধম্মাবতার।

তো আমরা চামচারা, কেউ কেউ বলে কুকুরের জাত। কুকুর বড় প্রভুভক্ত জীব। এখন প্রভু শালা যদি কুকুরকে দিনের পর দিন খেতে না দেয়, কুকুরের ভক্তি কতদিন থাকে আমি জানি না, ধম্মাবতার। মানুষের সঙ্গে কুকুরের তফাৎ এই যে, মানুষ খুব বেশিদিন উপোস করে ভক্তি বজায় রাখতে পারে না। রামকৃষ্ণ কি বলেছিলেন, মনে আছে ধম্মাবতার—খালি পেটে ধম্মো হয়, হয় না। ফলে ক্রমে আমি এবং আমরা ক'জন তখন থেকেই ঘোঁতনদার মানে উলটো পার্টির এম. এল. এ'র দলে ভিড়তে শুরু করি। আর এইখান থেকেই কিচাইনের সূত্রপাত, ধম্মাবতার।

আমার পাশের পাড়ার বঙ্কু আর গদাই ঘোঁতনদার বিশ্বস্ত চামচা হিসেবে বেশ ক'বছর ধরেই চালিয়ে যাচ্ছিল। ওরা আমাদের মত না হলেও করপোরেশনের রাস্তা আর ফুটপাতের ওপর মোটামুটি একটা বাজার বসিয়ে ফেলেছে ততদিনে। গাঁয়ে ভেস্টেড্ ল্যাণ্ড, মানে কিনা সরকারের খাস জমি আছে। সরকারই সেখানে উদ্যোগ নিয়ে চাষাভূষোদের বসাচ্ছেন। শহরে তো, বিশেষ এই কলকাতা শহরে তো তেমন কিছু নেই। রাস্তা আর ফুটপাত তো পাবলিক প্রপার্টি ধম্মাবতার। পুলিস-নেতা আর চামচার ইটার্নাল ট্রায়াঙ্গল্ যতক্ষণ ঠিক আছে, ততক্ষণ এই পাবলিক প্রপার্টি মানে কিনা ফুটপাত ঠিক ঠিকভাবেই জনগণের সার্ভিসে লাগবে। ওই ত্রিভুজে বেগড়বাই দেখা দিলেই হুজ্জোত।

তো সাতষট্টিতে বেছে বেছে আমাদের জায়গাতেই সেই হুজ্জোত শুরু হয়ে গেল। ঘোঁতনদা আমাকে আর আমার দলকে বললেন, ফুটপাত-রাস্তা আর ন্যাবলাদার মন্দিরের দখল ছেড়ে দিতে। খানকির ছেলে বঙ্কুটা আর এক ধাপ বেড়ে গিয়ে টুসকির ওপরে আমার একান্ত ব্যক্তিগত দখলটাও ছেড়ে দিতে বলল। আমার পাড়ায় দাঁড়িয়ে, আমার চামচাবাহিনীর সামনে বঙ্কু বলল, "মালটা ছেড়ে দে না, ক'দিন নাড়াচাড়া করি।" টুসকিকে আপনার মনে আছে তো, ধম্মাবতার?

চামচা হলেও আমরা মানুষ তো, ধম্মাবতার—বাজারের দখল, মন্দিরের দখল

নিয়ে পেটোবাজি শুরু হয়ে গেল। আমাদের সিকি-মন্ত্রী ব্যাপারটাকে একটা পার্টিগত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ভোটযুদ্ধের মত, হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন। ওসব কিস্যু নয়। আসলে এটা চামচাদের আভ্যন্তরীণ লড়াই, বাজার-দখলের লড়াই। এর মধ্যে সিকি-মন্ত্রীর গান্ধীজী বা ঘোঁতনদার মার্কস, লেনিনের কোনো জায়গা নেই।

পাশাপাশি পাড়ার চোরাগোপ্তা মারামারি আর পেটোবাজিতে আমাদের শক্তিক্ষয় হচ্ছিল, ধর্মাবতার। তাছাড়া মন্ত্রীহীন চামচারা কতক্ষণ যুঝতে পারে বলুন। তো রণে ভঙ্গ দেওয়ার আগে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঘোঁতনদার চামচে বঙ্কু আর গদাইকে সাইজ করার জন্য উঠেপড়ে লাগি।

বঙ্কু আর গদাই দুজনেই তখন হাসপাতালে আর আমি শেয়ালদা কোর্টে আসামী হিসাবে আপনার সামনে, ধর্মাবতার।

আমাকে কী চিনতে পারছেন, মী-লর্ড? সাতষট্টি থেকে সত্তর আপনি কোথায় ছিলেন, ধর্মাবতার! এই বাংলাদেশে, কলকাতায় নাকি ভারতবর্ষের অন্য কোনোখানে—নাকি দেশের বাইরে ইংলণ্ডে, আমেরিকায়।

সে একটা ডামাডোলের বাজার গেছে। আজ এ পার্টি তো কাল ও পার্টি। সে সময় আমি ক্রমশ পেটো, ছোটোমাল আর কি, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে দড় হয়ে উঠি। আমার নিজের পার্টির লোকাল এরিয়া তো ছিলই, তাছাড়াও আমার পেটো ক্রমশ টিটাগড়, বরানগর থেকে বারাসত বনগাঁ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। জনগণের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ঠিকে নিয়েছিলেন নেতারা এবং আমরা নেতাদের কাছ থেকে ঠিকে নিয়েছিলাম সেই সংগ্রামে মাসল্ পাওয়ার আর পেটো পাওয়ার সাপ্লাই দেবার জন্য। চামচারা এসময় বড়ই দামাল, বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল - আমিও, ধর্মাবতার। আর সেই সময়ে শিশিরের সঙ্গে আমার দেখা।

শিশির আমার ইস্কুলের বন্ধু। ভালো ছাত্র ছিল। ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হত। শিশির যে বড় হয়ে একটা কেষ্ট-বিষ্টু, নিদেনপক্ষে আপনারই মত একজন ধর্মাবতার হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করবে—এটা সবাই বলতেন। সেই শিশির বলা নেই কওয়া নেই একদিন ইউনিভার্সিটি গেল, আর ফিরল না।

আমরা শুনেছিলাম, ঘোঁতনদাই একদিন বলেছিল, শিশির গ্রামে গেছে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবে বলে শিশির এবং আরও অনেকের সঙ্গে গ্রামে গেছে। শিশিরের ব্যাপারটা আমার কাছে বড় অদ্ভুত লেগেছে, ধর্মাবতার। আসলে রাজনীতির ব্যাপারটা মানে আপনার ওই গান্ধীজী বা মার্কসমার্কা ব্যাপারটা আমার মাথায় সত্যিই তেমন করে কোনদিনই ঢুকত না। চামচেদের মাথার বহরটা তো আপনার অজানা নয়, মী-লর্ড!

তো শিশির একটা রাজনীতি করতে গেছে। সে ধর্মাবতার হতে যায় নি, আমার মত চামচা হতে যায় নি, চাকরি বা ব্যবসার জন্য যায় নি। শুধু গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবে বলে নকশালবাড়ি গেছে। কী কাণ্ড দেখুন!

আমি জীবনে শিয়ালদা স্টেশনের ভেতর যাই নি। হাওড়া স্টেশন থেকে

একবার পিকনিক করতে ব্যাণ্ডেল-চার্চ গিয়েছি মাত্র। বলতে কি, কৃষক ব্যাপারটাই চোখে দেখি নি। জোড়া বলদের ছবি দেখেছি, সমাজবন্ধু হিসেবে কৃষকের কথা ক্লাস থি্রতে পড়েছি। কৃষক আমাদের খাদ্য—ধান, চাল, গম, ভুট্টা, যব প্রভৃতি উৎপাদন করে। এ নিয়েও আমার মনে কিঞ্চিৎ সংশয় আছে, ধম্মাবতার।

বাবা মারা যাওয়ার পর কিছুদিন আমি রেশন দোকানে যেতাম। তার আগেও বাড়িতে রেশনের চাল-গম দেখি নি এমন নয়। সমাজবন্ধু কৃষক কী বিধিবদ্ধ রেশনের চাল-গমও উৎপাদন করে? যাই বলুন, মী-লর্ড, আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, রেশনে যে চাল-ডাল দেওয়া হয় তা সমাজবন্ধু উৎপন্ন করে না। অন্য কেউ, আমি জানি না কে সে, উৎপাদন করে। চামচাগিরির দৌলতে একসময় আমি সরু বাসমতী, চামরমণির গরম ভাত আমার থালাতেই দেখেছি, ধম্মাবতার। আমি নিশ্চিত হয়েছি, রেশনের চাল-গম ভারতবর্ষের কৃষক তার ক্ষেতে ফলায় না।

তো কৃষক নিয়ে উত্তর বাংলায়, বাংলা—আমাদের সোনার পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, নকশালবাড়িতে কি যেন একটা লড়াই চলছে। শিশির নাকি সেখানে গেছে। নকশালবাড়িতে করপোরেশন নেই, বাজার নেই, ফুটপাত বা রাস্তায় বাজার বসাবার কোনো স্কোপ নেই—তা সত্ত্বেও লড়াইটা কিসের আমি বুঝতে পারতাম না।

আমার কাছে একটা লড়াই সম্বন্ধেই ধারণা খুব স্পষ্ট, ধম্মাবতার। আমাদের এই শহরে সুদৃশ্য একটা গোল বাড়িতে কিছু চেয়ার রাখা আছে। চেয়ারের সামনে চোঙা ফোঁকার জন্য মাউথপিস। তো সেই মাউথপিস লাগানো একটা চেয়ার টেবিলে বসার জন্য একটা লড়াই আছে। তার জন্য পার্টি আছে—পার্টির জন্য চামচা আছে; চামচার জন্য করপোরেশনের রাস্তা, ফুটপাত, বাজার—চাঁদা, সার্বজনীন শনিপুজো, কালিপুজো আছে, এটা আমি জানি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে লড়াইটা তো সেখানেই, ধম্মাবতার! তো সেই নকশালবাড়ির সংগ্রামী শিশির হালদারই সেকেণ্ড টাইম ক্যাচালটা বাধালে। আপনি তখন আলিপুর কোর্টে, ধম্মাবতার।

শিশিরকে অনেকদিন পর কলকাতায় দেখলুম। না আমাদের পাড়ায় না, কলেজস্ট্রিটে কফি হাউসের নীচে। আমি কী কম্মে সেখানে গিয়েছিলুম আমার মনে নেই, ধম্মাবতার। আপনার মনে আছে?

সাদা পোশাকের পুলিস শিশিরকে নাকি ফলো করছিল। শিশির চোর না ডাকাত? তা করছিল, পুলিস এমন করেই থাকে আমি শুনেছি—বেশ করছিল। আমি পড়ে গেলাম ক্যাচালে। নারকেলডাঙা বস্তিতে আমার পেটো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে পুলিস ঝাঁপা মারলে, মাল পেলে। মী-লর্ড, থানা, নেতা—তখন শালা পাঁচ পাঁচটা নেতা, চামচেগিরি যে কী ঝকমারি কাজ, কারও কোনো বকেয়া ছিল না আমার কাছে, তা সত্ত্বেও—সব শেয়ালের এক রা। ধম্মাবতার, আমি নাকি নকশাল।

আর তারপরই তো রাষ্ট্র ভার্সাস বাব্‌লাল ওরফে সুধাংশু সরকার কেস্‌টা। তখন বাব্‌লাল নামটাই সকলের কাছে চেনা—নেতাদের কাছে, পুলিসের কাছে, আমার এরিয়ার চামচাদের কাছে।

শিশিরের কি হল জানি না, আমি তো মুচলেকা—লালবাজারে আমাকে নাকখত দিতে বলেছিল দিই নি, দিয়ে ফিরে চলে এলাম মনে পড়ছে, ধম্মাবতার।

তো সেই শিশির, ধম্মাবতার, রাজনীতি সম্পর্কে খুব সহজ করে প্রায় মেয়েদের ব্রতকথার স্টাইলে আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করেছিল। বলতে কি আগের পাঁচ-ছ-বছরের চামচাতন্ত্রে আমি শুনি নি, কখনও কারও কাছে শুনি নি—এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেছিল শিশির—নকশালবাড়ির সংগ্রামী শিশির।

এই জ্ঞান নিয়ে, মাও বলে এক ভদ্রলোকের লাল বই নিয়ে আমি যে কিরকম ক্যাচালে পড়েছিলাম, আপনি তো তার সাক্ষী, মী-লর্ড!

ক'দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল আমি সেই সিকি মন্ত্রী বা ঘোঁতনদা কারও কাছেই আর যাব না। পেটোর কুটিরশিল্প, দস্তাবাদের কাছে চোলাইমাল তৈরির ক্ষুদ্রশিল্প যেখান থেকে আমি দু'পার্সেণ্ট কমিশন পাই, সব শালা তুলে দেব। বাপের সুপুত্তুর হয়ে শুধু কৃষকসংগ্রাম করে যাব। অন্তত এই একটা জায়গায়, শিশির—আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় শিশিরের সমকক্ষ হওয়ার কত বাসনা ছিল মী-লর্ড। হল না শেষ পর্যন্ত, চামচাদের বোধহয় হয় না।

শিশির বলেছিল—হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম গণবিপ্লবে আমার মত বাব্‌লালদের নাকি গৌরবময় ভূমিকা ছিল। আপনি জানেন, ধম্মাবতার?

শিশির বলেছিল, শ্রেণী হিসেবে আমি নাকি লুম্পেন। আমি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সম্পর্কে কিছুটা শুনেছি। যেমন শিবমন্দিরের ন্যাবলাদা বামুন, আমরা মানে সরকাররা, কায়েতরা ক্ষত্রিয়। আমাদের সেই সিকি-মন্ত্রী, সে শালা বেনে ছিল—বৈশ্য। সোনাদানা নয়, তার কাজকারবার ছিল দুনম্বরি লোহা-লক্কড় নিয়ে। আর আমার পিরিতের মেয়েছেলে টুস্‌কি—ও ছিল শূদ্র, দাস। লুম্পেন শ্রেণীর কথা আমি শুনি নি ধম্মাবতার।

শিশির বলেছিল, দুটো হাত আছে কাজ করার জন্য, ঘাড়ের ওপর একটা মাথাও আছে ভাবনাচিন্তা করার জন্য, অথচ যাদের কাজ নেই, ভাবনাচিন্তাও নেই—সমাজে এমন যাদের অবস্থা তারাই হল লুম্পেন্‌। আমাদের কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে কত হাজার লুম্পেনের নাম এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জে লিপিবদ্ধ আছে, আপনি জানেন, ধম্মাবতার! হয় লুম্পেন হয়ে থাক নয়ত চামচা হও—এছাড়া আমি তো তাদের কোনো গতি দেখি না। আপনি কি দেখতে পান, ধম্মাবতার!

আমি এসব দেখতে চাই না, মী-লর্ড। ঘোঁতনদাও বলেছে, চামচাদের এসব দেখতে নাই। আমার দেখার বহুকিছু আছে—দেবানন্দের ছবি, ইস্কুল-কলেজের কাঁচ-কাঁচা মেয়েছেলে, পেটো কারখানা, সভা-সমিতি—দেশের লুমপেন-বাহিনীকে যারা দেখবার ঠিকই দেখবেন। পাঁচ-সালা যোজনায় দেখবেন। সেই

সুন্দর গোল বাড়িটায় মাউথপিস লাগানো চেয়ার-টেবিলে বসে বসে দেখবেন।

তবু আমি দেখছিলাম হুজুর। ফাঁকফোকর দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিলাম। আমি শিশিরদের, নকশালবাড়ির সংগ্রামী কৃষকদের, আমার পাড়ার হাড়কলের, গেঞ্জিকলের শ্রমিকদের দেখছিলাম হুজুর।

আমার বাবা জুটমিলের শ্রমিক ছিলেন, হারু জ্যাঠা, আলি চাচা, যাঁরা বলেছিলেন মন্ত্রীকে ধর, হয়ে যাবে—শ্রমিকশ্রেণী।

নকশালবাড়িতে জমির দখল নিয়ে যারা লড়ছে, ব্যাণ্ডেল চার্চ যাবার পথে হাল বলদ নিয়ে রেললাইনের দুপাশের মাঠে যাদের দেখেছি তারা কৃষকশ্রেণী।

আমাদের ব্রজমাধব স্যার, রাইটার্সের বড়বাবু গৌরহরি মেসো এরা সব মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শিশির বলেছিল সমাজে তোমার হাত দুটো কী করছে, মাথাটা কোন্ ভাবনায় লেগেছে এ থেকেই হল তোমার শ্রেণী। আমার শ্রেণীর হাত বা মাথা সমাজের কোনো কাজে লাগে না। শুধু এক খানকি খাতায় নাম লিখিয়ে আমরা বসে থাকি। আমরা হলুম লুম্পেনশ্রেণী। নেতারা কোন্ শ্রেণী? ধম্মাবতার? আমাদের ঘোতনদা, আমার আগেকার সেই সিকি-মন্ত্রী কোন শ্রেণী।

বাহাত্তরে ভোট এসে গেল। আমি এই শ্রেণীর ক্যাঁচাল থেকে বাঁচলাম। আসলে, ভোট আর কালিপুজো—এই দুটো ব্যাপারেই, বলতে কি, আমি বেশ ইজি ফীল করি, মী-লর্ড।

শিশির এখন কোথায়, বলতে পারেন ধম্মাবতার?

শিশির সেবার কলকাতা এসে ক'দিন ছিল। আমি শিশিরকে বলেছিলাম, তুমি আমার বাইরের এই যে র‍্যালা দেখছ, লোকে আমাকে রংবাজ বলছে—ঘোতনদার বড় চামচে মানে হাতা বলছে, আমি এটা নই। আমি সংগ্রামী নই, তবে কৃষক শ্রমিক-মধ্যবিত্ত হতে পারি নিশ্চয়ই। আমি হবার চেষ্টাও করেছিলুম, ধম্মাবতার।

সেই যে জুটমিলের গেটে বাবার জনসভায় বেনেশ্রেণীর, শিশির বলে পাতিবুর্জোয়া নাকি যেন, সিকি-মন্ত্রীর পা জড়িয়ে ধরে ছিলুম, ঝাড়া দুটো বছর আমি তার পায়ে পায়ে লেপটে থেকেছি। ছোটখাটো ফাইফরমাশ খেটেছি, বাজার বয়ে এনে দিয়েছি, পাম্পে জল না উঠলে সিকি-মন্ত্রীর চানের জন্যে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ওভার হেড ট্যাঙ্কে জল তুলে নিয়েছি। শিশিরকে বলেছিলাম, আমি তো লুম্পেন হতে চাই নি। আমার দুটো হাত আর মাথাকে যথাসাধ্য সমাজের সেবায়, সিকি-মন্ত্রীর সেবায় উৎসর্গ করেছি।

আপনি ঠিকই ধরেছেন একটা ছোটখাটো চাকরির জন্য, থার্ড ডিভিসনে এইচ. এস এর জন্য, উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থার জন্য, মি-লর্ড।

মনে মনে আমার হাত আর মাথাকে আরও বৃহত্তর সেবায় লাগাবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, ধম্মাবতার। সিকি-মন্ত্রী দোক্তা দেওয়া পান খেতেন, পিক্ ফেলতেন পিকদানিতে। সেটা অবশ্য বাড়ির ঝিকেই পরিষ্কার করতে দেখেছি। একসময় বাবার জুটমিলে একটা ক্লিনারের চাকরির জন্যে

আমি সেই পিকদানিতেও হাত দিয়েছিলাম—সিকি-মন্ত্রীর পূতপবিত্র পানের পিক্ পরিষ্কার করার জন্য।

তা সত্ত্বেও হয়নি, কিছুই হয় নি মী-লর্ড। আমি আমার দু'হাত, মাথাসহ ক্রমে চামচা হয়ে উঠলাম, লুম্পেন হয়ে গেলাম।

ঘোঁতনদা আমাকে করপোরেশনে একবার একটা চাকরির কথা বলেছিলেন। ঘোঁতনদা তখন আমাদের এম. এল. এ। ঘোঁতনদার রক্ত-আমাশা হয়েছিল—আমি টয়লেট পেপার দিয়ে ঘোঁতনদার রক্তাক্ত পোঁদ পুঁছে দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। হ্যাঁ, করপোরেশনের ওই চাকরিটার জন্য। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন, মী-লর্ড?

তো দ্যাখ দ্যাখ করে বাহাত্তর সাল এসে পড়ল। এশিয়ার মুক্তিসূর্য তখন কলকাতার আকাশে গনগনে তাপ দিতে শুরু করেছে। সেই তাপপ্রবাহে ঘোঁতনদা, আমরা ঘোঁতনদার চামচারা ঘরছাড়া, পাড়াছাড়া। আমার মা তখন অসুস্থ—রোগশয্যায়। আমার জন্যেই হয়ত দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় মায়ের ঘুম হচ্ছিল না। মা আর আমি দুজনে একসঙ্গেই তো মঞ্চে উঠেছিলাম—সেই যে, জুটমিলের গেটে, বাবার স্মরণসভায়। থার্ড ডিভিসনে এইচ এস ছেলেকে নিয়ে বিধবা মায়ের কত আশা ছিল সেসময়ে। মা এইসময়েই বেলেঘাটায় একটা বাল্ব ফ্যাক্টরিতে কাজ নেয়। মা একটা শ্রেণী পেয়ে যায়, শ্রমিকশ্রেণী। আমি চামচা হয়ে যাই—প্রলেতারিয়েত কিন্তু লুম্পেনশ্রেণী। মা মায়ের শ্রেণীতে সংগ্রাম করে, আমি আমার শ্রেণীতে। কোন্ মায়ের, কোন শ্রমিক শ্রেণীর মায়ের আর ছেলেকে চামচাশ্রেণীতে দেখতে ভালো লাগে! মা আমাকে হাতের কাজ শিখতে বলতেন, বাল্ব কারখানার কাজ শিখতে বলতেন। শ্রমিকশ্রেণীর বাপ-মা পেয়েও আমি যে কেন চামচাশ্রেণীতে রয়ে গেলাম, আমি বুঝতে পারি না, ধর্মাবতার।

এরা, নতুন নেতারা—মুক্তিসূর্যের ছানাপোনারা আমাদের পাড়া রেইড করল, বাড়ি রেইড করল। আইনসম্মতভাবে, এদের সাথে রাষ্ট্র ছিল, পুলিস ছিল। সেই থানা, সেই পুলিস—আমাদের রাস্তা আর ফুটপাতের বাজার থেকে যারা রুটিন করে হিসেবমত হিস্যা পেত—তারাই ছিল। ওরা আমার মাকে বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে উঠোনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল ঝাড়া তিন ঘণ্টা—শুধুমাত্র আমার হদিশ জানার জন্য, আমার চামচাবাহিনীর আরও আরও অনেকের হদিশ পাবার জন্য।

আমি ছুটে যেতে পারতুম, ধর্মাবতার—চামচা-সংস্কার অনুযায়ী মুক্তিসূর্যের ছানা-পোনা, আমাদের নতুন নেতার পায়ে গিয়ে বডি ফেলে দিতে পারতুম। আমাদের সেই প্রাক্তন সিকি-মন্ত্রী—তার পায়ে গিয়েও কেঁদে পড়তে পারতাম। একটা শান্তিকমিটি করে, শান্তি-মিছিল করে ন্যাবলাদার শিবমন্দির, করপোরেশনের ফুটপাত রাস্তার তোলা তুলবার, বিলিবন্দোবস্ত করবার আয়োজন করতে পারতুম, মী-লর্ড। কেমন যেন ভরসা পেলুম না।

আমাদের সিকি-মন্ত্রীর অবস্থা তখন বেশ ঢিলে। দুনম্বরি লোহা-লক্কড়ের

ব্যবসায় চৌপট হয়ে গেছে। এক ছেলে বাড়ীর আয়রন সেফ খুলে টাকা-গয়না-গাটি নিয়ে বোম্বে চলে গেছে ফিলিম্ বানাবে বলে। বলতে কি তারই পার্টি, তারই চেনা লোকজন, তিনি কিন্তু কলকে পাচ্ছিলেন না। তিনি তৃষ্ণার্ত চাতকের মত হাইকমাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দিন গুনছিলেন। এই সময় বা তার একটু আগে পরে থেকে টুস্কি চৌরঙ্গি পাড়ায় এখানে ওখানে, মেট্রো সিনেমার সামনে রুটিন করে যেতে শুরু করে। আমি একদিন টুস্কিকে কার্জন পার্কের বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, ধম্মাবতার।

এই দাঁড়িয়ে থাকার মানে আমি জানি। বিশ্বাস করুন, ধম্মাবতার—আমার বুকে অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল। টিস্‌কেকে নিয়ে একদা আমি স্বপ্ন দেখতুম। সামনের শহীদ মিনার, অদূরে মাউথপিস্-আঁটা টেবিল-চেয়ারশুদ্ধ সুদৃশ্য গোলাবাড়িটা এক ভয়ংকর পেটো চার্জ করে আমার উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। অনেকদিন টুস্‌কিকে দেখি নি। টুস্কি কী এখনও কার্জন পার্কে, মেট্রোর সামনে অমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

টুস্‌কি কোন শ্রেণী? ওতো ওর হাত মাথা, বলতে কী গোটা দেহটাই সমাজসেবায় উচ্ছুগ্গু করেছে। শিশির থাকলে হয়ত বলতে পারত। আপনি কী পারেন, ধম্মাবতার?

টুস্‌কিকে কার্জন পার্কে দেখার দু'দিন পরে আমার বাড়ীতে, হ্যাঁ ধম্মাবতার, আমাদের সেই চল্লিশ বছরের বসতবাড়ির দেড়খানা ঘরে আমার নামে চাকরির ইনটারভিউয়ের চিঠি এল—সরকারি চিঠি। আমারই চামচাবাহিনীর একজনের ছোট ভাই হাতে করে সেই চিঠি আমার দমদমের ঠেকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ধম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাই বলুন, সে তো ওই চাকরিই। বলুন ঠিক কিনা, মী-লর্ড!

ক'টা দিন কলকাতার এমাথা থেকে ওমাথা ছুটোছুটি করে আমি আমার চটির শুকতলা সম্পূর্ণ খইয়ে ফেললাম। একটা মুরুব্বির জন্য, একটা সুপারিশের জন্যে হুজুর। আমার সাত-সাতটি বছরের চামচেমনস্কতা কি আর এত সহজে মোছে, মী-লর্ড?

কলকাতার এমাথা থেকে ওমাথা ঘুরে মুরুব্বি দু-চারজন যে যোগাড় হল না এমন নয়। আমার প্রাক্তন সিকি-মন্ত্রীর চামচাগিরির পরিচিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তবেই জনাতিনেক মুরুব্বি—আমার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আমি জোগাড় করতে পেরেছিলুম, ধম্মাবতার।

তো মুরুব্বিরা বললে, টাকার চেয়ে বড় মুরুব্বি এই জমানায় নাকি আর কেউ নয়। ফলে মাল ছাড়তে হবে। পাঁচ-ছ হাজারের ব্যবস্থা হলে, আমার জন্য ওটাই কনসেসন্ রেট্, ও'রা ব্যবস্থা করতে পারেন।

ও'রা তো বলেই খালাস। আমিও যে টাকার হিসেবটা বুঝি না, এমন নয়। কিন্তু আমার মত অসহায় চামচা, নেতাহীন চামচা, টাকাটা পাব কোথায়, ধম্মাবতার।

আমি নিজেকে বিক্রি করতে রাজি ছিলাম। বলতে কী বিক্রি তো করেও ছিলাম। এখন ধম্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে ষাঁড়কেও লোকে দেখেছি খেতে দেয়, সোহাগ করে গায়ে হাত বোলায়। আমার জন্যে ততটা আর কে করবে বলুন, ধম্মাবতার!

শেষ পর্যন্ত যা থাকে বরাতে—এই বলে কপাল ঠুকে আমি টুস্‌কির ঠেকে হাজির হলাম।

টুসকির প্রতি আমার প্রথম যৌবনের ইয়ের জন্যেই হক আর যেজন্যই হক, টুস্‌কির ঠেকের প্রতি আমি নজর রেখেছিলাম।

টুস্‌কিকে আপনার মনে আছে তো, ধম্মাবতার। এই তো একমাস আগে আমাদের পাড়ায় কালীপুজোয় মূর্তির আবরণ-উন্মোচনের সময় টুস্‌কি উন্মোচনের পর্দার দড়াটা আপনার হাতে তুলে দিয়েছিল। আপনি একবার আড়চোখে যার মুখের দিকে, একবার ডবডবে বুকের দিকে—সেই টুস্‌কি, মী-লর্ড।

টুস্‌কির ঠেকে তখন মানুষ ছিল—একজন নয়, দু-দুজন মধ্যবয়স্ক মানুষ, ধম্মাবতার। জানালায় ঝোলানো ভারি পর্দা, ভেতরে নীল আলো। জানালার খোলা পাল্লা আর উড়ু উড়ু পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি টুস্‌কিকে দেখলাম। হুবহু সেদিনের সেই কালিপুজোয় যেমন দেখেছিলাম পরে, তেমনি।

মধ্যবয়স্ক একজন আরেকজনের হাতে টুস্‌কির সায়ার দড়াটা তুলে দিচ্ছে। টুস্‌কির উর্দ্ধাঙ্গের আবরণ উন্মোচিতই ছিল, টুস্‌কির নিম্নাঙ্গের আবরণ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল।

আমি পালিয়ে এলাম, ধম্মাবতার।

ইতিমধ্যে পাড়ায় শান্তিকমিটি হয়েছে। আমরা চামচাবাহিনীর বেশ কয়েকজন পাড়ায় ফিরে এসেছি। ন্যাবলাদার শিবমন্দির আর করপোরেশনের রাস্তা আর ফুটপাতের তোলা তুলবার রাইট ততদিনে বেদখল হয়ে গেছে। দেবদ্বিজে আমার পুরনো ভক্তির কথা স্মরণে রেখে পাড়ার নতুন গার্জেনরা কালিপুজো কমিটিতে জায়গা দিয়েছে।

কালিপুজোর কালচারটা আমি বরাবরই ভালো বুঝতাম। একসময় বিসর্জনের প্রসেসনে কোমর দুলিয়ে ফিলমি গানার সঙ্গে টুইস্ট নাচতাম। সাবুবোজনীন পুজোয় আগে আমরা চামচারা দশ থেকে পনের পার্সেনট চাঁদা আর সুভেনির থেকে কমিশন পেতাম। পাড়ার নতুন গার্জেনরা এবার আমাদের এক পার্সেনট এলাও করেছে।

মূর্তি উন্মোচনের পর, বলতে কি বহুদিন পর ধম্মাবতার টুস্‌কিকে নিয়ে আমি রুপোলি রেস্তরায় চা খেতে বসেছিলুম। আর সাতদিন পরেই আমার ইনটারভিউ। আমি টুস্‌কিকে আপনার কথা বললুম। আমি যে এর আগে বেশ কয়েকবার আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সে কথা বললুম। পুজো কমিটিতে মূর্তির আবরণ উন্মোচনের জন্য আপনাকে আনার প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছিলুম, ধম্মাবতার।

সবশেষে টুস্‌কিকে আমার ইনটারভিউয়ের কথা, পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজনের কথা বললুম। আমি বললুম, টুস্‌কি এই জীবন আমার আর ভালো লাগছে না।

টুস্‌কি ক্লান্ত হাসল। বলল, কার আর ভাল লাগে বল, বাবুলালদা?

আমি বললুম, টুস্‌কি তুমি চৌরঙ্গিপাড়ার সন্ধেবেলার জীবন থেকে ফিরে এস। তোমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা, পাগল মাকে আমি দেখব টুস্‌কি। এই চাকরিটা হয়ে গেলে—টুস্‌কি আর বসতে চাইছিল না। কালিপুজোর রাতেও কি ওর খদ্দের আছে, মী-লর্ড।

গলির মোড়ে পাড়ায় ঢুকে যাওয়ার আগে টুস্‌কি একবার ফিরে তাকাল, বলল টাকাটা তোমার কবে দরকার?

আমি বললুম, টাকাটা তোমার আছে?

টুস্‌কি বলল, তাহলে তো রাজা হয়ে যেতুম। টাকাটা যোগাড় করতে হবে।

আমি বললুম, কে দেবে টাকাটা? আমি তার চামচা হব। টুস্‌কি, সারাজীবন আমি তোমার চামচা হয়ে থাকব।

টুস্‌কি চলে গেল।

আমি মনে মনে বললাম, সারাজীবন—আমি তোমার চামচে হয়ে থাকব টুস্‌কি, আমি তোমার পিকদানি পরিষ্কার করব—তোমার জন্যে কমোডের পাশে টয়লেট্ পেপার হাতে দাঁড়িয়ে থাকব টুস্‌কি।

এর দুদিন পরেই টুস্‌কির কাছ থেকে সেই ভয়ংকর চিঠিটা এল, ধম্মাবতার! টুস্‌কিকে একসময় আমি স্বপ্নে দেখতাম, এখনও দেখি হয়ত মাঝে মাঝে। ওই পড়ে আমার রক্তে আগুন ধরে গেল, মী-লর্ড।

আপনি আমার বিরুদ্ধে চার্জটা শুনেছেন তো, ধম্মাবতার। আপনি সে সময়ে নাসারন্ধ্রের চুল ছিঁড়ছিলেন। আপনি শুনেছেন কি স্টেট ভার্সাস বাবুলাল ওরফে সুধাংশু সরকারের কেসে আমার বিরুদ্ধে চার্জটা?

হ্যাঁ ধম্মাবতার, আমি বাবুলাল, ওরফে সুধাংশু সরকার আর. এল. আলুওয়ালাকে খুন করেছি। না, না,—শ্রেণী ফেণী আমি বুঝি না। আমি নিতান্তই চামচাশ্রেণী, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত।

টুস্‌কি তার চিঠিতে লিখেছিল—'বাবুদা, দিল্লির আলুওয়ালা আমাকে কিনতে চাইছেন অনেকদিন ধরে। আমাদের চৌরঙ্গিপাড়ার এক দালালই আলুওয়ালাকে আমার কাছে নিয়ে আসে। আলুওয়ালা প্রথম দিনেই আমাকে অফার দিয়েছিল। বলেছিল, আই উইল কীপ্ ইউ. ফর সিক্স্ মন্থ। আই উইল কীপ ইউ এণ্ড ইট ইউ। মানে কী জানো বাবুদা—আলুওয়ালা দিল্লিতে তার বাগান বাড়িতে ছ-মাস ধরে আমাকে রাখবে আর একটু একটু করে খাবে, যখন যেমন মর্জি সেইভাবে। এর জন্য আমার প্রাপ্য দশ হাজার টাকা এ্যাডভান্সের মধ্যে তোমার পাঁচ হাজার আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা, পাগলী মা-এর জন্য পাঁচ হাজার।

তুমি টাকাটা যথাসময়ে, কোন তারিখে বুঝতেই পারছেন, ধম্মাবতার।

আমি যথাসময়েই হাজির হয়েছিলাম, মী-লর্ড। আমাদের গলি থেকে একটু দূরে আলুওয়ালার দুধ-সাদা টয়োটা গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। আমার বুকের উজার করা বিক্ষোভ, রাগ, ঘৃণা তিনটে বোমা চরাচর কাঁপিয়ে ফাটল, ধম্মাবতার। টয়োটা গাড়িটা জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে। আমাদের পাড়ার কাছে পুরোনো তিনটে বাড়ির ভিতের কাছ থেকে একতলার ছাদ পর্যন্ত ফেটে গেল চড়াৎ করে। পুলিস তালগোল পাকানো একটা শরীর টয়োটার মধ্যে থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনেছিল। অনামিকায় হীরের আংটিটা আলুওয়ালাকে চিনিয়ে দেয়। ওর ড্রাইভার এটাচি-ভর্তি টাকা নিয়ে গিয়েছিল টুসকির বাড়িতে—টুসকিকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার জন্য।

টুসকি এখন কোথায়, ধম্মাবতার?

এ কি আপনি উঠে পড়ছেন, ধম্মাবতার?

শুনানী মুলতুবি!

কী বলছেন সরকারি উকিলকে—আপনি জানেন। ও, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন দোষী না নির্দোষ?

আমি হাঁ করতে পারছি না, ধম্মাবতার। আমার চোয়ালের হাড়গুলো চুরচুর করে ভেঙে দিয়েছে ওরা, আমার দাঁতগুলো মাড়ি থেকে খুলে নিয়েছে। না, না, আমি আমার পাড়ায় পেটো চার্জ করতে চাই নি। আমি শিবমন্দির, করপোরেশনে রাস্তা, ফুটপাতের বাজারে তোলা তুলবার অধিকার চাই নি। তবু একবার ফেটে যেতে চেয়েছি—বোমার মত, আগ্নেয়গিরির মত। একবার চামচা-তন্ত্রের বাইরে হাউইয়ের মত ছুটে যেতে চেয়েছি, মী-লর্ড!

দোষী না নির্দোষ আপনি জিজ্ঞেস করছেন, মী-লর্ড—সব শুনেও।

আহ্হ্—আ আ আ, আমি হাঁ করছি আপনি বিশ্বরূপ দেখুন, ধম্মাবতার। আ-আ-আ, আমি বোবা আর্তনাদ করছি, আপনি শুনুন ধম্মাবতার। আমার দু'পাশের কষ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তাজা লাল রক্ত পড়ছে। ওরা আমার জিভটাও কেটে নিয়েছে, ধম্মাবতার।

# আসলে সুজন

সুজন জানে না ভি. আই. পি রোডের শুরুটা সঠিক কোন্‌খানে। কলকাতার দিক থেকে বেলেঘাটা-নারকেলডাঙা মেন রোড জংশন অথবা কাঁকুড়গাছি-মানিকতলা মেন। উল্টোডাঙা স্টেশনের নাম কবে যেন বিধাননগর রোড হয়ে গেছে। উল্টোডাঙা মেন রোড থেকেই কি ভি. আই. পি. রোডের সূত্রপাত ? বেলেঘাটা বা কাঁকুড়গাছি বা উল্টোডাঙার দিক থেকে বিমানবন্দর অভিমুখী সুপরিসর বৃক্ষশোভিত বুলেভার্দবিশিষ্ট রাজপথই ভি. আই. পি. সুজন জানে।

প্রশ্নটা সুজনের মনে, ভি. আই. পি সম্পর্কিত, আসে। কারণ অটোচালক, অটোর নম্বর পড়া যায় না, তাকে বলল এটাই ভি. আই. পি। অর্থাৎ উল্টোডাঙা বা বিধাননগর রোড এবং সুজনের ধারণা মতো ভি. আই. পি রোডের জংশনই ভি. আই. পি। অটো তাই বলে, দ্রুত বিধাননগর রোড স্টেশনের দিকে ঘুরে যায়। সুজন এ্যাটাচি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটেটিভ্‌ হিসাবে সুজনের নতুন বরাদ্দ করা এলাকাটা সুজন তেমন চেনে না। যেভাবে সে কসবা গড়িয়াহাট, যোধপুর পার্ক বা লেক অঞ্চল এমন কি সন্তোষপুর পর্যন্ত জানে—বছর দেড়ের এ্যাসাইনমেন্টে জেনে গেছে, সেভাবে জানে না। সুজন বোম্বের এই কোম্পানিটিতে নতুন জয়েন্‌ করেছে। এতকাল, হিসেব করলে বছর পনের, সে একটি বাঙালি প্রতিষ্ঠানের হজমের ওষুধ, চোঁয়া ঢেঁকুর, গলা বুক জ্বালা, সেবনে সাইড্‌ এফেক্ট নেই ; মাথার তেল, সুগন্ধি সাবান, মুখে মাথার ক্রীম জাতীয় মালপত্রই বেচে এসেছে। সুজন সে অর্থে, যাকে বলে মেডিক্যাল রেপ্‌ ছিল না। কিন্তু ওই অম্বলের ওষুধের সুবাদে মেডিক্যাল্‌ রেপ্‌ হিসাবে তার একটি ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিল। আর এই দাবি, সুপারিশ এবং যৎপরোনাস্তি স্মার্ট ইনটারভ্যু সুজন হাজরাকে একটা বার্থ করে দেয়। এঁরিয়া সেলস্‌ রেপ্‌ হিসাবে কলকাতার পূর্ব প্রান্ত এখন সুজনের কর্মক্ষেত্র। ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি—এখন সব বাড়িতেই টি. ভি তে মহাভারত হচ্ছে। সুজন ভি. আই. পি জংশনে দাঁড়িয়ে কিছুটা

বিব্রত বোধ করে। এখান থেকে সে কোথায় যাবে, সহসা ঠিক করতে পারে না।

সুজনের বর্তমান কোম্পানিটি দোআঁশলা, বা তে-আঁশলা। সে হিসাবে কুলীন, জাত আছে। সুজন আগের কোম্পানীতে কখনও টাই বাঁধেনি। দাসদা, হরিবাবু বলাই নিয়োগী এরা তো ধুতি পরেই চালিয়ে গেল। ধুতির নিচে দড়ি বাঁধা আণ্ডারওয়্যার। গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি অথবা সার্ট। পনের কিশ বা তিরিশ বছর আগেকার ইণ্ডাস্ট্রিতে মেডিক্যাল রেপ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এ নিয়ে সুজন ভাবেনি কখনও, এখন ভি. আই. পি জংশনে দাঁড়িয়ে ভাবল। বলাই বাহুল্য, লেকটাউন, দমদম পার্ক, বাগুইহাটি কেন্দ্রিক আজকের এই ক্যামপেন, স্পেশ্যাল ক্যামপেনে দাসদা এবং সুজনের জানাশোনা, সুজন যাদের কাছে কাজ শিখেছে, পুরনো ইস্কুলের রেপ্‌দের বিশেষ কোনো স্থান নেই।

ভাদ্রের পচা গরমে সকালে বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা ভাবটা কাটেনি। গলায় জ্যাব্‌জেবে ঘামের উপর সার্টের শক্ত কলারে টাই এর ফাঁস শক্ত হয়ে বসেছে। বিশেষ যখনই টাই এর নট্ ধরে সুজন আরেকটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন ধুতি পাঞ্জাবি, এদেশের জলবায়ু, ভাদ্র মাস ইত্যাদি মিলিয়ে সুজন স্বগত হল ঃ ধুতি আণ্ডারওয়্যারে দাসদারা মহান ছিলেন। ফুল স্লীভ সার্ট, টাই কিছুটা ফ্যাশন দুরস্ত ট্রাউজার এবং সমোজা বুটজুতোয়, ভাদ্রমাসের বেলা দশটায় ভি. আই. পি জংশনে সুজনের নিজেকে কিম্ভুত কদাকার লাগে।

সে দাসদা প্রমুখ একদা সহকর্মীদের কথা মনে করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনুপ্রাণিত তার প্রাক্তন স্বদেশী কারখানার অনায়াস জীবনযাত্রা মনে করে এবং তার বর্তমান দোআঁশলা বা তে-আঁশলা কোম্পানির ওপর বিরক্ত হয়।

কোম্পানিটিতে জাপান, বৃটিশ ও ভারতীয় লগ্নী আছে। সুজনের পুরনো স্বদেশী কোম্পানীতে গৌরবোজ্জ্বল স্বদেশী পুঁজি ছিল। একদা ফার্মাসির ছাত্র হলেও, ছাত্র রাজনীতিতে সুজনের অবস্থান ছিল খানিকটা বামঘেঁষা। তেমন কট্টর না হলেও প্রতিবাদী। আলাদাভাবে চিন সোভিয়েত দ্বন্দ্ব, মাও ৎসে-তুংএর কনট্রাডিকশন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়ে মগজমারি না করেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে থাকা যায়। বামপন্থী বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে থাকা যায়। সুজন তা ছিল।

অতঃপর তার প্রাক্তন স্বদেশী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনুপ্রাণিত কোম্পানিতে সুজন হাজরা বি-ফার্মা হিসেবে জয়েন করে। তার প্রতিবাদী চরিত্র তখনও মোটামুটি অটুট ছিল। সক্রিয় না হলেও সে কোম্পানির মেডিক্যাল রেপ্ ইউনিয়নের সোচ্চার কর্মী ছিল। একদিকে জাতীয় পুঁজির বিকাশে সহযোগী, অন্যদিকে রেপ্ ইউনিয়নের প্রতিবাদী কর্মী হিসেবে সুজন হাজরা বি-ফার্মার তেমন কোনো সংকট দেখা দেয়নি। ঢিলেঢালা সংস্থায়, ঢিলেঢালা গতিতে দিন চলে যাচ্ছিল। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, ন্যূনতম বোনাস, সেলস্ কমিশন যথাযথ। মাঝে মাঝে দাবিদাওয়া নিয়ে ইন্-কিলাব।

কিন্তু এভাবে এই ঢিলেঢালা গতিতে তো সবকিছু চিরকাল চলে না, চলতে পারে না। এদিকে রাকেশ শর্মা মহাকাশে যাবে রকেটযানে, অন্যদিকে দাসদা প্রমুখরা স্বদেশী কোম্পানি চালাবে কোঁচা দুলিয়ে, এটা হয় না। স্বদেশী পুঁজির সব ছিল। মাথার তেল কিংবা ক্রীমের গুডউইলও মন্দ নয়। তবু যা ছিল না, সুজন বোঝে, তা হল গতি। পরবর্তী শতকে যাওয়ার গতি।

ধীরে, অনিবার্যভাবে স্বদেশী কোম্পানির গতি ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে এল। এই শ্লথতা হাড় হিম করে! দাসদারা আশাবাদী চিরকাল। সুজন সম্ভবত, অন্তত সুজন তাই মনে করে, খানিকটা বামপন্থী দূরদৃষ্টিতেই সময়মত বুঝেছিল, স্বদেশী পুঁজির দিন শেষ হয়ে আসছে। সুজন দোআঁশলা কোম্পানিতে বার্থ পাওয়ার চেষ্টা করে—পেয়ে যায়।

॥ দুই ॥

সুজনের নতুন কোম্পানি আকাই-ম্যাকলয়েড সিংহানিয়া পাবলিক লিমিটেড্ মূলত জন্মনিয়ন্ত্রণের অনিয়ন্ত্রিত দুনিয়ায় কাজ করে। আকাই-ম্যাকলয়েড্ জোট মালটিন্যাশনাল্। সিঙ্গাপুরে রেজিস্ট্রিকৃত। মূল কাজ পুরনো বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে—ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে! আফ্রিকার কিছু দেশে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইতিমধ্যেই আকাই ম্যাকলয়েড মার্কা কনডোম রেকর্ড উৎপাদনের নজির সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশে কন্‌ডোম শিল্প না থাকলেও তার এজেন্ট ছিল। কাজ করতে করতে সুজন জেনেছে ম্যাকাই, অর্থাৎ ম্যাকলয়েডের 'ম্যাক' আর 'আকাই'-এর 'আই' সন্ধি নিষ্পন্ন ল্যাটেক্স কনডোম বিলিতি মাল হিসেবে ভারতের চার মহানগরীতে নাকি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'নিরোধ' সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্বে দেশীয় বিত্তবান সম্প্রদায় 'ম্যাকাই' কনডোম্‌কে আপন করে নিয়েছিল।

এখন আকাই-ম্যাকলয়েডের ভারতীয় সংস্করণ তৈরি হচ্ছে বাঙ্গালোরের কাছে এক শহরতলীতে। বিশ্বব্যাঙ্কের একটি প্যাকেজে উন্নত শ্রেণীর প্রাকৃতিক রবার চাষের ব্যাপক বিনিয়োগের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে 'ম্যাকাই' কনডোম সম্পর্কিত একটি সহযোগিতা চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। দিল্লীর জনস্বাস্থ্য, যোজনা ও শিল্প দপ্তর ভারতে নয়ের দশকে জন-সংখ্যারোধে রবার, বিশেষ করে প্রাকৃতিক রবার এবং সেই রবারজাত 'ম্যাকাই' কনডোমকে মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানিয়েছেন শোনা যায়। বিশ্বব্যাঙ্কের বদান্যতায় এই 'ম্যাকাই' কনডোমের ভারতীয় উৎপাদনের শতকরা তিরিশ ভাগ দেশের দারিদ্র্য-সীমার নিচের মানুষদের মধ্যে বিনিপয়সায় বিলি করার সুযোগও পাওয়া গেছে। সুজন 'আকাই-ম্যাকলয়েড'-এ দুবছর কাজ করতে করতে এ ব্যাপারে অনেকটাই জ্ঞান অর্জন করেছে। সুযোগ পেলে বামপন্থী রাজনীতি-সচেতনতা এখনও যেহেতু তাকে পুরনো অর্শের ব্যথার মতো মাঝে মাঝে জানান দেয়, একান্তে সুজনের ক্ষতে রক্ত ঝরে, সুজন হাজরা

মাঝে মাঝে বিশ্বব্যাঙ্কের সৃজনশীল শিল্পে অতিকায় 'ম্যাকাই' কনডোম পরিয়ে দেওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে। হ্যাঁ আপন স্বজন, এমনকি অফিসের রেপ্ ইউনিয়নের সভাসমিতিতেও সুজন তার বাসনার কথা ব্যক্ত করে।

এ হল ক্ষোভের একজাতীয় প্রকাশ। অন্যদিকে নিজস্ব একান্ত জগতে, সুজন যেভাবে প্রতিবাদী তা প্রসঙ্গান্তর। যাই হোক, পূর্বাঞ্চলের জোনাল ম্যানেজার অনিল বাসওয়ানি তাঁর সাম্প্রতিক প্রেস রিলিজে যে কথাটি জানিয়েছেন, ভি. আই. পি জংশনে দাঁড়িয়ে সেই কথাটিই মনে পড়ল। চাকুরিরত সুজন হাজরা বি-ফার্মা এসময় অত্যন্ত অনুগত, সময়ানুবর্তী এবং ম্যানেজার জাতীয় প্রাণীদের সম্বন্ধে সহনশীল শ্রদ্ধাবান। সুজন প্রেস রিলিজটিকেই মনে মনে প্রায় নির্ভুল আউড়ে গেল। এটা একরকম মহড়া। কারণ পয়লা সেপ্টেম্বর, কী কাণ্ড এটা ভাদ্র মাসেরও মাঝামাঝি, সুজন ভাবল জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ক্র্যাশ প্রোগ্রাম লঞ্চ করার প্রকৃষ্ট সময়, ভাদ্র সারমেয়দিগের মেটিং সিজন্। এসময় শহরে, গ্রামে-গঞ্জে প্রাকৃতিক প্রবণতাতেই সারমেয়কুল অনিয়ন্ত্রিত জন্মদানের জন্য, বংশবৃদ্ধির জন্য ব্যাকুল থাকে।

সুজন হাজরা বি-ফার্মার সামনে দিয়ে একটা এল থ্রি সি রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ধ্যাকড় ধ্যাকড় করতে করতে চলে গেল। ফাঁকা। সুজনের ভাবনা, যা ভাষায় প্রকট তা সাধুভাষায় কেন, এই প্রশ্ন বি-ফার্মার কোর্সে সুজন কোথাও পায়নি। আসলে অনিল বাসওয়ানি, জোনাল ম্যানেজার 'ম্যাকাই'-এর প্রেস রিলিজটি ইংরেজিতে করা, বাংলা খবরের কাগজে সাধু ভাষায় অনূদিত। ইংরেজিতে সাধুভাষা চলিত ভাষার ভেদাভেদ সুজন জানে না। কিন্তু আনন্দবাজারে প্রকাশিত প্রেস রিলিজ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ গুরুগম্ভীর বঙ্কিমী বিজ্ঞাপনে 'ম্যাকাই' সাধু ভাষায় ছিল। এতে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি প্রাকৃত ক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন হলেও 'ম্যাকাই' জন্মনিরোধক ল্যাটেক্স এক গম্ভীর মাত্রা পেয়ে যায়। এবং কনডোম্ সম্পর্কিত গণ আবেদন একটি ধ্রুপদী মর্যাদা পায়। 'ম্যাকাই' কম্পিউটারে একশত ভাগ পরীক্ষিত স্থিতিস্থাপক। এই নিরাপত্তা ইতিমধ্যে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রে সর্বজন-স্বীকৃত। নমনীয়তায় জনপ্রিয়। ইত্যাদি ইত্যাদি……

প্রেস জানিয়েছে এখন থেকে সমস্ত সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে 'ম্যাকাই' বিতরণের জনমুখী কর্মসূচি শুরু হবে। 'প্রথম এলে প্রথমে পাবে' এই নীতিতে 'ম্যাকাই' বিতরিত হবে আপামর গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে। দারিদ্র্য-সীমার নিচের মানুষ, সর্বক্ষেত্রে যেমন এখানেও অগ্রাধিকার পাবে। শুধু দরিদ্র মানুষটির বয়স, পরোক্ষে তার যৌন উৎপাদনক্ষমতা সম্পর্কে পঞ্চায়েতের একটা সার্টিফিকেট চাওয়া হবে কিনা, এ নিয়ে বির্তক আছে। সুজন হাজরা বি-ফার্মা আজ এমনই কয়েকটি কর্মসূচির দায়িত্বে লেক টাউন, দমদম পার্ক, বাগুইহাটির অন্তর্বর্তী কিছু বস্তি এলাকার নেতৃত্ব দিতে এখন উল্টোডাঙা ভি. আই. পি. জংশনে।

॥ তিন ॥

মার্কেটিং ম্যানেজার দাশগুপ্ত এই বিশেষ প্রোগ্রামটির উদ্বোধনী আলোচনায় একটি মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন ছেড়েছিলেন খাঁ করে। প্রশ্নের লক্ষ্যস্থল সুজন হাজরা বি-ফার্মা এবং তার করিৎকর্মা এ্যাপ্রেন্টিস সেলস্ টিম্। প্রশ্নটি সুজন বহুবার ভেবেছে। বামপন্থী, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রশ্নটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে, কারণ দাশগুপ্ত উদাত্ত কণ্ঠে সেলস্ অ্যাপ্রেন্টিস্ তরুণ-তরুণীকে বলেছিলেন "খুঁজুন, প্রশ্নটির উত্তর খুঁজুন। একা একা খুঁজুন, সমবেত ভাবে খুঁজুন।"

ভি. আই. পি জংশনে সুজন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। "কনডোম্ কি ভোগ্যপণ্য ?"

সুজন দেখল ইতিমধ্যে জংশনটিতে ভিড় বেড়েছে। রবিবার হলেও মোটা-মুটি জমজমাট সকাল। এখন সম্ভবত মহাভারত শেষ। আজ কোন্ পর্ব ছিল কে জানে? অর্জুনের বৃহন্নলা-পর্বটি সুজন একদিন দেখবে বলে ভাবে। দ্রৌপদীর কাপড় টানাটানির পর্বটি যোগাযোগক্রমে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সুজনের ভালো লাগেনি। দৃশ্যটিতে না আদিরস না ভক্তিরস কিছুই খুঁজে পায়নি সুজন। যদিও রামদাস আগরওয়ালের বাড়িতে সেদিনও টি. ভি. সেটের সামনে প্যাঁড়া বাতাসার নৈবেদ্য, ফুল ধূপধুনো প্রভৃতি যথাযথ ছিল। মহাভারতের এই পর্বে টি. ভি. দেখা এবং কিষণ ভগবানের পুজো দুটোই একসঙ্গে সমাপন হত বলে রবিবার নটা থেকে দশটা রামদাস আগরওয়ালজী বেশ উৎফুল্লই থাকতেন। রামদাস 'ম্যাকাই'-এর অন্যতম এজেন্ট। পূর্বপুরুষ সূত্রে মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গের স্মাগলিং মূলত বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর ফলাও চোরাকারবারের যে রমরমা বাণিজ্য, রামদাস সেখানে প্রায় প্রথমশ্রেণীর ভারতীয় এজেন্ট হিসাবে গণ্য হয়। রামদাস আগরওয়ালজীর বদান্যতায় দুশো-আড়াইশো বেকার যুবকের ধান্ধা চলে। আজকের দিনে সে বড় কম কথা নয়।

রামদাসজী বর্তমানে 'সাবসিডাইজড্' অর্থাৎ ভর্তুকি দেওয়া 'ম্যাকাই' কনডোম্ উত্তরবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে চালান দেওয়ার কাজটির দেখভাল করে থাকেন। নুন, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির সঙ্গে 'ম্যাকাই' কনডোম।

সুজন রামদাসকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দাশগুপ্তর সেই প্রশ্ন—"আচ্ছা 'ম্যাকাই' কনডোম্ কী ভোগ্যপণ্য ?"

রামদাস সহজ কথাটি বড় সহজে বলেন। মোটাসোটা, স্নেহজ ঐশ্বর্য কিছুটা বেশিই। বুকে, পেটে, ঘাড়ে গর্দানে সহজ পেলব চর্বির থাক থাক বিকাশ রামদাসের ব্যবসায়ী অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়।

রামদাস প্রথমে প্রশ্নটি নিয়ে থতমত। তারপর বলেছিল "হাজরাবাবু, যা সওদা হয়, তাই তো পণ্য। আর ধরুন গে 'কনডোম' তো মানুষেরই ভোগে

লাগে, তাহলে সেটা হল গিয়ে আপনার ভোগ্যপণ্য। সুজন রামদাসের বাংলা-ভাষায় জ্ঞানের তারিফ করে।

কিন্তু যেটা খোঁচ থাকে তা হল কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষ রবার চাষের সঙ্গে, নিয়ন্ত্রিত মনুষ্য শাবক চাষের মধ্যেকার অপার বৈপরীত্য।

কদিন আগে 'ম্যাকাই' নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় চাংওয়াতে দাশগুপ্ত, সুজন নিজে আর একটি কাগজের রিপোর্টার একসঙ্গে। টেবিলে ভারতীয় ভদকা, চিলি প্রন্। রিপোর্টারটি 'ম্যাকাই'-এর উদ্ভব, বিকাশ,—মাল্টিন্যাশানাল বিশ্বব্যাঙ্ক শুনতে শুনতে চিৎকার করে উঠেছিলেন "শালা ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক ইন্ডাইরেকটলি আমার আপনার পেনিস শাসন করছে। বলেন কী মশায়"! দাশগুপ্ত তখন উত্তেজিত রিপোর্টারকে আশ্বস্ত করার জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মালয়েশিয়া কিংবা শ্রীলঙ্কায় রবার চাষের অগ্রগতির পরিসংখ্যান দিচ্ছিলেন। ভারতেও প্রাকৃতিক রবারের স্বর্ণ সম্ভাবনায় বিশ্বব্যাংক কী ভাবে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, তা ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

রিপোর্টারটি পুরো মাতাল হয়ে গিয়েছিল। চিৎকার করেই জনসমক্ষে বলছিল, রিপোর্ট করব। কালই শালা কাগজে বড় বড় হেডলাইন খবর বেরুবে "ভারতীয় লিঙ্গ-শাসনে বিশ্বব্যাংকের প্রশংসনীয় ভূমিকা। সাল্‌লা।"

॥ চার ॥

ভি. আই. পি. উল্টোডাঙা জংশনে দাঁড়িয়ে সুজন হাজরা বি-ফার্মা সিদ্ধান্ত নিল "নাঃ, কনডোম্ ভোগ্যপণ্যই।"

ল্যাটেক্সের জন্য রবার চাষ, চাষে অগ্রগতির খতিয়ান। সেচ, উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, ট্রাক্টর ইত্যাদির সঙ্গে 'ম্যাকাই' মারফত ভারতীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধির আনুপাতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটা তত্ত্ব খাড়া করতে চাইল সুজন। রবারের চাষে বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ বৃদ্ধি আকাই-ম্যাকলয়েড সিংহানিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ রবার উৎপাদন যত বাড়বে, জনসংখ্যা ততই কমবে।

—"উন্নত দেশে জনসংখ্যা কম কেন?" সুজন হাজরাকে 'ম্যাকাই'-এর বোর্ড ইনটারভিউতে জিজ্ঞেস করেছিল। সুজন আমতা আমতা করে বলেছিল "স্যার, উন্নত দেশে এনটারটেনমেণ্টের জন্যে হাজারো উপায় আছে। আমাদের দেশের সুখী-অসুখী দম্পত্তির রাত্রের বিছানা ছাড়া এনটারটেনমেণ্টের, সত্যি কথা বলতে কী স্যার অন্য ক্ষেত্র নেই।" দাশগুপ্ত শালা মামদো মতো বসেছিল। বলেছিল "এনি আদার পয়েণ্ট? পার্টলি আপনি ঠিকই বলেছেন। সে জন্যেই আমরা ভারতবর্ষকে 'ম্যাকাই' উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি।" বোর্ডে অনিল বাসওয়ানিও ছিলেন। বলেছিলেন "আরো একটা পয়েণ্ট আছে মিঃ হাজরা। ওদেশে মেয়েরা পিউবার্টির আগে কনট্রাসেপটিভ

পিল নেয়, আর ছেলেরা কনডোম্।"

বোর্ডের চেয়ারম্যান ডিরেক্টর সিংহানিয়ার ভাগনে, সুজন যাকে পরে চিনেছিল পরিবার কল্যাণের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে, কলকাতায়, ডাঃ ফুটনানি বলেছিলেন "ওঃ, আমাদের সমাজে, দেশে, ইস্কুল-কলেজে যে কবে সেক্স্ এড্যুকেশনের একটা কোর্স চালু করা যাবে।"

ভি. আই. পি-র মোড়ে দাঁড়িয়ে সুজন হাজরা ভাবল ডাঃ ফুটনানির সঙ্গে দেখা হলে সে বলবে সেকস্ এড্যুকেশন সম্বন্ধে বিশ্বব্যাংক বরং ভারত সরকারকে বলুক, প্রাইমারি ইস্কুল স্টেজ থেকে যথাযথ সেক্স্ এড্যুকেশন্ চালু না হলে আমরা রবার চাষে আমাদের সহায়তা বন্ধ করে দেব।"

এসব ভাবনার টানাপোড়েন বেলা সাড়ে দশটার ভাদ্রের রোদে সুজনকে তাতিয়ে দিচ্ছিল। সুজন রোজই একবার করে আবিষ্কার করে, অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ভোগ্যপণ্য হলেও 'ম্যাকাই' এর এরিয়া সেলস্ রেপ্ হিসেবে সে সুখী নয়।

অসুখী সুজন হাজরা ঝাঁ ঝাঁ রোদ থেকে আড়াল পেতে রাস্তার ধারে একটা পান বিড়ি সিগারেটের দোকানের দরমার খাড়া করা ঝাঁপের নিচে সরে আসে। দোকানের দরমার ঝাঁপের নিচে আরো দু-তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত বাগুইহাটি, লেক্ টাউন বা এয়ারপোর্টের বাসের প্রতীক্ষায়।

সুজন সাধারণত সিগারেট খায় না। এখন খেতে ইচ্ছে করল। সুজনের সুনির্দিষ্ট কোনো ব্র্যাণ্ড নেই। সুজন দোকানের শেল্ফে সিগারেটের প্যাকেট-গুলো, খানিকটা অমনোযোগী, দেখছিল। আসলে দোকানের ঝাঁপের নিচে খানিকক্ষণ ছায়া পাওয়ার জন্যে সুজন দোকানীকে একটা দাম দিতে চাইছিল। হাতের এ্যাটাচিটা পাশে নামিয়ে রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতে সুজন বলল "একটা ফিলটার উইলস্ দেবেন ভাই ?"

সুজন দোকানের আয়নায় নিজের মুখ দেখল। চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াল। আর তখনই, আয়নায় চেনা মুখ দেখতে দেখতে আয়নার পাশে সুদৃশ্য প্যাকটে অর্ধনগ্ন নরনারীর আবছা অবয়বে অতিপরিচিত 'ম্যাকাই-'এর প্যাকেট দেখতে পেল সুজন।

বিশ্বব্যাংক রবার উৎপাদন কর্মসূচি এবং ম্যাকলয়েড-আকাই-সিংহানিয়া ভি. আই. পি. উল্টোডাঙা জংশনে পানের দোকান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সুজন হাজরা, খানিকটা অভিভূতই, নারকেল দড়ি থেকে সিগারেট ধরিয়ে পান বিড়ির দোকানের ঝাঁপের নিচ থেকে বেরিয়ে আসে।

॥ পাঁচ ॥

এমন নয় যে পানের দোকানে 'ম্যাকাই'-এর প্যাকেট পাওয়া খুব বিস্ময়ের, তবু এর একটা প্রাথমিক ধাক্কা আছে। সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ওষুধের দোকানে, 'ম্যাকাই' পাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু তাই বলে পান বিড়ি সিগারেটের দোকানে, কিছু স্টেশনারি দোকানে সুজন এখন এয়ারপোর্টমুখী বাসে। আজ এদিকে তাদের

পাঁচটা বিশেষ ক্যামপেন্ আছে। ওষুধের দোকান, স্টেশনারি দোকান তো আছেই —পানের দোকানও যে ড্রাইভ দেওয়ার একটা ক্ষেত্র হতে পারে, এটা মনে করে সুজন একটু মজা পেল। এছাড়া বস্তি এলাকায় দরিদ্র মানুষের জন্য বিশেষ 'ম্যাকাই' ক্যামপেন্ তো আছেই।

সুজন পানের দোকানে নিজেকে একজন সম্ভাব্য 'ম্যাকাই' ক্রেতা হিসেবে কল্পনা করে।

—"দাদা, তিনশো জর্দা দিয়ে একটা বাংলা পান।"

পানওয়ালা পানপাতায় চুন লাগায়।

—"এক প্যাকেট ফিলটার উইলস্।"

দোকানদার সিগারেট বাড়ায়। পানে খয়ের দেয়। তিনশো জর্দার কৌটো হাতে নেয়। পাশে অন্তত আরও তিনটি খরিদ্দার।

সুজন বলে "আর এটার একটা প্যাকেট দেবেন।"

এটা বলার সময় সাধারণ একজন ক্রেতার মুখের ভাব কেমন হবে সুজন জানে না। কিন্তু পানওয়ালা ভাব দেখেই বুঝে নেবে, বলাই বাহুল্য। সে আয়নার পাশ থেকে 'ম্যাকাই' এর সুদৃশ্য প্যাকেটটি এগিয়ে দেবে। হয়তো বলবে "খুব চলছে এটা—বিলিতি কোম্পানী।"

যাঃ, এরকম আবার হয় নাকি? সুজন হেসে ফেলে একা আপন মনে। বাস কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করে সে দমদম পার্ক স্টপেজে নেমে গেল। এখান থেকে রিকশা নিয়ে শরৎ কলোনিতে যেতে হবে। কলোনি এবং তার কাছাকাছি দমদমের সাত্ নম্বর বস্তি সুজন চেনে না। কিন্তু এগারোটার সময় একটি সমাজ-সেবী সংস্থা বিনামূল্যে 'ম্যাকাই' বিতরণের একটা কর্মসূচি নিয়েছে। সুজন সেখানে থাকবে। দু-চারজন মান্যগণ্য লোক, ডাক্তার প্রমুখ থাকবেন। সুজন সাত নম্বর বস্তির জন্যে রিকশা নিল।

বস্তির কাছাকাছি এসে রিকশা বলল, 'আর যাব না বাবু'। সুজন এ্যাটাচি হাতে নেমে পড়ল। নিঃসংশয় হওয়ার জন্য বলল, "এটাই সাত নম্বর তো?"

॥ ছয় ॥

সাত নম্বরের ভেতরে একফালি সবুজ জমি আছে। স্থানীয় একটি ক্লাবের ছেলেরা মাঠটির দখলে। আসলে এটা একটা কাঠ-চেরাই কলের জায়গা ছিল। এখন নেই। রিকশা থেকেই ভাষণের শব্দ শুনে সুজন নিশ্চিত 'ম্যাকাই' কর্মসূচির অকুস্থলে সে হাজির হয়ে গেছে।

মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক ভাষণ দিচ্ছেন। মাথায় ওপর চাঁদোয়া টাঙানো। মঞ্চের সামনে বেশকিছু বাচ্চা-কাচ্চা সেজেগুজে বসে আছে।

বক্তা বলছিলেন "ভারতে জনসংখ্যার এই বিপুল সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এখন তার সঙ্গে 'ম্যাকাই' যুক্ত হল। বিদেশী প্রযুক্তিতে এই উন্নতমানের জিনিসটি আপনাদের

খুবই কাজে লাগবে আশা করি…"

সুজনকে দেখে তার টিমের তিনজন ছেলে, এগিয়ে এল। সঙ্গে কালো মোটাসোটা চেহারার এক মহিলা,—সমাজসেবিকা। সুজন এই কর্মসূচি সম্পর্কে অফিসে আলোচনার সময় একে দেখেছিল। টিমের একজন বলল, "স্যার এই হল মালতীদি, মালতী সাঁতরা। উনি একটা লিস্ট তৈরি করেছেন। লিস্ট অনুযায়ী আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব। মালতী সাঁতরা উত্তর চল্লিশ। কিঞ্চিৎ পৃথুলা। সধবা না বিধবা বোঝা যায় না। সুজন লিস্টের দিকে নিবিষ্ট হতে হতে ভাবল, বিয়েই হয়নি এমনও তো হতে পারে।

"লিস্টটা আপনারা কীভাবে তৈরি করলেন ?"—সুজন জিজ্ঞাসা করল। এক মহিলার সঙ্গে, যদিও তিনি সমাজসেবিকা, কনডোম্ বিতরণ সম্পর্কিত আলোচনায় অস্বস্তি আছে। তাছাড়া ভাদ্রের বেলা বারোটা। সুজন যেন খুব নজরে না পড়ে, এভাবে টাইটা খুলে ফেলল। বুকের একটা বোতাম খুলে ঘামে ভেজা কলারটা পিঠের দিকে টেনে দিল।

মালতী সাঁতরা বললেন, "গতকালই আমরা ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে মিটিং করে লিস্ট তৈরি করেছি। বস্তির একশো বাইশজন যুবাপুরুষের মধ্যেই জিনিসটা দেব।"

মালতী সাঁতরা কথা বলতে বলতেই, যেন যুবাপুরুষ প্রসঙ্গেই, সুজনের বোতাম খোলা লোমশ বুকের দিকে তাকান। সুজন সলজ্জ, সে যে নিরাবরণ–ছোট্ট মাঠে ভাদ্রের আকাশের নিচে 'ম্যাকাই' আবৃত—সামনে চল্লিশোর্ধ্বা মালতী সাঁতরা—সমাজসেবিকা। ঘামে, পাউডারে, মালতী সাঁতরার মুখে গলায় সাদা-কালো ছোপ-ছোপ।

সুজন বলল, "লিস্টটা তো ভালোই হয়েছে। এজ গ্রুপে ২২ থেকে ৪২ বছর বয়সের পুরুষ আছে। কিছু বেশি বয়সের লোকজনকেও দিতে পারতেন।"

বলতে বলতে মালতী সাঁতরা এবং ছোট্ট টিমটি নিয়ে অদূরে একটি ছোট টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় সুজন। চেয়ারে যিনি বসে, মাথায় টাক, গায়ে গেঞ্জি, পরনে ধুতি অনেকটা লুঙ্গির মতো করে, তাকে সব্বাই বেচাদা, বেচাদা বলে ডাকছিল।

সুজনের টিমের ছেলেরা বলল, "ইনিই বেচাদা, ক্লাবের সেক্রেটারি।" বেচাদা, সম্ভবত সুজনের পোশাকে, হয়তো একটু আগে গলায় টাইটিও প্রত্যক্ষ করেছেন, উঠে দাঁড়ালেন খানিকটা সম্ভ্রম দেখাতেই।

সুজন একটু পিঠ-চাপড়ানোর সুরে বললেন, "আজ প্রথমেই আপনাদের ক্যাম্পে এলাম। তো ভালোই বন্দোবস্ত করেছেন আপনারা। লোকজনও খারাপ হয়নি।"

বলতে বলতে দেখা গেল মঞ্চের সামনেই বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হুটোপাটি লেগেছে। মঞ্চের বক্তা বক্তৃতা থামিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "ভলান্টিয়ার্স, এসব কী হচ্ছে কী ? এটাই কি বাচ্চাদের বোঁদে দেওয়ার সময় ? এমন অবস্থা চললে

আমাদের অনুষ্ঠান…”

মঞ্চের কাছাকাছি প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচিতে বক্তার বাকি কথা শোনা গেল না। বাচ্চাদের মধ্যে দুজন গেঞ্জি পরা অল্পবয়সী ছেলে দুহাতে দুটি বালতি উঁচু করে ধরে আছে। তারা মঞ্চের সামনে থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। সুজন বুঝল বালতিতে বোঁদে আছে।

বেচাদা ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে বিশৃংখল মঞ্চের দিকে ধেয়ে গেছেন।

মালতীকে সুজন জিজ্ঞেস করল, “বাচ্চাদের আবার এর মধ্যে আনতে গেলেন কেন ?”

মালতী সাঁতরা বললেন “কী করা যাবে বলুন, পাড়ার অনুষ্ঠান তো। পাড়ার বাল-বাচ্চারা না থাকলে অনুষ্ঠান হয় ?”

সুজন বলতে চাইল, “তা বলে ‘ম্যাকাই’ কনডোম বিতরণ অনুষ্ঠানে ?”

ইতিমধ্যে বেচাদা মঞ্চের দখল নিয়ে হুংকার দিয়ে উঠলেন, “এ্যাই ছেলেমেয়েরা লাইন দিয়ে দাঁড়াও। তোমাদের জন্যে যথেষ্ট বোঁদের ব্যবস্থা আছে। গোলমাল কোরো না।”

সভা কিঞ্চিৎ সুশৃংখল। বোঁদেপ্রার্থী শিশুরা শৃংখলাপরায়ণ সারিবদ্ধ। বেচাদা এবার বড়দের উদ্দেশে জানালেন “সমাপ্তি সংগীত দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হবে। কিন্তু বড়রা, কাল যারা ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন, তারা জিনিস না না নিয়ে চলে যাবেন না।”

সমাপ্তি সংগীত গাইতে বোঁদে হাতে ফ্রক পরা রোগাসোগা·চার পাঁচটি মেয়ে উঠল মঞ্চে।” “হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর” শুরু হল।

একটি টেবিলে হারমোনিয়ামের রীড টিপে আছে একজন ঘোমটা মাথায় মহিলা। মঞ্চের পাটাতনে তবলাও আছে। বাদককে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবলার শব্দ আছে লাউডস্পীকারে।

সুজন দেখল স্থানীয় যুবকদের দু, তিনজন এবং তার টিমের তিনটি ছেলে বেচাদার টেবিলের সামনে কয়েকজনকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মাথা গুনতিতে সুজন গুনে দেখল, আটজন।

দারিদ্র্যসীমা, অন্তত এই আটজনের ক্ষেত্রে, সুজন যথাযথ দেখতে পেল। প্রথম জনের গালে না-কামানো সাদা দাড়ি, মাথার চুল শনসাদা। বয়সের ভারে কিঞ্চিত নুব্জ। পেছনের জন এরই রকমফের। তার পেছনের জন, তার পিছনে। সুজন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

মালতী সাঁতরা এখন ব্রাউন কাগজের মোড়ক খুলে ‘ম্যাকাই’এর তিনটির লুজ সুদৃশ্য প্যাকেট টেবিলে রাখছে। সুজন ‘ম্যাকাই’ বিতরণের টেবিলে এগিয়ে গেল।

একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টায় প্রথমে ‘মিসেস সাঁতরা’, পরে সংশোধনের ভঙ্গিতে “শ্রীমতী সাঁতরা একটু শুনবেন” বলে মালতীকে ডাকলেন। একটু রুক্ষ ভাবেই বললেন “লিস্টে এদের নাম আছে ?”

মালতী সাঁতরা, সমাজসেবিকা, বললেন, "ও নিয়ে ভাববেন না, ওদের নামও তুলে নেব।"

সুজন বলল, "কিন্তু বাইশ থেকে বেয়াল্লিশ এজ গ্রুপের যাদের নাম দেখলাম, তাদের কাউকে তো লাইনে দেখছি না।"

মালতী সাঁতরা বললেন, "সেসব ব্যবস্থা বেচাদা আর ক্লাবের ছেলেরা করে দেবে। আপনি ভাববেন না।"

"হও ধরমেতে ধীর" শেষ হয়ে গেল।

॥ সাত ॥

সুজন উত্তেজিতভাবে বলল, "এটা হয় না, হতে পারে না বেচাবাবু।"

বেচাদা নির্বিকার। বললেন, "চা খান, চা খান। ক্যাম্প দেখতে এসেছেন, দেখে যান। এরকম পরিবার কল্যাণ ক্যাম্প আমরা অনেক করেছি। আপনি হয়তো প্রথম আসছেন, তাই জানেন না।"

"যাদের আপনারা ম্যাকাই দিলেন, তারা কি, মানে আমি বলতে চাইছি—" সুজন আটজন নুব্জদেহ দারিদ্র্যসীমার নিচের বৃদ্ধের কথা বলতে চাইছিল। ক্ষোভে, রাগে তার গলা বুঁজে আসছিল।

বেচাদা কিছুটা উত্তেজিত। বললেন, "কী বলতে চান আপনি? লাইনের প্রথমে যাকে দেখলেন, ওর নাম গিরীন পালুই। গতবছরও ওর একটা মেয়ে হয়েছে।"

সুজন বলল, "কিন্তু বাইশ থেকে বেয়াল্লিশ বছরের যে লিস্টটা দেখলাম?"

মালতী সাঁতরা, সমাজসেবিকাও, এখন একটু ক্ষুব্ধ, রাগত। বললেন, "স্বেচ্ছাসেবকরা যা করছে যথেষ্ট, আপনি একশো বাইশ জনের লিস্ট পাচ্ছেন। নিয়ে যান। কোম্পানিতে জমা দিয়ে দেবেন।"

সুজন হাজরা বি-ফার্মা কোম্পানি থেকে মাস গেলে দু-হাজার টাকারও বেশি মাইনে পায়। এসময় ভেতর থেকে সুজন কর্তব্যের তাগিদ অনুভব করে। সততা ও সত্যনিষ্ঠা তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত করে।

উত্তেজিত সুজন বলল, "আপনারা বিতরণ করতে না পারলে মালগুলো কোম্পানিতে ফেরত দেবেন, কথা ছিল।"

বেচাদা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। বললেন "দেখুন মশাই, অনেকক্ষণ ধরে অনেক বারফট্টাই দেখাচ্ছেন আপনি। এসব রঙবাজি আমাদের অনেক দেখা আছে। আপনার মাল তো বিনেপয়সায় বিলি করার জন্যে। আমরা করেছি। যতটা হয়নি বাজারে ঝেড়ে দিয়েছি। যার দরকার সে পয়সা দিয়ে কিনে ইয়েতে লাগিয়ে নেবে।"

সুজন হাজরা বি-ফার্মা কিছুটা দিশেহারা, ক্যাম্প সম্পর্কে কোম্পানির দাশগুপ্ত কিংবা বাসওয়ানির কাছে তাকে রিপোর্ট করতে হবে। ক্ষোভ রাগ দমন করতে উদ্যোগী সুজন বলল "এই ক্যাম্প সম্বন্ধে আমি কী রিপোর্ট দেব বলতে পারেন?"

ছোটখাটো একটা ভিড়ের বৃত্ত, কারণ 'ম্যাকাই' নিয়ে একটা কাজিয়ার মতো। বেচাবাবু বললেন "সে আপনি যা ইচ্ছে রিপোর্ট দিন। লিস্ট নেবেন নিন। না হলে পোঁদ পুঁছে ফেলে দিন!"

"তাবলে হাজার দুয়েক টাকার মাল এভাবে আপনারা বেচে দেবেন।"

ক্লাবের আরেকটি ছেলে, কিঞ্চিৎ পেশীর আস্ফালন আছে, কারণ আস্তিন একটু ওপরে তোলা, বলল "আজকের ফানশানের খরচটা কোথা থেকে আসত গুরু?"

সুজন আত্মরক্ষার তাগিদে বলল "আমরা তো একশো টাকার কন্টিনজেন্সি দিয়েছিলাম ক্যাম্পের জন্য।'

ছেলেটি বলল "একশো টাকায় এস্টেজ, মাইক হয়! বাচ্চাগুলো এসেছে—ওদের বৌদের খরচ হয়! তারপর ধরুন তো, ক্যাম্পের জন্য ক্লাবের ছেলেরা তিনদিন ধরে খাটছে। তাদের খরচাপাতি আছে। সভাপতির জন্য মালা আছে, রিকশাভাড়া আছে—হয়! মাগনার কগণ্ডা ক্যাপ, তাই নিয়ে এত কথা।"

লাউডস্পীকারে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হল। একটা বাজে।

॥ আট ॥

সুজন হাজরা বি-ফার্মা ভাবল, এ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক এবং 'ম্যাকাই' নিয়ে সে আর ভাববে না। সে শুধু দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ক্যাম্পে যাবে। বিনামূল্যে 'ম্যাকাই' গ্রাহকদের তালিকা নেবে এবং অফিসে বসওয়ানি বা দাশগুপ্তকে রিপোর্ট দেবে। বিশ্বব্যাংক বা তাদের রবার চাষের কর্মসূচিতে তার ফলে যা হওয়ার হোক।

যেহেতু মেডিক্যাল রেপ্ এবং তার সওদা আকাই-ম্যাকলয়েড-সিংহানিয়ার সর্বাধুনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কনডোম্ এবং পানের দোকানও 'ম্যাকাই'-এর স্টকিস্ট হতে পারে, সে এরপর পানের দোকানের তালিকা তৈরি করবে এবং দেশলাই বা সিগারেটের প্যাকেটে কনডোমের বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রস্তাব কোম্পানির সামনে রাখবে।

আকাশে হঠাৎ করে কালো ভারি মেঘ। একটু আগে রোদের জ্বালাধরানো ভাব কেটে গেছে। কাছেই কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসে ঠাণ্ডা ভেজা ভাব। ফিরতি পথে জানলার পাশেই বসার জায়গা পেয়ে যায় সুজন। ঠণ্ডা হাওয়া তার এলোমেলো চুলে বিলি কাটে। সুজন হাজরার দুচোখ বুঁজে আসে।

বহুবারের দেখা কিছুটা আবছা, ভাসাভাসা একটা দৃশ্য নাকি স্বপ্নই সুজন হাজরার আধবোজা চোখের সামনে নেমে আসে। মহাকাশযানের বিশাল ক্যাপ-সুলের মতো ল্যাটেক্সের এক অতিকায় কনডোম্। স্বচ্ছ, খানিকটা যেন বেলুনই। সুজন কোট প্যান্ট টাই, সমোজা বুটজুতো সেই বেলুনের মধ্যে ঢুকে ভারহীন ভেসে আছে। সুজন ভাসছে, ভাসছে, ভাসছে।

হঠাৎ কন্ডাক্টর ভি-আই-পি, ভি-আই-পি করে চিৎকার করে উঠতেই সুজনের

স্বপ্নের বেলুন ফেটে যায়, সুজন ধড়মড় করে উঠে পড়ে।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে। সুজন দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এপারে চলে আসে। বৃষ্টির জন্য রাস্তার ওপরে লোকজন কম। সকালের সেই পানের দোকানের ঝাঁপের নিচে দুটো লোক। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে সুজন হাজরা দৌড়ে ঝাঁপের নিচে চলে এল। রুমাল বার করে মাথা মুছল। এ্যাটাচি থেকে চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াল। তারপর পানের দোকানের আয়নার পাশে 'ম্যাকাই'এর সুদৃশ্য প্যাকেটটির দিকে তাকিয়ে দেখল।

পানওয়ালাকে বলল "একটা ফিলটার উইলস্ দিন না ভাই।"

দোকানদার সিগারেট বাড়াল। সুজন হাজরা দোকানদারকে বলল, "ভি-আই-পি রোডের শুরুটা ঠিক কোনখানে বলতে পারেন? বেলেঘাটা নারকেলডাঙা মেন রোড, নাকি মানিকতলা মেন, নাকি উল্টোডাঙার এই মোড়টা থেকে। আমি ঠিক জানি না।"

# দ্বৈরথ

## এক / মহড়া

ধানু মণ্ডল প্রতিদিনের মত শিরীষ গাছটার নীচে এসে দাঁড়ায়। শিরীষটিকে একপাশে রেখে কিছুটা উন্মুক্ত পরিসর। একটা বড় গাব গাছ, জারুল, পাকুড় আর কিছু কাঠটগর নিয়ে ক্ষেত্রটি বৃত্তাকার। বর্ষার শেষে দুর্বার সতেজ বিস্তারে মাটি প্রায় দেখা যায় না। মাঝে মাঝে মোথা ঘাস, একটু জলা ঘাস, কিছু জংলা গাছ ইতস্তত। শেয়ালকাঁটা, কণ্টিকারি, ফণীমনসার ছোট ঝোপড়া একদিকে। পায়ের বুড়ো আঙুলে চাপ দিলে মাটিতে আঙুল ঢুকে যায়। হাঁটতে গেলেও সিকি আঙুল পরিমাণ মাটি বসে যায়। তবুও এই হরিৎক্ষেত্র মল্লভূমি নয়। পুরো বর্ষার জল খেয়ে একটু নরম—এই যা।

অনেক বছর আগে, কম করে এক কুড়ি বা তারও আগে এই ক্ষেত্রটি মল্লভূমি ছিল। সদ্‌গোপপাড়ার প্রায় মাঝামাঝি এই ক্ষেত্রটিও মল্লভূমি ছিল। উত্তরে কোনাকুনি কালাচাঁদের মন্দির। এখন জীর্ণদশা। আটচালা মন্দিরের শিখরদেশে বট, অশ্বত্থ—ঝুরি নামছে মন্দির ঘিরে। কালাচাঁদ আগেকার মত সেবা পান না। চালকলা-বাতাসা দিয়ে দিনে একটা নৈবেদ্য পড়ে। সন্ধ্যায় আরতিও হয়। কিন্তু ষোড়শ উপচারে ঢাক-ঢোল-সানাই-এর বাদ্যি দিয়ে কালাচাঁদের পুজো-আচ্চা দুবার। দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমীতে। পেতলের একটা কালাচাঁদ মূর্তি থাকলেও ওই দুটি দিন আলাদা করে রাধা-কৃষ্ণর মূর্তি তৈরি হয়। পেতলের মূর্তি স্নান করে। অঙ্গরাগ, অর্থাৎ ঘি, মধু, দুধ ইত্যাদি সহযোগে স্নান শেষে কালাচাঁদ পাটে বসেন। সদ্‌গোপপাড়া থেকে তো বটেই, বামুন, বায়েন-বাগদী সবাই আসে কালাচাঁদের চানজল নিতে।

ধানু শিরীষ গাছটির নীচে উত্তরমুখো দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে মন্দিরের উদ্দেশে দু'দণ্ড চোখ বুজে স্থির। চোখ বুজে দাঁড়ানো এখন ধানুর বড় সমস্যা। চোখ বুজলেই এখন আকাশ, গাছপালা, চরাচর অন্ধকার হয়ে দুলতে থাকে। দুলুনি ধানুকে মাটিতে পা রেখে দাঁড়াতে দেয় না।

সমস্ত শক্তি একজায়গায় করে দু'পায়ের পাতা মাটির গভীরে প্রাণপণ চেপে রেখেও ধানু টাল সামলাতে পারে না। বৃত্তাকার হরিৎক্ষেত্র, যা এখন আর মল্লভূমি নয়, ঘিরে অগণিত জনতা। আশেপাশের গ্রামের তাবত ছেলে ছোকরা, প্রৌঢ়-বৃদ্ধের ভিড় ভেঙে পড়েছে। সমস্বরে চীৎকার ওঠে "পটকান্ দাও, পটকান দাও।"

কালাচাঁদের মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে কুস্তি শুরু করাই রীতি। এমনকী পীর আলি, মতলেব শেখ—বদু মিঞার মত তল্লাট কাঁপানো মুসলমান কুস্তিগীররাও এই রীতি মানে। যে গ্রামের যা রীতি। কালাচাঁদের গ্রাম শ্রীপতিপুর, লোকমুখে ছিপতিপুর। এখানে কালাচাঁদের মহিমা ভিনদেশী কুস্তিগীররাই অস্বীকার করে না। আর ধানু তো গ্রামেরই ছেলে। স্থানীয় কুস্তিগীর। ধানু প্রতিদিনের মত শিরীষ গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে কালাচাঁদের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করে। তারপরই হরিৎ বৃত্তাকার ক্ষেত্র, যা এখন আর মল্লভূমি নয়, তার মাঝখানে লাফ দিয়ে পড়ে। 'জয় কালাচাঁদ' ধ্বনি ওঠে ধানুর বুকের মধ্য থেকে। ধানু লাফটির মুহূর্তে নিজের হাঁটু, পায়ের পাতার দিকে নজর রাখে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। ধানু ভারসাম্য হারিয়ে লাফ দেওয়ার জায়গাটা থেকে হাতখানেক দূরে ধপ্ করে চিৎপাত হয়ে পড়ে। সমস্বরে অদৃশ্য জনতা চীৎকার করে ওঠে, "পটকান্ দাও, পটকান দাও।"

ধানু নিস্সাড়ে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকে। তার অদৃশ্য প্রতিপক্ষের অবস্থান আন্দাজ করার চেষ্টা করে। পরবর্তী আক্রমণের জন্য ধানু সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায়। ধানুর কোমর ভাঙা; সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। দুহাতে শরীরের ভর দিয়ে, মাটিতে হাঁটু রেখে ধানু চতুষ্পদ হয়।

দুই / প্যাঁচ-পয়জার

এক কুড়ি বছর বা তারও আগে ধানু এমনিভাবেই পড়েছিল, মাটির ওপর। কুস্তির জন্য তৈরি ষোলো চাষে ভাঙা, তেল-ঘি খাওয়া মাটির ওপর ধানু পড়েছিল। দু-পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াতে পারেনি।

সেটাই শেষবার, তারপর ধানু আর আখড়ায় কুস্তিতে লড়েনি। বাজির লড়াই তো নয়ই। সেবার বাজি ছিল দুটো পেতলের ঘড়া। মাঝারি মাপের। ঘড়া ভর্তি কাঁচা টাকা। এক টাকার মুদ্রা।

ধানু চোখ বুজলেই দেখতে পায় মাটির তৈরি বেদির ওপর চালগুঁড়ো পিটুলি দিয়ে আলপনার লতাপাতার নকশা আঁকা। তার ওপর একটা মাঝারি মাপের কলসি। পশ্চিমের রোদ পড়ে পেতলের কলসি সোনার মত ঝক্ঝক্ করছে। কলসি উপচে কাঁচা টাকা, একশো, দুশো, পাঁচশো, হাজার। দু-চারটে কাঁচা টাকা সিঁদুর মাখানো, বেদির ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে। লোকে জানে সব টাকাই জনার্দন হালদারের সেরেস্তার টাকা।

নবান্নর উৎসব শেষ হয়েছে কদিন আগে। মাঘের শুরুতে অন্ধকার হওয়ার আগেই, বিকেলের বাতাসে হিমেল ছোঁয়া। মল্লভূমির চারধারে বৃত্তাকারে মানুষ আর মানুষ। আশপাশের দশবিশটা গ্রামের লোক তো আছেই, পনের বিশ

ক্রোশ দূর থেকে রামপুরহাট, মাড়গ্রাম, সুরিচুয়া এমনকি নলহাটি থেকেও লোক এসেছে।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের সে কুস্তির ঘোষণা ছিল সালার থেকে রামপুরহাট, সাঁইথিয়া থেকে বহরমপুর। ছিপতিপুরের বার্ষিক কুস্তির আসরে এবার একটু বাড়তি রোশনাই। জনার্দন হালদারের ছোট ভাই এসেছে বিলেত থেকে। ফসল কাটার মরশুম শুরু হওয়ার আগে থেকেই জনার্দন হালদারের সেরেস্তার লোকজন দিকে দিকে ছুটে গেছে। নামীদামী কুস্তিগীর, তালিকা এসেছে বিহারের বিভিন্ন জেলা থেকে। নাম এসেছে বর্ধমান, মালদহ আর বীরভূম জেলা থেকে, মুর্শিদাবাদের নিজস্ব লোকজন তো আছেই। আর এসব কিছুর গোড়ায় আছে জনার্দনের ছোট ভাই মধুসূদন হালদারের কাজ-কারবার। ছিপতিপুর তো বটেই, সাঁইথিয়া বহরমপুর বাসরুটের প্রতিটা বাসের গায়ে, কান্দি, গোকর্ণ, বহরমপুর বাসস্ট্যাণ্ডে পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। একসহস্র এক রৌপ্য মুদ্রা, জেলার ইতিহাসে সেরা কুস্তি। বেনারস আর ভাগলপুরের, হাজারিবাগ আর সমস্তিপুরের বাঘা বাঘা কুস্তিগীর লড়তে আসছে।

জনার্দনের ভাইয়ের তদারকিতে মল্লভূমির মাটি তৈরি হয়েছে। প্র্যাকটিস লড়াইতে ধানু মণ্ডল, নকুল বাগদী, পাশের গাঁয়ের ছিরু শেখ কদিন মাটি মেখে খুব দাপাদাপি করল। ষোলো-চাষে মুলো আর কুস্তির মাটি। মাটিতে তেল-ঘি-এর গন্ধ। প্রতিবেশী তিন কুস্তিগীরই বলেছিল "জনা হালদারের ভাই দেখ্‌খাল বটে। বাপের জন্মে কুস্তির এমন মাটি পাই নাই। ঘাড় মুট্‌কে মরি যদি, আপশোষ নাই।"

বেনারস, ভাগলপুর, হাজারিবাগ কিংবা সমস্তিপুরের কুস্তিগীররা অনেককাল আসে না এ তল্লাটে। হালফিল কুস্তির টাকার পরিমাণ কমে গেছে। তাছাড়া কুস্তিগীরদের সঙ্গে আসা দুচারজন সাগরেদ সহ রাহা-খরচ, খাই-খরচ যেভাবে বেড়ে গেছে, তাতে জনার্দন হালদার কুস্তির পাট তুলেই দেবে ভেবেছিল। নেহাত গ্রামরীতি, নবান্নর পর বাগদী, কৈবর্ত, সদ্‌গোপরা এখনও শখে লাঠি খেলে, আখড়ার মাটি গায়ে মাখে—তাই এখনও ব্যাপারটা উঠে যায়নি। কুস্তির আসরে লোকে কুস্তিগীরের নামে জয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনার্দন হালদারের নামেও জয় দেয়।

তাছাড়া নবান্নর পর গরীব-গুরবো চাষী-বাসীর ঘরেও যখন আনন্দের ধুম, পাঁচ মাইল দূরে "চিত্রবাণী" সিনেমায় গোরুর গাড়ি চেপে গৃহস্থের বৌ বাচ্চারা সিনেমা দেখতে যায়, তখন শ্রীপতিপুরের ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে কুস্তির আসর না বসালে জনা হালদারের মান থাকে না। তার পিতৃপুরুষের মুখে চুনকালি পড়ে। জনার্দন ওরফে জনা তেমন ইচ্ছে না থাকলেও, আসর বসায়।

আসলে ছিপতিপুরের কুস্তির ইতিহাস সাবেক কালের। জনা হালদারের পিতৃ-পিতামহও কুস্তির পেছনে টাকা খরচ করেছেন জলের মত। সে আমলেও কালাচাঁদের নামে পেতলের ঘড়া, টাকা—সোনার হার, আংটি কুস্তিগীরদের টেনে

আনত দূর-দূরান্ত থেকে। নেই নেই করে এখনো জনা হালদারের তিনশো বিঘে জমি আছে। ধানকল, পাটগুদাম আর ফুড করপোরেশনের আড়ত আছে কান্দি শহরে। কুস্তির আসর নিয়ে বিলাসিতা করার ক্ষমতা আছে জনা হালদারের। জনা হালদারের ভাই মধুসূদন হালদারের জন্যই এবার কুস্তির আসর অন্য মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে। ভিডিও ক্যামেরায় ছবি উঠবে দেশওয়ালি কুস্তির। মধু হালদার বলেছে এই ছবি বিলেতে যাবে! বিলেতি সাহেবরা দেশওয়ালি কুস্তি দেখে হয়ত ডাকবে ছিপতিপুরের ধানু মণ্ডলকে। পীর আলি কিংবা বদু মিঞা হয়ত কুস্তি লড়তে লাস-ভেগাসে কিংবা নিউইয়র্কে,—নয়ত লণ্ডনে যাবে।

মধু হালদার ছিপতিপুরের লোকদের মিটিং করে বলেছে, রানার্স আপ আর উইনার্সের লড়াই দেখানো হবে বিদেশী টেলিভিশনে। ভারতীয় কুস্তি পদ্ধতি, গোবরবাবু আর গামা পালোয়ানের কুস্তির পরম্পরা দেখবে বিলেতের সাহেব-সুবোরা। এর মধ্য থেকে উঠে আসবে প্যাটারসন, সনি লিস্টনের মত খ্যাতি অর্থ।

এহেন সময়ে চাষের শেষ অবস্থায় ধানে পোকা লাগল, ভাগের যে কটি ধান পাওয়া গেল, তা চাষ খরচে তিন সনের বাকি শুধতেই শেষ। তবু ধানুর আট-মাসের গর্ভবতী বউ পার্বতী বলল, "ওসব কথা তুমি ভেবোনি। যাও আখড়ায় যাও, লড়ো। তোমাকে লড়তে হবে।"

ধানুর এখন একটু বয়স হয়েছে। পাঁচ সাত বছর আগে যেভাবে বুকভরা দম নিতে পারত, তা পারে না। শুধু যুযুৎসু, গর্দান-তোড়, দু-প্যাঁচ কাঁচি কোমর জড়িয়ে অল্পস্বল্প রয়ে গেছে।

প্রায় ছ'ফুট উচ্চতার ধানু মণ্ডল মার-প্যাঁচগুলোর ওপরই ভরসা রাখে! আর ভরসা রাখে গ্রাম উন্নয়নের অনুদান আর ব্যাঙ্কের টাকায় কেনা তার জার্সি-গাই লালির ওপর!

লালি দিনে রাতে তিনবার দুধ দেয়। বেলডাঙা ডেয়ারীর জন্য ধানু পনের ষোলো লিটার দুধ বেচে দেয়। তাইতে ব্যাঙ্কের মাসিক সুদ মিটিয়ে, লালির খোরাকি-খরচা দিয়ে, কোনোমাসে কিছু টাকা থাকে, কোনোমাসে থাকে না। ধানুর তিন ছেলে, এক মেয়ে আর গর্ভবতী স্ত্রী পার্বতী। লালি সবার মুখেই ক' ফোঁটা করে দুধ তুলে দেয়। ধানুর দশাসই চেহারাটা এখনও যে টিঁকে আছে সেও লালির হাফ-লিটার দুধে। লালির স্নেহে, মমতায়।

ধানু পালোয়ান। নিয়মিত মাছ-মাংস-ডিমের যে খোরাক এই শরীরের জন্য, তাগদের জন্য দরকার, ধানু তা পায় না। তবুও বংশগতিতে পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকারে ধানু মন্ত্রপূত কিছু প্যাঁচ-পয়জার পেয়েছে। ছিপতিপুরের কুস্তির আসরে ধানু বহু মেডেল জিতেছে। রূপোর টাকা বোঝাই ঘড়া জিতেছে। ভিন জেলা থেকে কুস্তির আসরে কাপ পেয়েছে। ধানু দিগ্‌বিজয়ী হয়েছে।

এহেন ধানু মণ্ডল, আসর বসার পনেরদিন আগেই জনা হালদার আর তার সেরেস্তার ত্রিলোচন পুরকাইতের এক প্যাঁচেই কাত। এমন কাত যে, ধানু আর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারল না। ধানু চতুষ্পদ হয়ে গেল।

তিন / বুবুৎসু

ত্রিলোচন পুরকাইত মাথায় লম্বা ধানু মণ্ডলের মতই। সিরিঙ্গে ঝিঙের মত চেহারা, পাকানো। কোমরের কাছে একটু ন্যুব্জ। চিরকালই মুখে তিনদিনের বাসি দাড়িগোঁফ। দাড়িগোঁফ বাড়েও না, কমেও না। ছিপতিপুরের লোকে বলে 'অযাত্রা'। ত্রিলোচনের মুখ দেখলে যাত্রা নাস্তি। বাড়ি ফিরে দুদণ্ড বসে থেকে তারপর শুভকাজে যাওয়া।

লালির স্নেহ-মমতায়, তার বিশ লিটার দুধে, মরা ধানক্ষেতেও ধানু ছিল বেপরোয়া। ধান যেটুকু কাটা হয়েছে তাই দিয়ে জনা হালদারের বকেয়া তিন সনের সুদ চুকিয়েছে ধানু। একটা গোটা মাসের খোরাকিও ঘরে ওঠেনি বলে হতাশ হয়নি, ভেঙে পড়েনি। ভেবেছে লালি তো আছে, বিশ লিটার দুধ আছে। বেঁচে থাকার এত কৌশল, এত প্যাঁচ যে ছিল ধানু লালিকে না পেলে বুঝত না। লালির গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে, নিজে হাতে তাকে খড়, খোল, ভুষি, চিটেগুড়ের জাবনা দিয়ে, জয় কালাচাঁদ বলে তখন ধানু সদর দরজা খুলে বেরতে যাবে। কুস্তির আসর বসতে আর দিন পনের বাকি। ধানু ভোররাতে উঠে একশো ডন দেয়, দুশো বৈঠক দেয়। পাঁচ সের সাইজের দু-দুটো পেল্লাই মুগুর ভাঁজে। তরপর শরীরের সমস্ত পেশী যখন টগবগ করে ফুটতে থাকে, ধানু তখন সেই মল্লভূমির দিকে 'জয় কালাচাঁদ' বলে যাত্রা শুরু করে। সূর্য ওঠার পরও ঘণ্টা-খানেক মহড়া চলে।

'জয় কালাচাঁদ' বলে মন্দিরমুখো একটা প্রণাম ঠুকে সদরের আগল খুলতেই সামনে অযাত্রা। জনা হালদারের সেরেস্তার ত্রিলোচন পুরকাইত। বলল "সাত সকালেই এসে পড়লুম র‍্যা ধনা। কোথা যাচ্ছিস, আখড়ায়! তা বেশ, তা বেশ পালোয়ান তো বটে।"

ত্রিলোচনকে দেখেই ধানু দাওয়ার দিকে মুখ করে পিছু হাঁটা দেয়। ধানু মনে মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা করলেও মুখে কিছু বলে না। ধানুর তিন ছেলে এধার, ওধার। পার্বতী দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। উঠোনে ঝাঁট পড়বে বলে ঝাঁটাগাছটি হাতে নিয়ে ধানুর মেয়ে উঠোনের মাঝখানে।

ত্রিলোচন, সিড়িঙ্গে ত্রিলোচন একবার সবটাই চোখ বুলিয়ে দেখল। তারপর সদর দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, "আয়রে ছামছুন্দি, ভিতরে আয়।

ত্রিলোচন সোজাসুজি গোয়ালঘরের দিকে। লালি তখন সকালের জাবনায় নিবিষ্ট। একমাসের বাছুরটা ছুটে বেরুল গোয়াল থেকে। উঠোনময় নেচে বেড়াল খানিকটা, তারপর ছামছুন্দি আর তার সঙ্গের দুই সাগরেদকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

লালির হাম্বারব খুব কমই শোনা যায়। এখন কী একটা ঘটতে যাচ্ছে, জন্তুরা নাকি আগে বোঝে সব, লালি হাম্বা শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। ত্রিলোচন ছামছুন্দি আর তার সাগরেদ গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ত্রিলোচনরা লালিকে নিয়ে যেতে এসেছে। ধানুর কাছে মতলব পরিষ্কার।

ধানু চিৎকার করে উঠল, "তিরলোচন সাত সকালে গেরস্ত বাড়িতে এটা কী

হচ্ছে ? আমার গাইয়ের গায়ে হাত দিলে খুনোখুনি হয়ে যাবেক বটে।"

ছামছুদ্দি জনা হালদারের বেতনভুক পাইক। এককালে লেঠেল বলে নাম-ডাক ছিল। ছমাস-একবছরের মেয়াদে দু-চারবার জেলও ঘুরে এসেছে। গোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে সাগরেদকে বলল, "দড়া খোল্, বাকিটো আমি দেখছি।"

ত্রিলোচন হাতে একটা পরচা মত এনেছিল। ধানুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "মাথা গরম করিসনা ধানু, ভিটেমাটি সব জমা। তোর গাইটো বাবু জমা নিলেন।"

—"জমা নিলেন মানে ? গরমেন্টের আর ব্যাংকের টাকায় গাই! হালদার-বাবুর কাছ থিকা তো গোরু বাবদ ট্যাকা নিই নাই।"

—"গোরুর ট্যাকা নাই বা হল। চাষের ট্যাকা, সেটা কোথায় যাবে রে ধানু ?" ত্রিলোচন বলল, "তিনসন সুদে দিইছিস, আসল তো একসনও দিস নাই রে ধানু।"

ছামছুদ্দি লালির গলায় হাত বুলিয়ে আদর করছে।

—"ধানু গাই বটে তোর এইটা। তিরলোচন বাবু নে যাই থালে ?"

ধানু মণ্ডল একটু আগেই ভেতরে ভেতরে পাঁয়তারা কষছিল। কোমরের কষি শক্ত করে এঁটে মল্লভূমিতে বৃত্তাকারে পাক খাচ্ছিল।

ত্রিলোচন তখন বলছিল, "ওই একসনের, নয়ত বাপু তুই দু-সনই ধর, লালি-টোকে জমা রাখতে বলেছে বাবু। নে, জমার কাগজটো নে।"

বৃত্তাকার পাক শেষে, ধানু মণ্ডল দুটো লাফ দিয়ে উঠোনের মাঝখানে। ছামছুদ্দি গতিক দেখে গোরুর দড়ি ছেড়ে হাতে লাঠি বাগিয়ে। ত্রিলোচন, আহাহা করকি করকি ? সাতসকালে একটা খুনোখুনি কাণ্ড না বাধবে ছাইড়বে না দেখহ, ভঙ্গিমায় ছামছুদ্দির সাগরেদকে বলল, "হাঁ করে দাঁড়ায় দেখছডা কি সালো। গোরুটাক লিয়ে যেতে পারছ না ?"

ছামছুদ্দি আর ধানু মুখোমুখি। দড়িছাড়া লালি এখন হাম্বারব প্রবলতর করে তোলে। একমাসের বকনা বাছুরটা লাফ দিয়ে পড়িমরি সদর দরজা পার হয়ে যায়। সদর দরজার পাশে রাঙচিতার বেড়া ভেঙে দড়িছাড়া লালি ছুটতে থাকে। দড়া ধরতে গিয়ে, ধানুর বউ-এর লালি লালি আর্তস্বর মাঝপথে রুদ্ধ হয়ে যায়। পূর্ণগর্ভা পার্বতী উঠোনের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে। ধানুর ছোট মেয়ে বাতাসী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তিনছেলে সমস্বরে লোক ডাকে, "ওগো কে কুথায় আছ গো, বাপকে মেরে ফেলল।"

চিৎকার শুনে রে রে করে সাতসকালে প্রতিবেশীরা জমায়েত হওয়ার আগেই নিপুণ লেঠেল ছামছুদ্দি তার কাজ সেরে দিয়েছে। আসলে ধানুর উঠোন খানিকক্ষণ মল্লভূমিতে পরিণত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এখানে লড়াইয়ের—কুস্তি বা লাঠিখেলার কোনো নিয়মই মানা হয়নি। তাছাড়া লড়াইটি অসমও ছিল।

ধানু তার পাঁয়তারা অংশে দাবনায় চাপড় মারার আগেই ছামছুদ্দির সাগরেদ

ধানুরই পাঁচসের ওজনের মুগুরটি মাথা লক্ষ করে হাঁকড়ে দিয়েছিল। মুগুরের আঘাত, সাগরেদটি খর্বকায় বলেই মাথার উচ্চতা পায়নি। ঘাড়ের সন্ধিস্থল পেয়েছিল। তাই বা কম কী। শরীরের সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্রের জটে মুগুরের ওই ঘা। প্রাণপণ চেষ্টায় উদ্যত লাঠির সামনে, ধানুও বাঘা কুস্তিগীর, দেড়পাক মেরে সে ছামছন্দিকে পেড়ে ফেলেছিল। মোক্ষম যুযুৎসু। শুধু এই চারদিকে ভোরবেলাতেই ঝুঁঝকো অন্ধকার ঘনিয়ে আসা, চোখের সামনে অজস্র তারার নেভা-জ্বলা, হাত পা ক্রমে নেতিয়ে আসা। না হলে ওই যুযুৎসুতে ছামছন্দি তো কোন ছার, তার বাবাও শূন্যে তিনহাত গিয়ে ঘাড় গুঁজরে দশহাত দূরে ছিটকে পড়ত। আর উঠত না।

ছামছন্দির লাঠি আর তার সাগরেদের মুগুর অতঃপর ধানুর শিরদাঁড়ার ওপর ভাঙে। ধানু পালোয়ান চুরচুর হয়ে যায়। ধানু যে আর কখনও দুপায়ে দাঁড়াতে পারবে না, এটা বোঝা যায়।

চার / পাঁয়তারা

ছিপতিপুর থেকে বিশ ক্রোশ দূরে ধানু পালোয়ান দেড় মাস বুকে পিঠে প্লাস্টার-ব্যাণ্ডেজ নিয়ে শুয়ে থাকে। ধানু যে মরেনি, ডাক্তাররা বলেছে, সে ধানু বলেই। ধানু সুস্থ হবে, বেঁচেও থাকবে, এ আশ্বাস ডাক্তাররা দিয়েছে। তবে লড়াই মানে কুস্তি কতটা পারবে, তা তাঁরা বলেননি। তাঁরাও জানতেন, ধানু আর দুপায়ে দাঁড়াবে না।

তবু ছিপতিপুরের জনগণের দাবিতে, ধানু মণ্ডল যেহেতু লোকাল কুস্তিগীর, লড়াই-এর দিন পিছিয়েছে। যা ডামাডোলটা গেল ছিপতিপুরের ওপর দিয়ে, তাতে জনার্দন হালদারও দিন পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। অরেকটু থিতিয়ে যাক। কারণ সদ্গোপপাড়ার দু-চার জন জনার্দন হালদারের পা চাটা হলেও ধানুরও সাগরেদ আছে। সদ্গোপপাড়ায় সাপোর্ট আছে। ভাই মধু হালদারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে, ধানুর গাঁয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত দিন পিছনো হয়।

ধানুর সেই জারসি গাই লালি এখন জনা হালদারের গোয়ালে কারণ গ্রামস্থ মাতব্বররাও রায় দিয়েছেন লালির দুধেই, বিশ লিটার দুধেই ধানুর দেনা শোধ হবে। চাষের জন্য আসলের সাড়ে তিনহাজার ধানু তো শুধতে পারেনি। দু'একজন বয়োবৃদ্ধ এও বলেছেন, বড় কোমলভাবে, "আহা, গোরুটো ধানুর গত-জন্মের ছেলে ছিল। এখন বাপের ঋণ শুধতে এয়েছে।"

যারা ধানুর হাঁড়ির খবর রাখে তারা জানে ধানুর প্রথম সন্তান পার্বতীর পেটেই মরে হেজে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়বার আরেকটি মৃত সন্তান প্রসব করে পার্বতী সেদিনের পর ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে। ধানু মণ্ডলের বড় ছেলে, গোষ্ঠকে বাগালের কাজ দিয়েছে জনার্দন হালদার। সে এখন লালিরই দেখাশোনা করে।

গ্রামস্থ সকলেই জানে ধানুর জার্সি গাই গ্রামোন্নয়নের অনুদানে, ব্যাংকের

ঋণে। কিন্তু ব্যাঙ্ক তো আর মহাজন নয়। ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কই। আর সরকার তো টাকা দানেই দিয়েছে। তা নিয়ে আর হুজ্জোত কি? ফলে দু-একজন সালিশী সভায় যে বলেছিল সরকারি গাই—ধানুর লালি, জনা হালদার নিতে পারে না, সে যুক্তি নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চায়েত প্রধান মাধব দাসও বলেছিল, তার বলা তো যা-তা নয়—পার্টির লোক, "তাছাড়া গোরুটার দেখভাল করবে কে? দিন গেলে জার্সি গাইয়ের খোরাকি কুড়ি টাকা। দেবে কে? তার চেয়ে এই ভালো। জার্সি সাহেবদের গোরু হলেও মা ভগবতী তো বটে! জনা হালদারের গোয়ালে সে সুখে থাকবে।" সবাই এই সালিশী মেনে নিয়েছিল। একদিকে জনা হালদারের গোয়ালে সরকারি গাই লালি তার মনপছন্দের জাবনা পাবে, অন্যদিকে ধানু মণ্ডলের তিন বছরের বকেয়া আসল তার বিশ লিটার দুধে শোধ হবে। আর ধানুর বড় ছেলে দশবছরের রোগাপটকা গোষ্ঠ রোজকার খোরাকি দুটো করে টাকা, আধ কিলো চাল পাবে।

সালিশী সভা একমত হলে ছিপতিপুর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বড়োঞা থানায় ধানু-সম্পর্কিত দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে যে কেসু ছিল, কেসটি মিটত না। ধানু সদর হাসপাতালে গিয়েই যত বিপাক, এনকোয়ারি বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। এবার শুধু জনা হালদার আর ধানু মণ্ডলের সইসাবুদ নিয়ে একটা মিউচুয়ালু করে গ্রামস্থ সালিশদের সাক্ষ্য নিয়ে একটা কাগজ তৈরি হলেই সব শেষ।

ছিপতিপুরের লোকজন, বিশেষ সদ্‌গোপপাড়া ধানু মণ্ডলের ফিরে আসার দিনের জন্য অপেক্ষা করে।

জেলার ইতিহাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর কুস্তিলড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করে।

## পাঁচ / একটা মোক্ষম কাঁচি

শিরদাঁড়ার সোজা লাইনে তিন তিনটে ফাটল। মুগুরের ধাক্কায় দু-দুটো কশেরুকার স্থানচ্যুতি—চুরচুর ভেঙে যাওয়া। শুধু ঘুমের ওষুধ সূঁচে ফুঁড়ে দেওয়া, শিরায় শিরায় ঘুম ছড়িয়ে দেওয়া। মাথার দিক ঘাড়ের কাছ থেকে তিন চারটে বালিশ দিয়ে উঁচু করা। নেতানো ঘাড়ের ওপর কুকুরের বকলসের মত আলাদা ব্যাণ্ডেজ। দুপা খাটের একপ্রান্তে যন্ত্রপাতি দিয়ে শূন্যে ঝোলানো। এ-ভাবেই ধানু রয়ে গেল প্রায় একটা মাস পুরো। ডাক্তাররা বলেছে, "ধানু এযাত্রা বেঁচে গেল নিতান্ত সে ধানু বলেই।"

এরই মধ্যে একদিন ধানুর পা দুটো পাছা আর মেরুদণ্ডের সমান লাইনে বিছানায় রাখা হল। ধানুর পিঠের নিচে একমাস শুয়ে থাকার ঘা। তবু পা দুটিকে একই সমতলে, বিছানায় ফিরে পেয়ে ধানুর আনন্দ হয়।

পিঠের নিচে একমাসের পুরনো ঘা, নাট-বল্টু-জোড়া মেরুদণ্ড নিয়েও ধানু তার পা দুটিকে খেলতে দেয়। পালোয়ানের পা বড় সাংঘাতিক জিনিস। ধানু মণ্ডলের গুরু বিহারী পালোয়ান শিউলাল যাদব বলেছিল, "বেটা, ওহু পাও হী সবকুছ হ্যায়।"

পায়ের ওপর ভারসাম্য রাখো। শরীর বাঁয়ে দোলাও, ডাইনে দোলাও। মাটিতে পড়ে যাচ্ছ? আলগা পা দুটো শূন্যে তোলো। মারো মোক্ষম কাঁচি। প্রতিপক্ষের হাঁটুতে, কোমরে, পারলে হাতের ওপর ভর রেখে গলায়। তারপর পটকান দাও। হাঁটু খুলে যাবে, কোমরের নিচ থেকে আলগা হয়ে যাবে, গর্দান ঘুণো বাঁশের মত মট করে মটকে যাবে।

ধানু বিছানায় নাট-বল্টু আঁটা মেরুদণ্ডে ভর রেখে কাঁচি মারে, মোক্ষম কাঁচি। জনা হালদার থেকে শুরু করে তিরলোচন পুরকাইত বা ছামছুদ্দির গর্দান কল্পনা করে, ঝুরো বাঁশের ভেঙে পড়ার, মট করে মটকে যাবার শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ধানুর শিরদাঁড়া জোড়া দেওয়া নাট-বল্টুতে মড়মড় করে শব্দ হয়।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ধানু মাঝে মাঝে ছিপতিপুরের খবর পায়। ঘুমের ইনজেকশানের জন্য ঘোরে থাকলেও ছিপতিপুরের জলহাওয়া, পরিবেশ-মানুষজন, কথাবার্তা, ঘটনা, রটনা ধানু মণ্ডলের আসংজ্ঞানে ধাক্কা মারে।

রাত্রে সে কোনো কোনোদিন পার্বতীর জন্য, তার হতভাগ্য মৃত, যে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীর আলো দেখতে পেল না, সন্তানের জন্য ককিয়ে ওঠে। কখনও আধো জাগরণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধানু "লালি, লালি রে!"

হাসপাতালের একমাসে ধানুরও বিশ্বাস লালি তার প্রথম সন্তান। প্রথমটি তো কন্যাসন্তানই ছিল বটে। লালি বাঁধা আছে জনা হালদারের গোয়ালে। লালি বাঁধা থেকে রক্ত দিয়ে ধানুর ঋণ শোধ করছে। ধানু ছিপতিপুরের কেউ এলে বলে, "রক্ত থেকেই তো দুধ—নাকি বলো!"

এক একদিন দশ বছরের গোষ্ঠটার জন্য বুকের ভেতর হাঁচারিপিচারি শুরু হয়ে যায়। দম নিতে কষ্ট হয়। ডাক্তাররা আবার ঘুমের ইনজেকশন দেয়। ধানু মণ্ডলের সদ্‌গোপবংশে কেউ কখনও মুনিষ-বাগালের কাজ করেনি। বংশের পিলসুজের প্রদীপ—গোষ্ঠ, গোষ্ঠ রে! ধানু ঘুমের মধ্যেও ফুঁপিয়ে কাঁদে। আর এমত অবস্থার মধ্যে ধানু লড়াইয়ের মহড়া দেয়। কুস্তির সরল জটিল মারপ্যাঁচগুলি মনে রাখার চেষ্টা করে।

শিউলাল বলেছিল, "পহেলে গর্দান পর ধাব্বা মারো। আন্দাজা লাগাও, সমঝো।"

প্রতিপক্ষকে এঁচে নাও। ধানু শুয়ে শুয়েই প্রতিপক্ষের শক্তি, তার গর্দানের জোর বোঝার চেষ্টা করে। প্রবল, প্রবলতর প্রতিপক্ষ। ছামছুদ্দি বা তার সাগরেদ কোনো ব্যাপারই নয়। ধানু মণ্ডল ভাঙা শিরদাঁড়া নিয়েই তাদের অনায়াসে একটি মোক্ষম কাঁচি মারতে পারে। ত্রিলোচনের হিলহিলে চেহারা দাবনায় ফেলে মটকে দিতে পারে দু-টুকরো করে। কিন্তু তারও পেছনে জনার্দন হালদার। তার হাতে জমির বিক্রি কোবলা, ঋণপত্র, দানপত্র। তার গোয়ালে লালি বাঁধা, জনার পেছনে উকিল-মুহুরি, কোর্ট-কাছারি। তার সঙ্গে পঞ্চায়েতের নেতা, বরোঞ্চা থানার মেজবাবু।

ধানু শুয়ে থেকে মহড়া দেয় আর মহড়া দেয়।

এরই মধ্যে সদ্‌গোপপাড়ার কার্তিক মণ্ডল এসেছিল। ছোটবেলার বন্ধু, তার দূরসম্পর্কের পিসতুতো ভাই। ধানু মণ্ডলের জব্বর সাপোর্টার। ধানুর লড়াই থাকলে চেঁচিয়ে মাঠ ফাটায়।

কার্তিক বলল, "পালোয়ান, তুর জন্য লড়াই পিছাল বটে। লোক বুইলছে, ধানু নাই, তো লড়াই নাই।"

বুভুক্ষু মানুষের মত ধানু কার্তিকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এতদূরে সদর হাসপাতালে বড় একটা কেউ আসে না। নেহাত সদরে কিছু কাজ থাকলে, ফেরবার বাস ধরার তাড়া না থাকলে একবার উঁকি দিয়ে যায়। তবু ধানু মণ্ডল তাতেই ছিপাতিপুরের মাটির গন্ধ, আলো-বাতাস পেয়ে যায়।

কার্তিক ধানুকে পার্বতীর খবর দেয়। তিরলোচন পার্বতীকে জনার্দন হালদারের ধানকলে কাজ দিয়েছে। দিনমান ধান সেদ্ধ করে সন্ধেয় তিরলোচনের জন্য রান্নাবান্না করে, তাকে খাইয়ে দাইয়ে ভাত নিয়ে পার্বতী বাড়ি ফেরে। গোষ্ঠ খোরাকি পায়। বাকি তিনটে পার্বতীর পথ চেয়ে অপেক্ষা করে।

ধানুর মেরুদণ্ডের কলকবজা নাড়া খায়। অক্ষম মেরুদণ্ডে ভর রেখে ধানু সোজা হওয়ার চেষ্টা করে। সদ্‌গোপ পরিবারে কেউ কখনও ধানকলে ধান সেদ্ধ করতে যায়নি। ধানুর পা দুটো কাঁপতে থাকে, তিরলোচনের কণ্ঠনালী বেষ্টন করে সে পা তুলে কাঁচি মারে।

অবশেষ ঝাড়া আড়াই মাস পরে ধানু ছিপাতিপুরে ফেরে।

ফেরার পথে পথে নতুনভাবে পোস্টার পড়েছে, দ্যাখে। বাসে ড্রাইভারের পাশেই ধানুর বসা বা আধশোয়া থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দু-তিন আঁটি বিচালি, ছেঁড়া চটে মুড়ে পিঠের দিকে তাকিয়া করে দেওয়া হয়েছে। শিরদাঁড়াতে নাট-বল্টুগুলো খুলে দিলেও এখনও শক্ত ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত। বাসের ঝাঁকুনিতে দুর্বল অস্থিসন্ধিগুলো আবার যাতে আলগা না হয়ে যায়, সেজন্য ড্রাইভার কনডাকটারও সতর্ক। ধানু মণ্ডল নামী পালোয়ন, জেলার বলতে কী সেরা প্যালোয়ান। বিচালির গদিতে শুয়ে কার্তিক মণ্ডলের গো-গাড়িতে শেষ দুক্রোশ মেঠোপথ পেরিয়ে ধানু ঘরে ফেরে।

শূন্য গোয়ালে লালি নেই। শূন্য ঘরে পার্বতী নেই। পার্বতী ধানকলে ধান সেদ্ধ করে। তিরলোচনের ঘরকন্না সামলায়। তিরলোচনের তিনকুলে কেউ নেই। কিন্তু ঘর সামলাবার মেয়েছেলে সে ঠিক জুটিয়ে নেয়। ধান ওঠার মরশুমে মাঝি-মেঝেনদের একটা ছোট দল আসে ধানকলে। তিরলোচনের জুটে যায় কেউ না কেউ। এ বছর পার্বতী জুটেছে। ফি সন যেমন রকমারি ধান— কখনও রত্না, কখনও আই. আর. এইট সীতাসাল বা চামরমণি, তিরলোচনের তেমনি ঘর সামলাবার নতুন নতুন মেয়েছেলে।

পার্বতীর ছিরি বদলেছে। দুটো মরা সন্তানের হিসেবে ছয় ছেলের মা। তবুও যৌবনে সেই ভাটা লাগেনি পার্বতীর। বরং এই তিনমাসের ধানকলে, ধানের

গন্ধে, আঁচে ত্রিলোচনের এ'টোকাটায় একটা জোয়ারের চোরাস্রোত লেগেছে কোথাও। গা-গতরে সেই স্বাস্থ্যের চিকনাই, শরীর কেমন ভরাভরা, চামড়ায় পাকা ধানের রূপটান। এমনকী পার্বতীর দুচোখেও অন্য এক ঝিলিক। কাজলে না কি ধানুর দৃষ্টিবিভ্রমে?

বড় ছেলে গোষ্ঠ এখন কোনো দিন বাড়ি ফেরে, কোনোদিন ফেরে না—জনা হালদারের গোয়ালেই পড়ে থাকে।

ঘরে তিন কাচকাচা ঘর সামলায়। পুকুর থেকে জল আনে, কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে। রান্না করে। সারা শরীরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ধানু পালোয়ানকে ভাত বেড়ে দেয়। শূন্য ঘরে তিন কাচকাঁচার কলকলানিতে ধানু আপ্লুত হয়। রক্তের মধ্যে বেঁচে থাকার অন্য এক সঙ্গীত শোনে। ধানু এখনও বিশ্বাস করে কোমর সোজা করে আবার সে উঠে দাঁড়াবে। বৃত্তাকার মল্লভূমিতে পাকসাট খাবে আর দাবনায় পৌরুষের অহংকারে ঘনঘন চাপড় মারবে। দুর্মর শক্তির আস্ফালনে চিৎকার করবে "আ যা বাচ্চা, আ যা!"

কিন্তু এসব সময়ে ধানু কেমন বোঝে অতর্কিতে দুটো অদৃশ্য পায়ের কাঁচি-প্যাঁচের চাপ তার দুর্বল জোড়াতাড়া দেওয়া ঘাড়ে শক্ত হয়ে বসছে। অনেক কসরত; অনেক প্যাঁচ কাটানোর ক্ষিপ্র কৌশলেও গলায় শক্ত হয়ে বসা কাঁচির চাপ কমাতে পারে না।

ধানু স্বগত বলে, "শালোরা মোক্ষম কাঁচি মেরেছে হে।"

ছয় / পটকান

ধানু তার অভ্যাসমত শিরীষ গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে উত্তরমুখো কালাচাঁদের মন্দির। পশ্চিমদিকে একটা পেল্লাই সামিয়ানার নিচে জনার্দন হালদার, ত্রিলোচন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গো। ধানু আড়চোখে দ্যাখে।

একটা বড় গাবগাছ, জারুল, পাকুড় আর কটা টগর গাছে ঘেরা সামনের বৃত্তাকার ক্ষেত্রই মল্লভূমি। ধানু একটা চারপায়ার ওপর অলস ভঙ্গিতে বসে থাকে, সোজা হয়ে নয়, কোমর ভেঙে কিছুটা কাত হয়ে। এখন ব্যাণ্ডেজ-প্লাস্টার, কিছুটা আলগা হলেও ধরে রেখেছে ধানুর ঘাড়, মাথা, শিরদাঁড়া যার যার জায়গামত। ধানুকে ঘিরে একটা ছোটোখাটো ভীড়। কোলের কাছে তিন কাচকাঁচা।

লাউডস্পীকারে হিন্দী গান চলছিল। কোমর দুলিয়ে মল্লভূমির তেল-ঘি খাওয়া ঝুরো মাটির ওপর ক'জন নাচছিল। একজন রেশমী ফিতের ব্যাজ বুকে আঁটা ভলান্টিয়ার দ্রুত ছুটে গেল লাঠি হাতে। চারদিকেই উৎসবের মেজাজ। লাল নীল কাগজ কেটে অজস্র ছোট ছোট পতাকার সারি। সাটিনের কাপড়ের ওপর বড় বড় কাগজ কেটে জেলার ইতিহাসে সেরা কুস্তির ঘোষণা। মাথার ওপর সূর্য। ফাল্গুনের শেষে মাঝে মাঝে গরম বাতাসের হলকায় ধুলো উড়ছে। বৃত্তাকার মল্লভূমি ঘিরে ছোট ছোট ছাউনি—হাজারিবাগ আর সমস্তিপুর, দ্বারভাঙা আর ভাগলপুরের কুস্তিগীররা এসেছে। বর্ধমান বীরভূমেরর ক'জন এসেছে। সাকুল্যে ষোলো জন মল্ল ফাইনাল রাউণ্ডে লড়বে। দেশজ নিয়ম অনুযায়ী

তেমন বাঁধাধরা আইন নেই কুস্তির। সবকটি লড়াই বাজির লড়াই। সকলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে জিতবে, সেই সেরা পালোয়ান। মাটির তৈরি বেদিতে চাঁদমালা আর ফুলে সাজানো পেতলের দুটো কলসী রাখা আছে। কাঁচা এক টাকার মুদ্রা উপচে পড়ছে কলসী থেকে। ধানু ঘড়াটির দিকে তাকিয়ে দেখে।

এইসময়ই পশ্চিম প্রান্তে জনা হালদারদের ক্যাম্পের পিছন দিকে হৈ-হৈ। ছোট ছেলেমেয়েদের একটা দল ছুটে গেল সেদিকে। ধানু সোজা হতে পারে না। তবু খাটিয়ার পায়ায় ভর দিয়ে একটু উঁকিঝুঁকি দেওয়ার চেষ্টা করল। কোলের কাছ থেকে তিন কাচকাঁচা কখন যেন ওদিকে ছুটে গিয়েছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল। মাইকে আবার হিন্দী গান শুরু হয়েছে। ওদের কথা ভালো শোনা যাচ্ছে না।

ধানু বলল, "কে, কে এসেছে।"

ওরা বলল, "লালি, লালি এসেছে বাবা"।

ধানু সমস্ত শক্তি একজায়গায় করে নিজেকে খাড়া করার চেষ্টা করে। হাত তুলতে পারে না, শুধু মাথা নিচু করে "শক্তি দাও, শক্তি দাও কালাচাঁদ"—বিড়বিড় করে।

সহসা মাইকে হিন্দী গানের দাপাদাপি থেমে গেল। ফাল্গুনের শেষে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস, থেমে গেল। যেন এক দমবন্ধকরা ঘোষণার জন্য। মাথা উঁচু করার জন্য ঘাড় পেঁচানো অদৃশ্য দু-পায়ের কাঁচিপ্যাঁচ থেকে ধানু নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

বৃত্তাকার জমির ওপারে ধানু দেখে লালিকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে আসছে ছামছুদ্দি আর তার সেই সাগরেদ। তাদের পিছনে একটা ছোট ভিড়। লালির পাশে বাছুরটা—জার্সি'র বাচ্চা তিনমাসে জনা হালদারের গোয়ালে বেশ বড়সড়ই হয়েছে। লালির মতই লালচে কালোয় মেশানো রঙ। ছামছুদ্দি শিরীষ গাছটায়, যেখানে ধানুর খাটিয়া ছিল, প্রায় ধানুর গায়ের ওপরই লালির খুঁটোর দড়িটা পেঁচিয়ে বেঁধে দিল। বকনা বাছুরটা ছাড়াই রইল।

হাত বাড়িয়ে লালিকে একটু ছুঁতে ইচ্ছে করছিল ধানু মণ্ডলের। লালি বিশ লিটার দুধে ধানুর বকেয়া শুধছে। প্রথম মৃত সন্তানের কথা মনে পড়ে ধানুর। একটু বিমনা ধানু হাত বাড়াতে পারে না, গলায় কথা জড়িয়ে যায়, "ভালো আছিস তো লালি, ভালো আছিস তো ?"

লাউডস্পীকারে এ সময়ই একটি বিশেষ ঘোষণা, একটি বিশেষ ঘোষণা। না দেখতে পেলেও ধানু মণ্ডল বুঝল, এ মধু হালদারের গলা। মধু হালদার ভিডিও ক্যামেরায় দিশি কুস্তির ছবি তুলবে। বিলেতের টি. ভিতে সেই ছবি দেখানো হবে। মধু হালদার চিৎকার করে উঠল 'ভাইসব'—

ধানু মণ্ডল ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল। তার মেরুদণ্ড সোজা রাখার নাট-বল্টু, গলার বকলস ঠকঠক শব্দে নড়ে উঠল মধু হালদারের ঘোষণায়। বাজির লড়াই-এর বাইরে বাজির লড়াই। কেবলমাত্র জেলার বিখ্যাত পালোয়ান ধানু, ওরফে ধনেশ্বর মণ্ডল, পিতা জপা, ওরফে ঈশ্বর জপেশ্বর মণ্ডলের জন্য।

লালি আর তার তিনমাসের বাছুরের জন্য এই বাজি। ধানুর সাড়ে তিন-হাজার টাকা কর্জের জন্য সরকারি অনুদান আর গ্রাম উন্নয়নে ব্যাঙ্কে ঋণে পাওয়া তিন বছরের জার্সি গাই লালি বাঁধা দেওয়া আছে মাননীয় জনার্দন হালদারের কাছে। ধনেশ্বর মণ্ডল নামী পালোয়ান, কর্তৃপক্ষ তাকে একটা সুযোগ দিতে চায়। ধনেশ্বরের জন্যই লড়াই-এর দিন পিছনো হয়েছে। বন্ধুগণ আমরা জানি ধনেশ্বর গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল। তবু পালোয়ান বলে কথা—জেলার সেরা পালোয়ান। গ্রামের লোকজন, পঞ্চায়েত, মাননীয় জনার্দন মণ্ডল ধনেশ্বরকে একটা সুযোগ দিতে চায়। ধনেশ্বর সমবেত পালোয়ানদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে বেছে নিক। যদি তাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাটিতে চিত করতে পারে, তিন বছরের জার্সি গাই আর বাছুর ধনেশ্বরের। আর তা যদি না হয় তাহলে জমা হিসেবে, বন্ধক হিসেবে ও গাই-বাছুর মাননীয় জনার্দনের গোয়ালেই থাকবে।

ধানু মণ্ডল খাটিয়া থেকে ছিটকে উঠল। তার চোখে ফাল্গুন শেষের মাথার ওপরের গনগনে সূর্যের আগুনের হাল্কা। নিশ্বাসের তাপে তেল-ঘি খাওয়া সামনের মল্লভূমির ঝুরো মাটি তপ্ত হয়ে উড়তে লাগল। এখন ভয়ঙ্কর দ্বৈরথে আহ্বান জানিয়ে ধানু মণ্ডল উরুতে চাপড় মারল। "আও, আও মেরে লাল, মেরে বাচ্চা—মাইকি লাল—"

ধানু একটানে বুকে-পিঠে জড়ানো বেল্ট টেনে ছিঁড়ে ফেলল। গলার কণ্ঠনালী ঘেরা বকলস্ হেঁচকা টানে খুলে ফেলল। জনতা সমস্বরে হৈ দিল। ধানু মালকোঁচা মেরেই মল্লভূমিতে এসেছিল। ধানুর জান্তব চিৎকারে, উরুর আস্ফালনে মল্লভূমির পরিবেশ স্তব্ধ, শুধু সমবেত মানুষের একটা হৃৎস্পন্দন ধুকধুক ধুক ধুক কান পাতলে শোনা যাবে।

ধানু মল্লভূমি ঘিরে একটা পাক দিল। তার হুংকার দূরে দূরান্তরে হাজারিবাগ-সমস্তিপুরে—দ্বারভাঙা ভাগলপুরে পেঁছিল। ধানুর শরীর ঈষৎ টলছিল। তিনমাস পরে সোজা হয়ে দু'পায়ে দাঁড়াবার দুঃসাধ্য প্রয়াস ধানুকে ফাটিয়ে ফেলছিল ভেতর থেকে।

সমস্তিপুরের ছাউনি থেকে বছর আঠার বিশের একটি ছেলে বেরিয়ে এল। ছাউনি থেকে তার ওস্তাদই তাকে ঠেলে দিল। মোটা কোমড়বন্ধ কাপড়ের ঘন নীল, তার নিচে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরেছে ছেলেটি। একটু সলজ্জ। লাউডস্পীকারে ঘোষণা হল সমস্তিপুরের বাচ্চা সিং প্রথম লড়াইয়ে নামছে। ধনেশ্বর জিতলে লালি আর বাছুর। বাচ্চা সিং জিতলে তার কেবল বাছুর। জনতা সমস্বরে হৈ দিল।

প্রথামত উরুতে দুটো থাপ্পড় মেরে বাচ্চা সিং মল্লভূমির মাঝখানে। আর তখনি ধানুর পায়ের আঘাতে তপ্ত নিশ্বাসে তেতে ওঠা ধুলো উড়ল। ধানু বাচ্চা সিংকে সময় দিল না এক লহমাও। গর্দানে হাত রেখে চোখের পলকে কোমরে ঝাঁকি দিয়ে নিচু হয়ে বাচ্চা সিংয়ের গোড়ালির কাছ থেকে একটা পা যেন আলগা-

ভাবে তুলে নিল। জনতা চিৎকার করে উঠল "পটকান দাও, পটকান দাও।"

সাত / দ্বৈরথ

কোথা দিয়ে কী হল বোঝা গেল না। প্রায় ছ'ফুট লম্বা ধান্, বাচ্চা সিংকে নিতান্ত বাচ্চার মতই একপা আর গর্দান ধরে শূন্যে তুলে নিল, তারপর এক দুই তিন চক্করের পর, গরম আগুন ধুলো উড়ল, বাচ্চা সিংকে ছুঁড়ে দিল। বাচ্চার পা মল্লভূমিতে। মুখ খানিকটা থেঁতো, বুকের হাড়েও চোট লেগেছে। শরীরের অর্ধেক অংশ শক্ত মাটিতে মল্লভূমির বাইরে।

সমস্তিপুরের ছাউনি থেকে লাঠি হাতে রে রে করে সাত আটজন ছুটে এল। পশ্চিমে জনা হালদারের ছাউনি থেকে ছুটে এল ত্রিলোচন, সঙ্গে ছামছন্দি আর তার সাগরেদ। ছামছন্দির হাতে মুগুর, সাগরেদের হাতে ছুরি।

ধানু হাঁচারিপাঁচারি দৌড়ল। দুহাতের ওপর শরীরের ভর রেখে, পেছনের পায়ের পাতায় মাটি ছুঁয়ে, শিরদাঁড়ার ওজন সামলে ধানু মল্লভূমি থেকে ছিটকে বেরল, তাড়া খাওয়া জন্তুর মত। জন্তুরই মত, কারণ ধানু দু'পায়ে দাঁড়াতে পারছিল না। সে চতুষ্পদ জন্তুর মত, তাড়া খাওয়া কুকুরের মতই দৌড়চ্ছিল।

ধানু এতৎসত্ত্বেও ক্ষিপ্র ছিল। ছোটবেলায় দেখা তাড়া খাওয়া সেই পাগলা কুকুরটার মতই ক্ষিপ্র ছিল।

সে কোন্ ছোটবেলার কথা। কালো কুকুরটা এলোমেলো ঘুরে বেড়াত। কুকুর জন্মায় গেরস্থর এঁটোকাঁটা যা পায়, খায়। এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, মরে। কেউ খোঁজ রাখে না। কুকুরটা নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে একজন পাগল মানুষও দেখেছিল ধানু। লোকে তাকে পাগল বলত। সে গান গাইত। একমুখ দাঁড়ি-গোঁফ, মাথায় জট-পাকানো চুল। কখনো উদোম ন্যাংটো। কখনও একচিলতে কাপড় কোমরে জড়ানো। কুকুর পাগল হলে কী হয় ধানু অত শৈশবে, সে কি তখন গোষ্ঠর মত, জানত না।

কালো কুকুরটা দুটো মানুষকে কামড়ে, মল্লভূমির এদিকটায় তখন জঙ্গল—ঝোপড়া আর গাবগাছ—শিরীষ বট পাইকর, পালিয়েছিল। সন্ধ্যার মুখে মুখে চরতে দেওয়া ছাগলগুলোকে ঘরে ফেরার জন্য ডাক দিতে গিয়েছিল ধানু। আর তখনই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার শুঁড়িপথে কুকুরটা, কালো লিকলিকে, লেজটা পেটের নিচে ঢুকে গেছে, ধানুর পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছিল।

কুকুর পাগল হয় কেন? ধানুর বাবা বলেছিল, "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়।"

মাথার ঘা কেন হয়, ধানু জানে না। পাগলা কুকুরটা তাকে কামড়েছিল। তার পরিত্রাহি চিৎকারে লোকজন জমা না হলে কুকুরটা হয়ত টুঁটি ছিঁড়েই মেরে ফেলত। ধানু বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু পাগলা কুকুরটা সেদিন মারা পড়েছিল। রে রে করে গোটা সদগোপপাড়া কুকুরটার পেছনে তেড়ে যায়। কুকুরটা লাঠির ঘায়ে, ইঁটের আঘাতে থেঁতো হয়ে যায়।

পেছনে অনেক মানুষের তাড়া খেয়ে ধানুর সেই কুকুরের কথা মনে এল। গ্রামের ওঝা তাকে কুকুরের কামড়ের ওষুধ দিয়েছিল—টোটকা। পাকা কাঁঠালি কলার ভিতর একজোড়া জ্যান্ত কেঁচো ভরে বলে দিয়েছিল, "গিলে ফেল বাপু গিলে ফেল।"

দুই হাত দু'পায়ে চতুষ্পদী আদলে দৌড়তে দৌড়তে ধানু বুঝতে পারল সে ক্রমশ কুকুর হয়ে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডে সারমেয়-সুলভ বক্রতা। মেরুদণ্ডের শেষে ছোট্ট একটা লেজ! এমনকী উত্তেজনায় তলপেটে চাপ অনুভব করলে একটা গাছের গুঁড়ির চারদিকে চক্কর মেরে ডানপাটা সামান্য তুলে কুকুরের কায়দায় ধানু পেচ্ছাপ করল। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের মত, কুকুরের মতই জিভ বের করে হাঁফাল। তারপর চেনা পথ শুঁকে শুঁকে ধানকলের রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। পিছনের চিৎকার ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। সময়ের হুঁশ নেই ধানুর। ঝুপ করে, গাছগাছালি ঘেরা গ্রামের প্রান্তের এই জঙ্গল, একটু পরেই শ্মশানঘাট, অন্ধকার নেমে এল।

এর পরই পাকা সড়ক। তার ওপাশে জনার্দনের ধানকল।

পার্বতী সেজেছিল খুব। কাঠ জ্বালিয়ে উনুনের সামনে উঁচু হয়ে বসে ত্রিলোচনের ভাত রাঁধছিল। ধানু নিঃসাড়ে, কুকুরের মতই, একটু লেজ তুলে, একটু গুটিয়ে, চতুষ্পদী আদলে পার্বতীর পিছনে।

আসলে কয়েকঘণ্টার তফাতে ধানু দেখে তার মধ্যে সারমেয়-সুলভ বাকি লক্ষণগুলো দ্রুত প্রকাশ পাচ্ছে। ধানকলের সামনে ইতস্তত শুয়ে থাকা কুকুর-গুলো এখনও চিৎকার করে যাচ্ছে। বেপাড়ার, ভিন গাঁয়ের কুকুর পাড়ায় ঢুকে পড়লে যেমন হয়। ধানু গলার মধ্যে কুঁই কুঁই শব্দ করে। পার্বতী বিমনা ছিল কিছু। হঠাৎ পিছন ফিরে দুই হাত, দুই হাঁটুর ওপর মেরুদণ্ডের ভারবাহী ধানুকে দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে।

ধানু গরগর করে শব্দ করে। তারপর মুখ ওপর দিকে তুলে চিৎকার করে ওঠে, ভৌ ভৌ।

পার্বতী একলাফে উঠোন থেকে ত্রিলোচনের দাওয়ায় ওঠে, তারপর ঘরে ঢুকে খিল দেওয়ার চেষ্টা করে, কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় ধানু এখন শিরদাঁড়ার ভার আর সেভাবে বোধ করে না। সেও চটজলদি, কুকুরের মতই ক্ষিপ্রগতি।

বাড়ি ফেরার পর প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। যেভাবে পেতে অভ্যস্ত, সেভাবে পার্বতীকে পায়নি ধানু। কামকাতরতার প্রকাশে মানুষ ও সারমেয়ে অমিল থাকলেও, মিল প্রচুর। প্রকাশের ভঙ্গিতে দুপেয়ে এবং চারপেয়ের ভঙ্গিতে যে তফাত সেটা থাকে, থাকেই।

ধানু কুঁই কুঁই করে। তার অদৃশ্য রোমশ লেজ তুলে আস্ফালন করে। একটু গোলমেলে, মানুষের হাত-পায়ের চলন, যৌনতা প্রকাশের মাত্রা থেকে ভিন্নতর ধানু উপগত হয়।

কাপড় চোপড় কোনু সময় ধানুর গা থেকে আলগা হয়ে গেছে। পার্বতীর

পিছন দিক থেকে ধানু শাড়ির আঁচলা ধরে টানাটানি করে। একেবারে সারমেয়-সুলভ প্রবণতাতে ধানু কুঁই-কুঁই করে শব্দ করে, পার্বতীর পিছন দিক থেকে উপগত হওয়ার উদ্যোগ নেয়। আশ্বাসের জন্য পিছন দিক থেকেই পার্বতীর দুকাঁধে হাত রেখে ধানু কোমর আন্দোলিত করে।

পার্বতী কিছুক্ষণ স্থির থাকে। তারপর এই আচম্বিতে হানা, অত্যাশ্চর্য—ধানুর গায়েও সারমেয়সুলভ আঘ্রাণ পায় পার্বতী, বিচলিত হলেও পার্বতী নিজেকে ফিরে পায়। কাঁধের ওপর রাখা ধানুর থাবা, বড় কুকুরময়। এখন ধানুর থাবা থেকে মুক্তি চায় পার্বতী। ঝটিতি সে দুপা এগিয়ে যায়। ধানু ধপ্ করে মেঝেতে পড়ে গিয়ে আবার চতুষ্পদী। খানিকটা রাগে হতাশায় গরগর।

পার্বতী বাঁ পা তুলে ধানুর তলপেট লক্ষ্য করে লাথি ছোঁড়ে।

একটা আর্ত কুঁই-কুঁই শব্দে ধানু চারপায়ে দাওয়া থেকে লাফিয়ে উঠোনে নামে। উঠোন পেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢোকে।

ধানু নিজেও যেন উপলব্ধি করে তার লেজ, যা বাহ্যত অদৃশ্য পেটের নিচে, গুটিয়ে এসেছে। একটা আহত রুগ্ন, মন্দা কুকুর কাঁদছে কুঁই-কুঁই করে।

আট / জলাতঙ্ক

সেদিন ঘরে ফেরার পথে পার্বতী এক পাগলা কুকুরের মুখে পড়েছিল। আসলে তিনদিনের মাথায় পার্বতীর গা-বমি ভাব,—যা প্রথমে ত্রিলোচনঘটিত আশঙ্কা করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো নারী ত্রিলোচন-সহবাসে গর্ভবতী হয়েছে এমন প্রমাণ না হওয়ায়, মাথা ঘোরা সবটাই ক্রমে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ হিসাবে গণ্য হয়। বস্তুত পার্বতীর মেরুদণ্ড, স্নায়ুর জটিল কেন্দ্র ক'দিন ক্রমান্বয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে মাদী কুকুরের আর্ত কান্নার রূপ নিতে থাকে। জলাতঙ্ক মাথার কোষে সংক্রামিত হলে পার্বতী মারা যায়।

ঠিক প্রাদুর্ভাব বলা যায় না। তবুও জলাতঙ্ক নিয়ে ছিপতিপুর ব্যস্ত হয়। পাগল কুকুরটিকে কেউ কখনও লোকালয়ে দেখেনি। বলতে কী চোখেও দেখেনি। ফলত পাঁচ-সাতটা কুকুরকে আন্দাজে পিটিয়ে মারলেও ছিপতিপুরে জলাতঙ্ক রয়েই গেল। এক এক করে ছামছদ্দি আর তার সাগরেদ, ধানকলের উঠোনে ত্রিলোচন কুকুরের কামড় খেল। জলাতঙ্কের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠলে তাদেরও মাথায় ঘা সংক্রামিত হল। জলের তেষ্টায় বুক ফেটে যায়, কিন্তু জল নামে না গলা দিয়ে। কামড় খাওয়ার সাত থেকে দশদিনের মধ্যেই পটপট করে মরে গেল সব এক এক করে।

ধানু মণ্ডল এখন কুড়ি বছর পর আবার মল্লভূমিতে আসছে। দুপায়ে মানুষের মত দাঁড়াবার জন্য আসছে। জনা হালদার ইতিমধ্যে দেহ রেখেছে। মাঠে-ঘাটে, জঙ্গলে ওত্ পেতে থেকেও কুকুরটি তাকে দ্বৈরথে পায়নি কোনোদিন। জনা হালদারের পেছনে পঞ্চায়েত, তার পেছনে পুলিশ—হাতে বন্দুক।

মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বৈরথ মুখোমুখি লড়াই। পঞ্চাশ পার হওয়া ধানু মণ্ডল বৃত্তাকার ক্ষেত্র ঘিরে পাক খায় আর পাক খায়।

# ভুবন ও তার দল

আজ সকালে একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠল ভুবন। অন্যদিনও যে খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস আছে তেমন নয়। তবু সেসব দিন, যাকে বলে কর্মমুখর দিন, তাড়া থাকে। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার তেমন কোনো তাড়া ছিল না। আজ সকালে ভুবনের ঘাড়ে দলের কোনো কাজের বোঝা ছিল না।

বারো বছর পর এমন একটা সকাল ভুবনের জীবনে এল! ভুবনের এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে কোনো কাজের কথা মনেই এল না। আসলে বারো বছর, ছোট বড় সামাজিক, অসামাজিক সমস্ত কাজের পিছনেই ভুবন তার দলকে দেখতে পেয়েছে। দলের বয়োবৃদ্ধ বা তরুণ বিশিষ্ট নেতাদের দেখতে পেয়েছে। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী রাজারহাট, আমডাঙা, সুরুল, নবীপুর এমনকি বাগুইহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার জনগণকে ভুবন দেখতে পেত। দল যেভাবে দেখতে বলত, ভুবন দেখত। অবশ্য দলও ভুবনের কথা শুনত, ভুবনকে দেখত। দলের কর্মযজ্ঞে ভুবনের যে ভূমিকা দল সে ভূমিকাকে অস্বীকার করেনি। বরং প্রয়োজনমত কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। যূথী, ভুবনের মেজবৌদি হাতে এক কাপ চা নিয়ে এল। বলল, "এখন কী করবে ভাবছ?"

ভুবন একথার কোনো জবাব সরাসরি দিল না। এককথায় এর জবাব হয় না। বলল, "দেখি কিছু তো একটা করতে হবে।"

ভুবনের বয়স এখন কত? বত্রিশ, তেত্রিশ। ভুবনের বাবা বেঁচে থাকলে নির্দিষ্ট জন্মসময়, তারিখ সাল—এমনকি ভুবনের রাশি-লগ্নও সঠিক বলে দিতেন। ভুবনের মায়ের একটা সাবেক আমলের কাঠের সিন্দুক আছে। ভুবনের ঠিকুজী কোষ্ঠী আছে তার ভিতরে। ভুবনদের পুরোহিত বংশ, হালদার বংশ। কালীঘাটের মন্দিরে ভুবনের কোন জ্ঞাতিদের, পালি পড়ে। বছরে একদিন তারা মন্দিরের প্রণামীর ভাগ পায়।

ভুবন একবার তার মায়ের সিন্দুকে, সে কোন অতীতের কথা—কিছু পেটোর

মশলা রেখেছিল। তখন নবীপুরের খাস জমি নিয়ে তার দলের সঙ্গে অন্য দলের কিচাইন্ চলছিল! সে সময়ে গণাদা, আসলে গণেন্দ্র গুছাইত কিছু পেটোর ফরমায়েশ দিয়েছিল। দমদম আর নাগেরবাজার খুঁজে কিছু গন্ধক আর মোমছাল এনে পলিথিন প্যাকেটে মায়ের কাঠের সিন্দুকে রেখে দিয়েছিল ভুবন।

ভুবনের গতিবিধি কী করে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে পুলিস এসেছিল। সেই প্রথম ভুবনের বাড়িতে পুলিস আসা। পুলিস সিঁদুর চন্দন মাখানো মায়ের সিন্দুক খুলে দেখেনি। ভুবনকে অবশ্য জেরা করার জন্য ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। তার দল তাকে ছাড়িয়ে এনেছিল।

ভুবনের বাবা দীননাথ তখন বিছানায় শোয়া। সেটা ছিল দ্বিতীয়বারের হার্ট অ্যাটাক্। দীননাথ তখন অনেকটাই বাকশক্তিরহিত। রেগে গেলে গোঁ গোঁ করতেন। মেজদাকে ডেকে গোঁ গোঁ করেই বলেছিলেন, মেজদার ভাষা অনুযায়ী, "কুলাঙ্গারটাকে বের করে দে, বাড়ি থেকে দূর করে দে।" বাড়িতে পুলিস আসাটা কালক্রমে এ বাড়িতে জলভাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বছরই শীতের শেষদিকটায় দীননাথ বিছানায় শুয়ে শুয়েই তৃতীয় এবং শেষতম স্ট্রোকের শিকার হলেন। তিনমাস আগে পুলিস এসেছিল বাড়ি সার্চ করতে। ভুবনকে ধরে নিয়ে যেতে। তারপর দীননাথের জীবদ্দশায় আর পুলিস আসেনি। কিন্তু মা বলতেন, "হালদারবাড়িতে কখনও পুলিস ঢোকেনি। ভুবন, তোর জন্য, তোর জন্যই উনি—"

বাড়ির ঠিকে কাজের মেয়েটা চায়ের কাপ নিয়ে চলে গেল। এবার শুরু হবে ঝাটপাট, ঘর ধোয়ামোছার পালা। রুটিনমাফিক। শুধু ভুবন আজ সকাল থেকে নিষ্কর্মা, বেকার হয়ে গেল।

দীননাথরা পুরোহিত বংশ। পুরোহিত কথার অর্থ দীননাথ বুঝিয়ে বলতেন বড় ছেলে নয়ন হালদারকে। যজমানীটা বড় কথা নয়। যে জ্ঞাতি-কুটুম্ব, স্বজন-পরিজন-সমাজ নিয়ে বাস করছ, তার হিত করাই পুরোহিতের কর্তব্য। দীননাথ তিন মাইল দূরে খলিসানীতে মিডল্ ইস্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন। এতদঞ্চলে কিছু যজমানীও করতেন। বয়স হয়েছিল, চোখে দেখতেন কম। পুরোহিতদর্পণ তাঁর মুখস্থ ছিল। বই না দেখেই মন্ত্র পড়তেন। খলিসানী মিডল্ প্রাইমারীতে সরস্বতী পুজোটা তিনিই করাতেন। অঞ্জলি দেওয়াতেন ছাত্রদের—"সরস্বত্যৈঃ নমোনিত্যং"—"বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্যঃ"। মেজবৌদি যূথী বিছানা তোলার জন্য ঘরে ঢুকে পড়ল। ভুবন বলল "আজ একটু থাক না বৌদি—একটু বাদেই না হয় উঠব। এখন তো আমার কোনো কাজ নেই।"

শয্যাত্যাগে ভুবনের এই আলস্য মেজবৌদি অর্থাৎ যূথীর খুব একটা না-

জানা নয়। তবুও দীননাথ গত হওয়ার আট বছর পরেও কিছু কিছু নিয়ম এখনও মানা হয়। মেনে চলতে হয়। ভুবনের মা পারুলবালা এখনও জীবিত। তিনি চান, যতদিন তিনি আছেন, নিয়মগুলো থাকুক।

ভুবনের বড়দা নয়ন হালদার এখন ঝাঁঝাতে। রেলের চাকরি, বদলির চাকরি। তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র সংসার নিয়ে ঝাঁঝার রেল কোয়ার্টার্সে। বছরে তিন চারখানা চিঠি দেন। শুভ নববর্ষ আর বিজয়ার মাকে প্রণাম এবং অন্যদের স্নেহাশিস জানান। ধান কাটার সময়, সে সময় ছেলেমেয়েদের পড়াশুনাও থাকে না—যে চার পাঁচবিঘে জমি আছে, তার ধানের ভাগ নিতে আসেন। সপরিবারে তিনচারদিন থাকেন। তারপর রেলের পাসে হাওড়া থেকে কোনোবার পুরী, কোনোবার মাদ্রাজ। ধান বেচা তিন চারশো টাকা ভুবনের বড়দার এই বৎসরান্তিক ভ্রমণে বড় কাজে লাগে।

মেজবৌদি খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসল। বলল "আরেক কাপ চা খাবে?"

চা-এর তেষ্টা তেমনভাবে ভুবন বোধ করছিল না। বরং কাল অনেক রাত পর্যন্ত মাল খাওয়া, বেহিসেবী থ্রি-এক্স রাম, ভুবনের স্নায়ুতন্ত্রকে এই সকালেও কিছুটা বিকল করে রেখে দিয়েছিল। ঘুম ভালো হয়নি। ঘুমের মধ্যে খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। ওপাশের ঘরে বাবা গোঁ গোঁ করছে। মায়ের সিঁদুর লেপা কাঠের বাক্সে মোমছাল, পটাশ। ছ-টা পলিথিনের ব্যাগ, রবারের গার্ডারে মুখ বন্ধ। হঠাৎ বাক্সটা নড়েচড়ে উঠল। বাক্সের ডালাটা খুলে গেল।

গণাদা বলল, মুখগুলো খুলে দে। মুখ খুলতেই প্রথম ব্যাগটা থেকে একটা হাত বেরিয়ে পড়ল। অন্য দলের বলাই সামন্তর হাত। ভুবন চিনতে পারল। তার পরের ব্যাগটা খুলতেই হর্ষর কাটা মাথা। ভুবনের দমবন্ধ হয়ে আসছিল। গণাদা বলল "খোল্, খোল্ না।"

গণাদার মুখে মৃদু হাসি। বললেন "খোল, খোল না, ভয় কি আমি এবার পার্লামেন্টে যাচ্ছি। আমি আছি।"

হঠাৎ মুখবন্ধ করা চারটে পলিথিন ব্যাগ নড়ে উঠল। যেন জীয়ল মাছের মত খলবল করে উঠল। স্বচ্ছ ব্যাগের মধ্যে রক্ত! তাজা লাল রক্ত। আঁশটে গন্ধ রক্তে। মুখবন্ধ ব্যাগে রক্ত। তার মধ্যে হর্ষ, প্যাঁকা ওরফে সুধীর পালের কাটা মুণ্ডু-দুটো ভুবন চিনতে পারল।

ওরা চীৎকার করছিল "গণাদা অমর রহে, গণাদা জিন্দাবাদ।" এই অবস্থায় শিশুকাঠের তৈরি সাবেক আমলের সিন্দুক ফাটতে আরম্ভ করে। চিতায় সাজানো কাঠ যেভাবে আগুন লেগে ফাটে চড় চড়, চড় চড়।

আতঙ্কে ভুবনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘামে বিছানা সপ্‌সপে ভিজে। ভুবন কিছুক্ষণ বোবার মত বসে থাকে মশারির মধ্যে।

ঘরের নাইট্ ল্যাম্প, জিরো পাওয়ারের নীলবাতিটা নিভে গেছে। পাখা বন্ধ। বর্ষার শুরুতে প্রচণ্ড গুমোট। ভুবন ভীষণ শ্বাসকষ্ট বোধ করে। ঘরের দক্ষিণদিকে খোলা জানালার কাছে গিয়ে ছুটে দাঁড়াতে চায়। পারে না। যেন

ভয়ঙ্কর জ্বর এসেছে শরীরে। ধীরে, নিঃশব্দে, ভুবন এলিয়ে দেয় নিজেকে, অবসাদে—অন্ধকারের আরও গভীরে।

একটা শব্দ উঠছিল ঘর থেকে। দরজা, জানালা বা এঘরের কাঠের দেরাজ। একটা ঘুণপোকা নিবিষ্ট কেটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে কুরর, কুরর···। শব্দটা মাথার মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে যায়। ভুবন কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

মেজবৌদি স্নান সেরে এসেছে। ভেজা চুল পিঠের ওপর দিয়ে ছড়ানো। মাথার ওপর ছোট করে ঘোমটা টানা। এবাড়িতে ঘোমটার রেওয়াজ সেভাবে নেই। তবু সকালে বাড়ির বউ, বাসি কাপড় ছেড়ে স্নান সেরে গলায় আঁচল দিয়ে গৃহদেবতা নারায়ণকে, পাঁচপুরুষের ক্ষয়া ক্ষয়া শালগ্রাম শিলাকে প্রণাম করবে—এ রেওয়াজটা থেকে গেছে। বাইরে থেকে বড়বৌদি এলে তাকেও এটা মানতে হয়, আর মেজবৌদি তো মানেই। ঘোমটা মাথায়, সিঁথিতে মেটে সিঁদুর মেজবৌদিকে মন্দ লাগে না, এই সকালে দেখতে।

মেজবৌদি বলল "আমি আর কাচা কাপড়ে বিছানা ছোঁব না। কাজের মেয়েটা এসে বিছানা তুলে দেবে। তুমি খাবার ঘরে এস। চা, জলখাবার দিচ্ছি।" বৌদি স্নানের সুবাস ঘরের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে গেল।

মেজদার বিয়ে হয়েছে বছর পাঁচেক হল। মেজবৌদি যুথী এখনও বাচ্চার মা হল না। কে জানে, হয়ত পরিকল্পিত পরিবার, সীমিত পরিবারের প্রকল্প। দাম্পত্য পাঁচবছর সন্তানহীন। বিষয়টা যে ভুবন একেবারেই ভাবেনি, তা নয়। সারাদিন মা, মেজবৌদি একা একা থাকে। একটা কচিকাঁচা বাচ্চা থাকলে মন্দ হত না।

মেজদার চেয়ে ভুবন দু-আড়াই বছরের ছোট। মেজদার বড় দিদি। নীলিমা—তিন ভাইয়ের একটাই বোন। বিয়ে হয়েছে শ্যামবাজারে। বনেদী, ব্রাহ্মণ পরিবার, একান্নবর্তী। এখনও ওখানকার ভট্টাচার্য পরিবারের টোল আছে, চতুষ্পাঠী আছে। পড়ুয়া নেই, তবুও আছে। দুবেলা তিরিশটা লোকের পাতা পড়ে। দিদি পাঁচমাইল দূরে বাপের বাড়ি আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। অতবড় সংসার, তারপর নিজের তিনটে বাচ্চা, শ্বশুর-শাশুড়ি। গত ভাইফোঁটাতে দিদি ফোঁটা দিতেও আসেনি। ভুবন মেজবৌদিকে দিয়ে একটা শাড়ি কিনিয়ে রেখেছিল। ভাইফোঁটার পর লোক দিয়ে নাকি মেজবৌদি নিজেই গিয়ে শাড়িটা দিয়ে এসেছিল। নীলিমার সঙ্গে এ বাড়ির যোগসূত্র অনেকটাই কেটে গিয়েছে।

দিদির শ্বশুর ব্রংকিয়াল অ্যাজমার রোগী। বছর দুয়েক আগে, তোতনের, দিদির ছোট ছেলের জন্মদিনে শ্যামবাজারে টোলবাড়ি গিয়েছিল ভুবন। দিদির শ্বশুর তখনও সাংঘাতিক হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন। কথা বলতে গেলে শ্বাসকষ্ট, যাই যাই অবস্থা। থেকে থেকেই দম আটকে চোখ কপালে। এভাবেই নাকি বছর পনের কাটিয়ে দিলেন দিদির শ্বশুর। আরও কতদিন কাটাবেন কে জানে?

ভুবনের মনে পড়ল জব্বর শেখেরও হাঁপানি ছিল।

মেজবৌদি টেবিলে চা দিয়ে গেল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট ছিল। মুখ ধোয়নি, গত রাতের ক্লেদ আর বিস্বাদ এখনও ভুবনের তালুতে, জিভে। ফ্রিজ থেকে সে ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করে ঢক্‌ঢক্‌ গলায় ঢালল। তারপর বিস্কুটের প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে, চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল। পাশে জলখাবারের লুচি-তরকারির ওপর একটা মাছি ঘুরপাক খাচ্ছে।

কাল রাতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ মনে হয়েছিল, কে যেন কাশছে। দম আটকানো কাশি। দিদির শ্বশুর তো কোনোদিন এবাড়িতে পা দেয়নি। একবার মনে হয়েছিল সেইই। কিন্তু ভুল ভেঙে দিল গণাদা। গণাদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি ঠোঁটে ধরে রেখেছিলেন। "গায়ে হাত দিস না, গায়ে হাত দিস না—বয়স্ক মানুষ, আপস করতে এসে গায়ে হাত কেন?"

ঠাহর করে লোকটিকে চিনতে পেরেছিল ভুবন। এ তো জব্বর শেখ, মকরম শেখের বাবা। ষাট-সত্তর বছরের বুড়ো। খলিসানীর মৌলবীদের জমির ভাগীদার। তিন বিঘে জমি ভাগে চষে। ভুবনের দলের অফিসে নালিশ জানাতে এসেছে।

বাগুইহাটি থেকে রাজারহাট পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার দুপাশে এখনও কিছু শালি জমি চাষে রয়ে গেছে। অর্ধেকের ওপর বায়না হয়ে গেলেও, এখনও অনেকটাই ফাঁকা। কোথাও ছ'বিঘে জায়গার ওপর টিনের কারখানা, কোথাও বরফকল। আবার কোথাও মাঠের মাটি কেটে ইটভাঁটা। পরিবেশ বদলাচ্ছে। এরকমই একটা বড়সড় জমি নিয়ে একটা টালির কারখানা করেছে গণাদার ছোট শালা। মেজদা সেখানেই ম্যানেজারের চাকরি করে। মাস গেলে সাত আটশো টাকা। কমিশনের তিন চারশো মিলিয়ে মন্দ নয়।

বুড়ো জব্বর শেখের আবাদি জমি মৌলবী, তার দুই বিবি আর সাত ছেলে-মেয়ে তিরিশ হাজার টাকার বদলে না-দাবি পত্র লিখে দিয়েছে। সঙ্গে আরও যে দু-এক তরফ ছিল কিছু কিছু টাকা নিয়ে আপসে সোলেনামা করে দিয়েছে। ওই চারবিঘে সম্পত্তি পেলে ভূপতি নাগের সঙ্গে গণাদা পার্টনারশিপে দশ বিঘের ওপর হাউসিং করবেন। গণাদার মায়ের, যিনি সদ্য দেহ রেখেছেন নিমতলার ইলেকট্রিক চুল্লিতে, নামেই হাউজিং কমপ্লেক্সের নাম হবে 'কমলা অ্যাপার্টমেন্ট'।

ভুবনকে একটা ছোট ভূমিকা দিয়েছে গণাদা। যেন-তেন-প্রকারেণ, হাজার দুতিন টাকার মধ্যে রফা করে জব্বরকে উচ্ছেদ করতে হবে। ছলে বলে কৌশলে জব্বর আর ওর বেটা মকরমের ভাগ নিয়ে একটা নিষ্পত্তি চাই। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রোজেক্ট। শপিং কমপ্লেক্স, চিলড্রেন্স পার্ক, মায় সুইমিং পুল পর্যন্ত। গণাদা গোটা হাউজিং কমপ্লেক্সের প্ল্যানটাও একবার দেখিয়েছিল ভুবনকে। ভুবন অভিভূত। কিছুক্ষণের জন্য ভি আই পি রোডের ধারে কমলা অ্যাপার্টমেন্টের

পার্ক ঘেঁষে একটা সাড়ে সাতশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটের স্বপ্নও দেখেছিল ভুবন।

গণাদা গোদা বাংলাভাষায় তার অফার জানিয়েছিল। গোটা প্রোজেক্টের ওয়ান পার্সেন্ট মানে নিদেনপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ভুবন দলের সুবাদে মাঝে মাঝে ছোটখাটো ধান্দায় পয়সা যে একদম পায় না, তা নয়। তবু পঞ্চাশ হাজার টাকা ভুবন একসঙ্গে চোখে দেখেনি। হাউজিং কমপ্লেক্সের এরকম নকশাও কী আগে কখনও দেখেছে?

পঞ্চাশ হাজার টাকাও অবশ্য রাতারাতি ভুবনকে ময়দানে টেনে নামাতে পারেনি। ভুবনকে সমাজবিরোধী লোকে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে না বললেও, ভুবন জানে। দুটো খুনের চার্জ, কয়েকটা লুটতরাজ—অগ্নিসংযোগ, খান তিনেক দাঙ্গা, একটা শহুরে বাজার থেকে নিয়মিত চাঁদা তোলার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ভুবন এখন সমাজবিরোধী। কিন্তু নিশ্চিত এবং একশোভাগ নিশ্চিত-ভাবেই গতকাল পর্যন্ত সে ছিল, সে নিজেও এজন্য শ্লাঘা বোধ না করে পারে না, দলীয় সমাজবিরোধী। গত পাঁচবছর ধরে সে দলটির নিয়মিত সক্রিয় সদস্য। এখন স্থানীয় কমিটিতে আছে। সামনের নির্বাচনের পর সে জেলা-কমিটিতে যাবে। চাই কি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা-পরিষদের আগামী নির্বাচনে দলীয় টিকিট নিয়ে প্রার্থীও হবে। ভুবন দলের স্বার্থে, দেশ ও দশের প্রয়োজনে সমাজবিরোধী।

এ অবস্থায় পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং গণাদার কমলা অ্যাপার্টমেন্ট—এ দুটিই দলের নির্দেশ, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ বলে হাঁটু গেড়ে মাথা নুইয়ে ভুবনের মেনে নিতে ইচ্ছে করে। চূড়ান্ত অবস্থায়, সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসানে সে মেনেও নেয়। কিন্তু রাতারাতি মেনে নিতে পারে না।

বিপদ এই যে, ভুবন কিছুটা লেখাপড়া জানে। এবং যেটুকু জানে, পাস করার বছর পাঁচের মধ্যে তার সবটুকু ভুলে যেতে পারেনি। যদিও কষ্টেসৃষ্টে পাস কোর্সে—তবুও স্নাতক তো। ভুবন কিছুকাল হল, একটু বেশি মন দিয়েই দলীয় মুখপত্র পড়তে শুরু করেছে। সামনে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা-পরিষদের ভোটের কথা ভেবে ভুবন হয়ত নিজেকে তৈরি করতে চেয়েছে। একজন স্নাতক অসামাজিক বা সমাজবিরোধী প্রাণী থেকে, ভুবন জানে পঞ্চায়েতের নেতায় রূপান্তরের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। যদিও তার পেছনে তার দল ছিল—গণাদা ছিল। তার নিজস্ব বাহিনী ছিল।

জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের—তার অপোজিট পার্টির অন্তত তিনজন পঞ্চায়েত সদস্যকে ভুবন চেনে, জানে—যারা গত একদশকেরও বেশি সময় অঞ্চল কাঁপিয়ে রেখেছিল। খুনখারাপি তো তুচ্ছ ব্যাপার, জনৈক সদস্যর বিরুদ্ধে অবৈধ নারী ব্যবসা সম্পর্কেও কিছু অভিযোগ দমদম, কলকাতা দু-জায়গারই পুলিসের খাতায় লেখা আছে।

ন্যূনপক্ষে অপোজিট পার্টির তিনজন সমাজ-বিরোধীকে সরিয়ে দিয়ে, অবশ্যই ভোটের মাধ্যমে, ভুবনের দলের তিনজনকে যদি আনতেই হয়—ভুবন

জানে, সে আছে। এক নম্বর প্রার্থী হিসেবেই আছে।

এইসব গভীর, গভীরতর রাজনৈতিক ভাবনা ভুবনকে কিছুটা বিহ্বল করে রাখে, কিছুদিন—প্রায় সপ্তাহখানেক। পার্টির মুখপত্র যেখানে বর্গার অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে চাইছে—মিটিং, মিছিল চলছে, 'এ লড়াই, বাঁচার লড়াই,' মন্ত্রী আসছে, আমলা আসছে, পঞ্চায়েত ছুটোছুটি করছে, সেখানে চরম হঠকারী হয়েও ভুবন এককথায় জব্বর শেখের গলায় হাত রাখতে পারেনি।

রেখেছিল, গণাদার শেষ এক্তেলার পর। গণাদা ভুবনেরই এক চামচে খোঁড়া ফণীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, জব্বর শেখকে ট্যাকল্ করার মত সামান্য কাজের জন্য ভুবনের মত গণ্ডা গণ্ডা লোক গণাদার হাতে, ভুবনের দলের হাতে আছে। ভুবন না পারলে ঝেড়ে কাশুক।

যেদিন দুপুর নাগাদ খোঁড়া ফণী এই বার্তা বয়ে এনেছিল, সেদিন সন্ধ্যেতেই ভুবন মকরম শেখ আর তার জ্ঞাতিগুষ্ঠির সামনে জব্বর শেখের কণ্ঠনালী চেপে ধরেছিল।

জব্বরের সম্ভবত ব্রংকিয়াল আজ্মা ছিল। জব্বর কাশছিল, ভয়ঙ্কর কাশছিল আর বাতাসের জন্য হাঁকপাঁক করছিল। যেমন ভুবন তার দিদি নীলিমার শ্বশুরকে দেখেছিল। কাশতে কাশতে হাড় জিরজিরে বুকের ছাতি যেন ফাটছিল—চড় চড়, চড় চড়। স্বপ্নে দেখা মায়ের শিশু কাঠের সিন্দুকের মত। বিস্ফারিত, বিহ্বল মরামাছের মত জব্বরের দুটো চোখ কপালে। জব্বর হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল। এর দুদিন পর মহকুমা হাকিমের এজলাসে এফিডেভিট করে জব্বর শেখ আর মকরম শেখ না- দাবিপত্র পেশ করে। মৌলবীর জমিতে তাদের কোন বর্গা নেই।

দিন পাঁজিতে দেখাই ছিল। রথের দিন কমলা আপার্টমেন্টের ভিত পুজো হয়। জব্বর সেদিনই সহসা কাশতে কাশতে দম আটকেই মারা যায়। কাল রাতে, অন্ধকারে ভুবন যখন থ্রি-এক্স রামের ঘোরে, কেউ কাশছিল ভুবনের বুকের খুব কাছে মুখ তুলে এমন যে, ভুবনের গালে কাশির দমক এসে লাগছিল। কে কাশছিল নীলিমার শ্বশুর নাকি জব্বর শেখ? ভুবন কমলা অ্যাপার্টমেন্টের জন্য, গণাদার জন্য—ওয়ান পার্সেন্ট কমিশনের জন্য জব্বরের কণ্ঠনালী চেপে ধরেছিল।

মেজবৌদি জলখাবারের প্লেট, খালি চা-এর কাপ সরিয়ে নিয়ে গেল। অন্যদিন হলে ভুবন এতক্ষণে তার মোটর বাইকে চেপে এয়ারপোর্টের দিকে চলে যেত। না হলে দমদমে দলের অফিসে। নিদেনপক্ষে কাছেই রাজারহাটে তার ক্লাবের সকালের আড্ডায়। ওখানে তার নিজস্ব বাহিনীর সঙ্গে দেখা হত। দল নিয়ে দু-চার কথা হত। সামনের পুজো বা জলসা নিয়ে পরিকল্পনা হত। আজ এসব কিছু হওয়ার ছিল না। ভুবন জানে না, এসব কাজ এখনও তার আছে কিনা।

ভুবন হালদারকে গতকাল তার দল এক্সপেল্ড্ করেছে। নানাবিধ অসামাজিক কাজের তালিকা দিয়ে বলেছে, প্রগতিশীল সমাজবাদী দলে ভুবনের মত সমাজ-বিরোধীদের ঠাঁই নেই। প্রস্তাব স্থানীয় কমিটিতে পাস হয়েছে। জেলা কমিটিতে স্থানীয় কমিটির রায়ই বহাল থেকেছে। ভুবন দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।

জেলাতে ভুবনের পৃষ্ঠপোষক দু-চারজন যে নেই, তা নয়। তারা বিষয়টা দেখছে, এটাই ভুবন ভেবেছিল। ভুবন তো আর হঠাৎ করে সমাজবিরোধী হয়নি। দলের চোখের সামনে, নেতৃত্বের প্রকাশ্য বা গোপন নির্দেশেই ভুবন সমাজবিরোধী হয়েছে। তার দল হঠাৎ কেন যে ভুবনকে অ্যান্টিসোস্যাল হিসেবে আবিষ্কার করল, এটাই এখনও স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ধাঁধা। প্রথমটায় ভুবনেরও খানিকটা ধাঁধা লেগেছিল। তারপর দু-তিনজন মধ্যস্থ, যারমধ্যে অন্য এলাকার এক বিধানসভা সদস্যও ছিলেন, যখন একে একে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন, ভুবন বুঝল তার বারোটা বেজে গেছে।

এতাবৎকাল পর্যন্ত তার সুকাজ, কুকাজ সব কিছুর পিছনেই দল ছিল। গণাদা ছিল। গতকাল বিকেল থেকেই তার পিছনে দল রইল না, গণাদা রইল না। ভুবন হালদার একা হয়ে গেল।

ভুবনের নিজস্ব রিক্রুট খোঁড়া ফণী, ট্যারা দাশু, ন্যালা, জয়ন্ত—তার ক্লাব এগুলো কি থাকবে? এগুলো দলের প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না। ভুবন ভাবল, আজ সারাদিন সে বাড়ির বাইরে পা দেবে না। সে মায়ের সঙ্গে থাকবে, মেজবৌদির সঙ্গে থাকবে। এবং এই ঘরোয়া অবসরের মধ্যেই তার পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করবে।

বারো বছর পর দল-বিতাড়িত ভুবন বড় ভয় পেল। ভুবন একা। তার দশ বারো বছরের দুষ্কৃতীর দায় গতকাল বিকেল থেকে কী নিতান্তই তার একার? দল কোথাও থাকবে না? তার পিছনে গোপনেও, কোথাও না?

হর্ষ চাটুজ্জেকে ভুবন একা মারেনি। দলের আরও পাঁচটা লোকের সামনে ভুবন নেপালা চালিয়েছিল। হর্ষ বড় বেড়েছিল। আটবছর আগে উত্তর দিকের তিরিশ বর্গ কিলোমিটার জায়গা হর্ষ তার মৌরসী পাট্টা করে নিয়েছিল। হর্ষর ব্যূহ ভেদ করে ভুবনের সমাজবাদী দল ভেতরে ঢুকতে পারছিল না। অথচ এই তিরিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকার গুরুত্ব তার দল জানত। ভুবনও জানত। আম-জাম-কাঁঠালের সাবেক বাগান, গরু-মোষের বাথানের পাশাপাশি এতদঞ্চলে পাঁচ হাজার ভোটার ছিল। হর্ষ এই পাঁচ হাজার ভোটার নিয়ে দাপাত। ভি আই পি রোড বরাবর তার মোটর সাইকেল অহঙ্কারী গর্জন করত। যেন বলত আমি হর্ষ চাটুজ্জে, দেখ আমার হাতে পাঁচ হাজার ভোট। এর আগে ছোটখাটো কাজ করলেও, ভুবনের কেরিয়ারে হর্ষ বধই প্রথম বলার মত বড় কাজ। মাত্র দুদিনের প্রস্তুতিতেই একটি নেপালী ভোজালি দিয়ে ভুবন তার দলের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। তিরিশ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় দাপিয়ে বেড়াবার

পথ। পাঁচ হাজার ভোটারের কাছে পৌঁছবার পথ। পথটা জানত সবাই— ভুবনই পথ করে দিল বলা যায়।

ভুবন হালদার নিজের প্রয়োজনে হর্ষ চাটুজ্জের গলায় নেপালা চালায়নি। দলের প্রয়োজনে, দলের গোপন সম্মতিতে চালিয়েছিল। না, সাক্ষীসাবুদ নেই। তবুও হর্ষকে খুন করার চার্জ আজ এককভাবে ভুবন হালদারের ওপর। কেন?

ভুবন সকালেই স্নান সেরে আরেকপ্রস্থ ঘুমোতে চায়। মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে যূথীকে বলল, "আমি ছাড়ব না, সব শালাকে ফাঁসাব, তুমি দেখে নিও বৌদি।"

ফাঁসাবার কথা মাথায় আসতেই বলাই সামন্তর কাটা বাঁ হাতটার কথা মনে পড়ল। হাসপাতালে গোটা হাতটা বাদ দেওয়ার পর একটা পলিথিন কাপড়ে মুড়ে রাখা হয়েছিল। তার আগে এক্স-রে তোলা হয়েছিল। কনুই-এর কাছ থেকে হাতের ওপর দিকটায় যেখানে ভুবন তিনবার শাবল চালিয়েছিল, এক্স-রে-তে দেখা গেছে সেখানে সবকটা হাড়, কনুই-এর কাছ থেকে ওপর পর্যন্ত ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে।

ঘটনাটা গণাদার বাড়িতেই ঘটে, আরো দশটা লোকের চোখের সামনে। তখন গণাদা, এই এলাকায় জমি কেনাবেচার দালালি করত। এক মারোয়াড়ী কোম্পানি তেলকলের জন্য গণাদার পেছনে পড়েছিল।

নবীপুরের সাতবিঘে ডাঙা জমি ছিল, বলাই সামন্তর এক জ্ঞাতিদের এজমালি সম্পত্তি। জমিটা তেলকলওয়ালাদের পছন্দ হয়। দামদস্তুর, কমিশনের জন্য গণাদা বলাই সামন্তকে চেপে ধরে। বলাই তার জ্ঞাতিবর্গ আর তেলকলওয়ালাদের মধ্যস্থতা করে। দামদস্তুর, কমিশন নিয়ে দর কষাকষি করে। কমিশনের হাজার সাতেক টাকার অর্ধেক ভাগ চায়।

বলাই সামন্ত ছা-পোষা মানুষ। নবীপুরেই একটা ছোট মুদির দোকান চালায়। ভুবনের দলকে চাঁদা দেয় বটে, কিন্তু মিটিং মিছিলে বড় একটা যায় না। গণাদা পাঁচশ টাকা আর তেলওয়ালার তরফ থেকে একটা ক্লাবঘরের প্রতিশ্রুতি দেয়।

ঝিপ্‌ঝিপে বৃষ্টি ছিল সেদিন। বলাই সামন্তকে কয়েকজন গিয়ে তিন কিলোমিটার দূর থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল। যদিও পরে দল বলেছিল, বলাই-ই গণাদার বাড়ি আক্রমণ করেছিল। কারণ ঘটনাটা ঘটেছিল গণাদার বাড়িতেই তার বাইরের ঘরের রোয়াকে।

সাত হাজার টাকার কমিশন নিয়ে বচসা। কারণ সাত বিঘে জমির বায়নানামা হয়ে গেছে। এখন কমিশন ভাগযোগের পালা। তেলকলওয়ালা বলেছে, বলাই সাড়ে তিন হাজার টাকা পুরো না পেলে জমি রেজিস্ট্রি হতে দেবে না বলেছে, সে এতদঞ্চলে নবাগত, জমি বলাই সামন্তর জ্ঞাতিগুষ্ঠির। সুতরাং গণাদাই আসল লোক সে সমঝে গেলেও গণাদার ভাগে সাড়ে তিন

হাজারের বেশি সে দিতে পারবে না।

গণাদা বলাইকে হাজারখানেক টাকা নিয়ে আপস করতে বলেছিল। বলাই সামন্ত গররাজি। পরিবারবর্গ, মুদি দোকান নিয়ে তারও একটা স্বপ্ন ছিল। হাজার তিনেক টাকার স্বপ্ন বলাই ছাড়তে পারবে না। তাছাড়া খন্দের অর্থাৎ তেলকলওয়ালা গণাদার পার্টি হলেও, মধ্যস্থতা জমি নিয়ে দরদস্তুর, বায়নানামা সবই তো বলাই সামন্ত করেছে।

বলাই তার দাবি জানাবার দুদিনের মাথায় বাটখারা আর ওজনের গোলমাল নিয়ে বলাই-এর দোকানে দলের ছেলেদের সঙ্গে বচসা বাধে। মুদি দোকানেই দু-টিন কেরোসিন ছিল। দিন-দুপুরেই বলাই-এর মা লক্ষ্মী ভাণ্ডারে আগুন লাগে।

আগুন বলাইকে মরিয়া করে। সে ভুবনদের বিরোধী দলের সঙ্গে গোপনে হাত মেলায়। বস্তুত গণাদা একদিন উল্টোডাঙা—ভি আই পি রোড জংশনে, সন্ধ্যের দিকে জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের সমাজবিরোধী গ্রুপে সাঁতরার সঙ্গে বলাই সামন্তকে হাত মেলাতে দেখে। কাছাকাছি সময়ে ভুবনের দলের দুটো ছোকরা বাগুইহাটি বাসস্ট্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক দলের এক মস্তানের কাছে চড় থাপ্পড় খায়। ওরা নাকি গণতান্ত্রিক দলের মস্তানের বোনকে আওয়াজ দিয়েছিল। গণাদা তো বটেই, ভুবন এবং তার দলের স্থানীয় কর্মীরা গোটা ব্যাপারটার পিছনে বলাই সামন্তর কালো হাত দেখতে পায়।

গণাদা আওয়াজ তোলে, "বলাই সামন্তর কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।"

লোহার শাবলের আঘাতে বলাই-এর হাতে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল। বলাই সামন্ত এখন হাত কাটা বলাই। ভুবনের দলের সক্রিয় সদস্য। নবীপুরে বাসস্ট্যাণ্ডে পঞ্চায়েতের সুপারিশে গ্রামোন্নয়নের অনুদানে বলাই-এর একটা চায়ের দোকান হয়েছে।

টালি ছাওয়া ছাপরার ঘর। সামনে দুটো বাঁশের বাতায় পেরেক ঠোকা বাঁশের খুটির বেঞ্চ! বলাই, হাতকাটা বলাই কী সব ভুলে গেছে। ভুবনের স্বীকারোক্তি করতে ভয় নেই। জেলা কমিটির নেতারা তার পিতৃতুল্য। বলাই সামন্তকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। বলাই যদি সাথ দেয়, ভুবন দলের কাছে তার নিজের আর্জি জানাবে।

"দল ছাড়া আমি বাঁচব কী করে।"—ভুবন বলবে। দরকারে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে যেতেও তার বাধবে না। সঙ্গে সে শুধু হাত কাটা বলাইকে নিয়ে যেতে চায়।

কাল রাতে স্বপ্নে ভুবন পলিথিনের ব্যাগে, চাপ চাপ কালো রক্তে ভেজা বলাই-এর কাটা হাত দেখেছে।

দুপুরে ভাত খেয়ে ভুবনের একটা ছোটখাটো ঘুম দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।

যূথী, ভুবনের মেজবৌদি একখিলি পান হাতে ভুবনের খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসল।

সকাল থেকেই মায়ের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বাড়িটাই একটু যেন বেশি চুপচাপ। মেজদাও কখন যে খেয়ে-দেয়ে টালিখোলার কাজে বেরিয়ে গেল, ভুবন টেরই পায়নি।

"মা কোথায় ?" ভুবন জিজ্ঞাসা করল।

যূথী পা দোলাচ্ছিল খাটে বসে। পা দোলানো থামল। বলল, "সকাল থেকেই মা ঠাকুর ঘরে।"

—"কেন ? মা একটু বেশি সময়ই ঠাকুর ঘরে থাকে। কিন্তু আজ এতক্ষণ কেন ?"

যূথী একথার কোনো উত্তর দিল না, যদিও যূথী জানে দল থেকে ভুবনের বহিষ্কারের খবরে মা ভয় পেয়েছে। শুধু ভুবন একা নয়, গোটা বাড়িটাই যেন একা হয়ে পড়েছে। দলই যখন সঙ্গে নেই, ভুবনের কিসের জোর ?

বারো বছর ভুবনের পরিচয়েই একটু একটু করে পরিচিতি পেয়েছে এই বাড়ি। ভুবনের মেজদা স্বপনকেও লোকে চেনে ভুবনের মেজদা বলে। সে শুধু ভুবনের নয় সারা পাড়ার মেজদা। স্বপনের কর্মক্ষেত্রে সবাই, টালিখোলার মালিক গণাদার শালা পর্যন্ত স্বপনকে মেজদা বলে। সেভাবেই ভুবনের মা পারুলবালা এখন শুধুই ভুবনের মা নয় কারও মাসিমা, কারও কাকিমা। যূথী, ভুবনের মেজবৌদি সার্বজনীন মেজবৌদি। এমনকি স্থানীয় রিকশওয়ালারা পর্যন্ত যূথীকে মেজবৌদি বলে ডাকে।

ভুবনের দল থেকে বহিষ্কারের খবর ইতিমধ্যে চাউর হয়ে গেছে। ভুবন একা নয়, সবসুদ্ধ দলের তিনজন। একজন বহুদিনের দলীয় কর্মী, আরেকজন বছর চারেকের পুরনো। ভুবনের পরিচিতি, দলের মধ্যে ভুবনের মত গুরুত্ব-পূর্ণ অবস্থান এদের দুজনের কারোই নেই—ছিল না, অন্তত গত সাত-আট বছরে।

যূথী বলল, "আমার ভীষণ ভয় করছে ঠাকুরপো !" ভুবন বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খেল। বিয়ের পর থেকে যূথী—মেজবৌদি তার সঙ্গে খুনসুটি করছে, ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছে, রাগ করে গালিগালাজও দিয়েছে। কিন্তু, এমন নিস্তব্ধ গুমোট দুপুরে, তার ঘরে, তার খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে, যূথী কখনও এত আন্তরিক বলেনি, যেন ফিসফিস করে, ভয়ে গলা বুজে গেলে যেমন হয়—"আমার ভয় করছে ঠাকুরপো !"

যূথীর মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে। যূথী কি একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করেছে, ভয় পেয়ে বাচ্চা মেয়ের মত কি এখনই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে ? বোবা চোখ মেলে ভুবন মেজবৌদির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আজ, এই মুহূর্তে সহসা বলে উঠতে পারল না, কীসের ভয়, আমি তো মরে যাইনি। ভুবন আধ-শোয়া ছিল। উঠে বসে যূথীর হাত চেপে ধরল একটা হাত বাড়িয়ে। যূথীর

হাত ঘামছে। যূথীর হাত একটু একটু কাঁপছে।

"মেজবৌদি, তুমি ভয় পেয়েছ?" ভুবন বলল।

"আমি তোমার মেজদাকে তাড়াতাড়ি টালিখোলা থেকে ফিরে আসতে বলেছি।" যূথী বলল।

"কেন?" ভুবন একটু অবাক হওয়ার ভান করল।

"কেন আবার? যদি কিছু হয়।" যূথী নিজেকে আড়াল করার জন্য দক্ষিণের জানালার দিকে উঠে গেল।

মেজবৌদির মুখের ভাব থেকে, ভয় থেকে ফিসফিস কথাবার্তা থেকে ভুবন অনেকটাই বুঝতে পারছিল। তবু বোকা-বোকা মুখ করে বলল "কী আবার হবে? ও নিয়ে তুমি এত ভেব না তো!"

ভুবন দেখল, বুঝল, তাকে নিয়ে সবাই ভাবছে। দল তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দলচ্যুত ভুবনকে নিয়ে, একা ভুবনকে নিয়ে সবাই ভয় পাচ্ছে।

যূথী বলল, "যা শুনলাম তা কি ঠিক?"

ভুবন বলল, "কী শুনেছ সেটা বলবে তো। সেটা না শুনে বলি কি করে?"

ওরা বলছে, "ভোটের আগে তোমার মত একজনকে দলে রাখলে দলের ইমেজ খারাপ হত। তোমার দল ভোট কম পেত।"

এ কথায় ভুবন খুব মজা পেল। যূথীও তার দলের ভোট নিয়ে ভাবছে। কিংবা ভুবন এবং তার দলের সম্পর্ক ভোটের ওপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটাবে, সে খবর রাখছে। ভুবন বলল, "তোমার কি মনে হয়?" যূথী বলল, "কী জানি!"

ভুবন বলল, "বল না! আমার একটু শুনতে ইচ্ছে করছে।"

যূথী কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভুবন বলতে চেয়েছিল গোটাকতক খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ভীষণভাবে রাজনৈতিক। ভুবন না করলেও অন্য কেউ করতই। আমার দলের সমাজ-বিরোধী, না হলে অন্য দলের, অন্য কেউ। এই ব্যবস্থা হয়ত ভুবনকে কিছু মালকড়ি এনে দিয়েছে, কিছু প্রতিপত্তি দিয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা তো ভুবনকে বাদ দিয়েও থাকবে। দল থাকবে, গণাদা থাকবে। কারও হাত কাটা যাবে, কারও মাথা। কারও ঘরে আগুন লাগবে, কারও দোকানে। তেলকলওয়ালা থাকবে, কমিশন সিস্টেম থাকবে, দালালি থাকবে—দলও থাকবে।

অপোজিট্ পার্টিতে যদি সমাজবিরোধী থাকে, আমার পার্টিতে সমাজ-বিরোধী না থাকলে চলে কী করে। দলের প্রয়োজনে সমাজবিরোধী ছিল, আছে—থাকবে। গণাদা জিন্দাবাদ।

হঠাৎই উত্তেজনার একটা দমক এসেছিল; তারপরই তা থিতিয়ে গেল। ভাতঘুমের শেষে রেশটুকু যেন ভুবনের জ্বালাধরা চোখের ওপর ভারি হয়ে নেমে এল।

মেজদা স্বপন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ফিরে এসেছে। বলল, "আজ আর তোর

বাইরে বেরবার দরকার নেই।"

—"কেন, ওরা কিছু বলল ?"

—"ওরা আবার কি বলবে ? কদিন একটু ধৈর্য ধরে ঠিকমত থাক। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্ধ্যার দিকে পুলিসের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর এল। ভুবনের ছোটবেলার ইস্কুলের বন্ধু—দুলু।

দুলু বলল, "এখন কোনো রিস্ক নিবি না ভুবন।"

ভুবন বলল, "দল আমাকে কোনো কারণ না জানিয়ে তাড়িয়ে দিল। এটাই খারাপ লাগছে।

—"তোর এই ন্যাকামিটাই খারাপ লাগে ভুবন। দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে, আর তুই জানিস না ?"

—"কী জানে লোকে, সত্যিই আমি জানি না।" দুলু বলল, "দল তোর বিরুদ্ধে তিনটে চার্জ এসেছে। দুটো অফিসিয়াল, একটা আনঅফিসিয়াল। দুলুকে কাছে পেয়ে, দুলুর মুখ থেকে দলের ভিতরের গল্প শুনতে, বিশেষত যেটা তাকে নিয়েই, ভুবনের বেশ মজা লাগছিল। সারাদিনের বুকের ওপর জমা হওয়া চাপ হালকা হয়ে যাচ্ছিল।

ভুবন বলল, "আগে অফিসিয়াল চার্জটাই শুনি।"

দুলু খুব গম্ভীর মুখে বলল, "তুমি সমাজবিরোধী—তোমার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিশ পঁচিশটি ধারা অনুযায়ী সতেরটি মামলা আছে।"

ভুবন বলল, "কিন্তু সেসব তো দলের জন্য।"

দুলু বলল, "এখন তো তোমার দল নেই। কিন্তু তুমি আছ, তোমার অপরাধগুলো আছে। দল বিবৃতি দিয়ে বলবে, "তুমি মিছিমিছি নিজের সাফাই গাইবার জন্য দলকে জড়াচ্ছ।"

ভুবন একটু উত্তেজিত। বলল, "বেশ, তো দ্বিতীয় অফিসিয়াল চার্জটা কি ?"

—"তুমি কমলা অ্যাপার্টমেন্টের কাজে বাধা দিচ্ছ। তোমার গণাদাকে টাকার জন্য চাপ দিচ্ছ। অথচ সবাই জানে পার্ক লেক সবমিলিয়ে এটা এই অঞ্চলের একটা নামকরা প্রোজেক্ট হচ্ছে। তুমি ব্যাটা মাঝখান থেকে—"

দুলুর বলার ভঙ্গিতে ভুবন হেসে ফেলল। বলল, "সত্যি, তোরা পুলিসের লোকরা পারিসও বাবা !"

যূথী দু-কাপ চা, আলুর পাঁপড় নিয়ে ঘরে ঢুকল। সারাদিনের দমবন্ধ অবস্থাটা যেন একটু একটু কাটতে শুরু করেছে। বহিষ্কৃত ভুবনের জন্য, একা ভুবনের জন্য যেন হাঁসফাঁস করছিল বাড়ির তিনটি প্রাণী—গোটা বাড়িটাই। বাইরে মেঘ জমেছে, দু-চারটে বৃষ্টির ফোঁটাও পড়তে শুরু করেছে। ভুবন বলল, "পালাবি না দুলু, আমি চট করে জামা—প্যান্টটা বদলে আসি।"

পারুলবালা আর স্বপন, ভুবনের মেজদাও এসে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে। সম্ভবত দুলুর কাছে একটু ভরসা পেতে। হাজার হোক দুলু ভুবনের ছোটবেলার

বন্ধু। তায় পুলিসের লোক।

ভুবনের মা পারুলবালাকে দুলু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মা বললেন, "সারাদিন ছেলেটা মুখ শুকনো করে বসে আছে। কিছু হবে না তো বাবা। আমার কেমন যেন ভয় করছে!"

দুলু হেসে বলল, "কী আবার হবে! একটু আধটু ঝামেলা—ও নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই।"

পারুলবালার গলা কাঁপছিল। বললেন, "পেটের ছেলে তো বাবা, খুন-রাহাজানি যাই করুক, ফেলে তো দিতে পারি না!"

মেজদা বলল, "তোমরা একটু দেখ দুলু—তোমরা পুলিসের লোক—"

—"না না, কিছুই দেখতে হবে না। ভুবন হালদার এখন লিডার লোক। লিডার না হলে কাউকে অতবড় দল থেকে তাড়ায়?"

"না না, কী যে বল।" মেজদা লিডারের দাদা হিসাবে একটু যেন অহঙ্কারী একটু লজ্জিত।

যূথীর দিকে হাসি হাসি চোখ তুলে দুলু বলল, "লিডার হতে আজকাল কী লাগে বলুন মেজবৌদি? গোটা কুড়ি ছেলে, লোকাল থানা পুলিস - আর সঙ্গে হ্যাঁ, সেটা খুব জরুরি। একটা খবরের কাগজ!"

জামা কাপড় বদলে ভুবন—তরতাজা সন্ধ্যাবেলার পরিপাটি ভুবন ঘরে ঢুকল। হঠাৎ বলল, "হ্যাঁরে দুলু, তুই অফিসিয়াল চার্জ দুটো বললি। আন অফিসিয়ালটা বললি না।"

দুলু বলল, "তুই তো বেরবি। চল যেতে যেতে বলব। আনঅফিসিয়াল চার্জটা খুব ব্যক্তিগত। এর সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই।"

মা আশ্বস্ত। তবু ভয় যায়নি পুরোপুরি চোখ থেকে। বললেন, "আজকে কী না বেরলেই হচ্ছে না?"

মেজদা বলল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

ভুবন বলল, "ওই যে দুলু বলল, লিডার হতে গেলে গোটা কুড়ি ছেলে, যাকে বলে ক্যাডার দরকার। তা আমরা তো এখানে তিনজন আছিই—মেজদা তুমি, মেজবৌদি আর আমি। আর গোটা ষোল ছেলে আমি বাইরে বেরলে এখনও পাব। এই হল গিয়ে উনিশজন।"

মেজবৌদি বলল, "কুড়িজন হতে গেলে তো আরও একজন দরকার।"

ভুবন চোখ গোলগোল করল, যেন কুড়ির হিসেবে একজন নিয়েই সমস্যা। তারপর একটু থেমে বলল, "ওহো, আরেকজনের কথা তো ভুলেই গেছি।"

যূথীর কাঁধে হাত রেখে বলল, "আরেকজন আসবে—তোমার পেটে।"

যূথী—মেজবৌদি চটাস্ করে ভুবনের পিঠে একটা চাপড় মারল।

ভুবন একলাফে দরজার দিকে সরে যেতে যেতে বলল, "মেজদা, দ্যাখ—পুলিস তো সঙ্গে আছেই। আর খবরের কাগজ? ওটা আমরা সবাই মিলে খুঁজে নেব।"

বাইরে দু-চারফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। দুলু মোটরবাইকে স্টার্ট দিল। মুখ থমথমে গম্ভীর।

—"তুই দলের নয়, শুধু নিজের জন্য একটা ভয়ঙ্কর সমাজবিরোধী কাজ করেছিস।"

—"কী!" একটু যেন হতভম্ব ভুবন।

—"সাতদিন আগে তোদের ক্লাবের রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ততে কী করেছিস?"

—"কী করেছি, সেদিন তো, তেমন কোন গোলমাল হয়নি। শুধু একবার লোডশেডিং-এর সময়ে—"

দুলু মোটরবাইকে চেপে বসতে বসতে বলল, "হ্যাঁ, সেই লোডশেডিং-এর সময় তুই গণাদার ছোট শালীর বুকে হাত দিয়েছিস।"

ভুবন বলল, "ষাঃ, এটা কমপ্লেন?"

—"কনফিডেনসিয়াল কভারে, তোমার চরিত্রের এই দিকটা গণাদা স্থানীয় কমিটিতে তুলে ধরেছে। অন্য অপরাধগুলো তো আছেই।"

—"স্থানীয় কমিটিতে গণাদার শালী মানে সুমিত্রার—যাঃ।" ভুবন মোটরবাইকের কেরিয়ারে উঠে বসল।

—"হ্যাঁ, এটাই তোমার ব্যক্তিগত দিক থেকে, দলীয় নয়—সবচেয়ে সিরিয়াস চার্জ।"

মোটরবাইক বড়রাস্তার ওপর উঠে এল। দুলু বলল, "কোথায় যাবি?"

ভুবল বলল, "কমলা অ্যাপার্টমেন্টের খালি ফ্ল্যাটে।"

দুলুর কথা শোনা যাচ্ছিল না। বলল, "কেন, ওখানে কেন, তুই কি গণাদাকে ঝাড়বার তাল করেছিস।"

ভুবনের কথা কানে যাচ্ছিল না। বাতাস আর মোটরগর্জন মিলে একাকার। চিৎকার করে দুলু বলল, "কী বলছিস! শুনতে পাচ্ছি না।"

ভুবন কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "সুমিত্রার কাছে—গণাদার শালীর কাছে। ওখানে থাকবে।

দুলু চেঁচিয়ে বলল, "কেন?"

"সুমিত্রার ছোট জামার হুক খুলতে। আজ যেতে বলেছে।"

বৃষ্টি একটু জোরেই নামল।

# সংক্রমণ

॥ এক ॥

আমার বন্ধু বিশ্বনাথ একবার আমাকে বলেছিল, "অনুতোষ, কলকাতা শহরে পাবলিক ইউরিন্যাল কখনও ব্যবহার করবি না। এখানে গনোরিয়ার জীবাণু আছে। গনোরিয়ার জীবাণু দশ হাত লাফাতে পারে।"

এমনিতে জীববিজ্ঞান বা জীবাণু বিজ্ঞান আমি কম বুঝি। শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে সোদপুরের নিত্যযাত্রী হিসাবে, স্টেশনের পাবলিক ইউরিন্যালের ব্যবহারে আমি অনভ্যস্ত নই। তবু আজ এই মুহূর্তে চৌরঙ্গীর এই পাবলিক ইউরিন্যালের সামনে দাঁড়িয়ে আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। বিশ্বনাথ, আমার বন্ধু এখন এই ১৯৮৮ সালের বারোই মে তারিখে ঠিক কোথায় কিভাবে আছে, আমি জানি না। তবু এখন বিশ্বনাথের পাবলিক ইউরিন্যাল সম্পর্কিত আপ্ত বাক্যটি মনে পড়ল।

অনেকক্ষণ ধরেই আমি তলপেটের একান্ত প্রাকৃতিক চাপে খানিকটা অস্বস্তিতে। নেহাত আজকের লেখক, শিল্পী, কলাকুশলীদের মিছিলের মাঝামাঝি ছিলাম বলে, হাতে একটি ছোট সুদৃশ্য প্ল্যাকার্ড ছিল বলে আমি প্যান্টের জীপার খুলতে খুলতে প্রশস্ত রাজপথে, প্রকৃত অর্থে পরিচিত পাবলিক ইউরিন্যালে, নিজের ওই প্রাকৃতিক চাপের হাত থেকে মুক্তি নিতে পারি নি। ফলে সোদপুর-পানিহাটি থেকে আসা আমাদের জনা তিরিশেকের মিছিলটি এসপ্ল্যানেড ইস্টের জমায়েতে মিশে গেলে আমি আর কালবিলম্ব না করে পরিচিত এই শৌচাগারটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আর এমনি সময়ে জীপারে হাত দেওয়া মাত্র আমার বিশ্বনাথের কথা মনে পড়ল। বিশ্বনাথ কখনও পাবলিক ইউরিন্যাল ব্যবহার করে নি। তিন পুরুষ কলকাতায় বাসিন্দা হয়েও প্রকাশ্য রাজপথ, ব্রিটিশ আমলের অট্টালিকার পাঁচিল গলি-ঘুঁজিতে এখনও যেসব খোলা নয়ানজুলি আছে, এমনকি খোলা ময়দান—ভিক্টোরিয়ার বাগান, মাঠে খেলা দেখতে গিয়ে গ্যালারীর নিচে কোথাও কোনো নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিয়েছে। হঠাৎ বিশ্বনাথকে মনে

পড়ল কেন ? কিংবা গণোরিয়ার কথা ? এষার জন্য কি ? রামপুরহাটে সেই রাত্রি আর এষার জন্য কি ?

চৌরঙ্গীর এই সাধারণের নিমিত্ত শৌচাগারটি ( পাবলিক ইউরিন্যালের বাংলা ) কিন্তু সে অর্থে সর্বসাধারণের নয়। যেভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা চলে, ওই যে ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট সাফরেজ না কি যেন বলে ( আমার পল্ সায়েন্সে অনার্স ছিল, পাই নি ) তেমন নয়। যদিও ভোটার লিস্টে নাম তুলতে হলে, যদি নাম বাদ যায়, দশ পয়সা দিয়ে একটা ফর্ম কিনতে হয়। ফর্ম মুদির দোকানে ঠোঙা হিসেবে অপব্যবহৃত না হয়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। এই শৌচাগারটিও তেমনি। মূত্রত্যাগের জন্য দশ পয়সা এবং মলত্যাগের জন্য পঁচিশ পয়সা ফীজ্ ধার্য আছে এখানে। তাহলে এটা কি যাকে পাবলিক ইউরিন্যাল বলে ঠিক তা নয়। সাধারণের প্রবেশাধিকার এখানে অবাধ নয়। তার জন্য প্রয়োজন অনুসারে দশ বা পঁচিশ পয়সা দিতে হবে। এখানে কি বিশ্বনাথের আপ্ত বাক্যের অনুসারী গণোরিয়া থাকতে পারে! দশ বা পঁচিশ পয়সা খরচ করে যারা প্রাকৃতকৃত্য সারে তারা কি গনোরিয়ামুক্ত! কিংবা দশ বা পঁচিশ পয়সার একটা অংশ কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ আমাদের অস্তিত্বকে—আমাদের উত্তরপুরুষকে ( গনোরিয়া বোধ হয় পুরুষানুক্রমিক ) জীবাণুমুক্ত রাখবে ?

এত ভাবার সময় ছিল না। তবু খামচে, খাবলে এমনি ভাবনাগুলোকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দশ পয়সার টিকিট কিনে, অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি চাইছিলাম আমি। এর আগে আমি কখনও ফীজ্ দিয়ে মূত্রত্যাগ করিনি।

আমাদের লোকতীর্থ নাটকের দলের কল্-শো'তে রামপুরহাটে একটা রাত্রিতে অনেক অনেক গভীরে এষাকে যেভাবে পেয়েছিলাম সেভাবে এ পর্যন্ত কোনো নারীকে আমি পাইনি। মূত্রত্যাগরত স্বগত ভাবনা, সহসাই।

নতুন এই শৌচাগারটি সুদৃশ্য। সামনে একটু লন। কিছু ফুলের টব। প্রাকৃতকর্মের কেন্দ্রটি ঘিরে কিছু ঝাউ, পাম, এমন কি এই গ্রীষ্মেও বিবর্ণ কিছু গোলাপ, ক্রিসেন্থিমাম্! এতক্ষণ কিছু দ্বিধার মধ্যে থাকলেও, ঠিক এই মুহূর্তে শৌচাগার থেকে এসে ভারমুক্ত আমি ভাবলাম, বলা ভাল ভেবে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম, গোটা কলকাতা যখন ক্রমে পাবলিক ইউরিন্যালে পরিণত হচ্ছে, তখন আমি কলকাতার তিনশো বছরের প্রস্তুতিপর্বের কর্মসূচী হিসাবে নিয়মিত এখানে এসে দশ পয়সা দিয়ে প্রস্রাব করব।

চৌরঙ্গীর আশপাশে আমাকে আসতেই হয়, আমাদের সোদপুরের দলটাকে, এষাকেও। ব্রিগেড হলে তো কথাই নেই, শহীদ মিনার, নিদেনপক্ষে এস্প্ল্যানেড ইস্টের জমায়েতে আসতে হলেও সোদপুর, শিয়ালদহ, ধর্মতলা স্ট্রীট হয়ে আমাদের যে নিয়মিত মিছিল আসে তা এই শৌচাগারের আশেপাশে এসে একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করে। মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে যে যার প্রয়োজনমত, সুবিধামত, যেমনটি আজকেও হয়েছে। সোদপুর পানিহাটি থেকে জনা তিরিশেক তিরিশ জায়গায় না হলেও পাঁচ ছয় জায়গায় নিশ্চিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আমার পাশাপাশি সোদপুরে লোকতীর্থ' নাটকের দলের ভেটারেন সদস্য কমলদা ছিলেন। তিনি বললেন, তার এক ক্লায়েন্টের ফাইন্যাল পেমেন্টের জন্য তিনি লাইফ্ ইনসিয়োরেন্সের অফিসে যাবেন। কলকাতার ভরকেন্দ্রে জীবন আর জীবিকার এক ভয়ঙ্কর তাগিদ থাকে। একেবারেই বেঁচে থাকার প্রাকৃত তাগিদ এই ভরকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে একক বা মিছিলে আমি প্রায়শঃই অনুভব করেছি। আজ এষাকে বড় দরকার ছিল। এষা কোথায় ?

॥ দুই ॥

আজকের এই মিছিলে, সমাবেশে যোগ দেওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না আমার। আমার বছর পনেরোর সাংস্কৃতিক জীবনে আমি এ ধরণের শতখানেক বা তারও বেশি প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছি। জেলান্তরে ইতিমধ্যেই একবছরে তিনটি সমাবেশ হয়ে গেছে। কলকাতায় এটি দ্বিতীয়। সারা বছর আরও আরও সমাবেশ হবে। আমাকে যেতে হবে। আজকাল আমার বড় ক্লান্ত লাগে। রামপুরহাটে এষাকে আমার ক্লান্তির কথা আমি বলেছিলাম। আমার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ পার হয়ে গেছে। আমার পিতৃদেব যিনি আজীবন শিক্ষকতা করে এই গতবছর মাত্র রিটায়ার করেছেন, তিনি একটা প্রবচন শোনাতেন উপলক্ষ পেলেই। "যার নয়ে হয় না, তার নব্বইতেও হয় না।" এই হওয়া বলতে তিনি অনেক কিছুই বোঝাতে চাইতেন। লেখাপড়া, জ্ঞানগম্যি সব মিলিয়ে যাকে 'মানুষ হাওয়া' বলে সম্ভবত তারই একটা ধারণা দিতেন। আমার পঁয়ত্রিশ পার হয়ে গেছে। আমার কিছু হয়নি, আমি 'কিছু' বলতে চাকরি-বাকরি, রোজগার, সংস্কৃতিকর্মী বা শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা—এগুলোই বোঝাতে চাইছি। পিতৃদেব আমার ন' বছর বয়সেই ছত্রিশোত্তর জীবন সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—আমার খুব অবাক লাগে। অবশ্য এর জন্য ঠিকুজি-করকোষ্ঠী বিচারের প্রয়োজন হয় না, আমি জানি। কজন আর 'মানুষ' হয় চাকরি-বাকরি, বা সংস্কৃতিকর্মী কিংবা শিল্পী হিসেবে ? বেশির ভাগই আমার মত আধেক মানুষ হয়ে পড়ে থাকে। আমার ছোট দুই ভাইই অবশ্য মোটামুটি ভালো চাকরি করে।

ওইদিক থেকে বিচার করলে, আমি মফঃস্বলে অনেক সিকি মানুষ বা তার চেয়েও ছোট মানুষ দেখেছি। তারা কেউ গান গায়—গণসঙ্গীত বা ইনটারন্যাশনাল। ভোটের সময় লোকজন জমাবার জন্য তারা বাঁধিগত পল্ রোবসন্ গায়। কেউ নাটক করে। কেউ লেখে, ভাষণ দেয়। প্রতিষ্ঠার হিসাবে বা রোজগারের হিসাবে এদের শতকরা নিরানব্বই জনই গোটা মানুষ নয়। অথচ সংস্কৃতির ফ্রন্টে—মিছিলে, সমাবেশে এদের দরকার আছে। এরা না হলে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিকর্মীর প্রতিষ্ঠা থাকে না—রোজগার থাকে না। আমাদের থিয়েটার ফ্রন্টের নতুন নাটকে প্রথম শো-এ মন্ত্রী এসেছিলেন, প্রতিষ্ঠিত এবং

প্রতিষ্ঠিতা সংস্কৃতিকর্মী এসেছিলেন ( নাম বলব না, তাদের আনতে একহাজার দুশো সীটের পয়সা আমাদের গচ্চা দিতে হয়েছিল ) উদ্বোধনী ভাষণ দিতে। যবনিকা ওঠার আগের আধঘন্টার ওই অনুষ্ঠানে হাজার বারোশো খরচা হলেও ওদের অনুষ্ঠানের সুবাদে আমাদের শ'খানেক টিকিট বেশি বিক্রি হয়েছিল। গেস্ট কার্ড বিক্রি করে আরো কিছু। গেস্ট কার্ড ক্রেতার মধ্যে আমাদের সোদপুর বাজারের মাছওলা, আলুওয়ালাও ছিল। তারা কার্ড কেনার সময় প্রতিষ্ঠিতা-ফিল্ম খ্যাতা সংস্কৃতিকর্মীর পিছনে বসতে চেয়েছিলেন। কারণ ওই শিল্পীর ফিগার বিশেষতঃ পেছন ( জনান্তিকে শোনা—'মাগীর পেছনটা বল!' ) তাদের যৌবনকালে বয়সী উদ্বেগ-উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। খ্যাতনাম্নী সেদিন অসাধারণ আবৃত্তি করেছিলেন। আমাদের সোদপুর বাজারের গেস্ট টিকিট হোলডার আলুওয়ালা, মাছওয়ালা সেদিন পুরো নাটক দেখেননি। পরে দেখা হতে বলেছিলেন "ওসবের আমরা কি বুঝি বল? ইবসেন না কি সেন—ওর চেয়ে একটা পৌরাণিক চালালে! টি. ভিতে পাবলিক্ রামায়ণ কীরকম খাচ্ছে বলতো?"

আর আমাদের বাজারের স্টেনলেস স্টীল, ঢালাই লোহার কড়াই বিক্রেতা বাবুরাম আগরওয়ালা বলেছিল "শ্রীদেবী আর মিঠুনকে নিয়ে সোদপুরে প্রোগ্রাম কর—আমি পাঁচহাজার একা তুলে দেব।" সল্টলেকে "নব আনন্দে জাগো" দেখে রাত জেগেছে বাবুরাম। মিঠুন ফ্যান্‌ক্লাবের সোদপুরের প্রেসিডেন্ট বাবুরাম।

সমাবেশে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত এক সংস্কৃতিকর্মীর ভাষণ শুনতে শুনতে আমার এভাবে ভাবা ঠিক হয়নি। আমার প্রতিবেশী পাণিহাটির সংস্কৃতিকর্মী রমেশকে বলা ঠিক হয়নি। রমেশের দাদা আবার সর্বক্ষণের পোলিটিক্যাল কর্মী। এখন লোকাল না ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে।

রমেশ বলল, "মায়াকোভস্কি কী বলেছিল মনে আছে? জনতার রুচির গালে এক থাপ্পড়।"

আমি বললাম "তুমি পারবে, পরশু ইনডোর স্টেডিয়ামে পার্বতী খান আর উষা উত্থুপের পপ্ গান আছে। ব্রেক্ নাচ আছে। সঙ্গে হুমা রেমো আরও কি কি আছে। সবচেয়ে কমা টিকিট কুড়ি টাকা। তুমি পারবে রমেশ— জনগণের রুচির গালে থাপ্পড় মারতে।"

এসময় প্রতিষ্ঠিত বক্তা আজকের অপসংস্কৃতি বিরোধী, মাদক বিরোধী সমা-বেশে কয়েকটি উচ্চাকিত প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করলেন। করতালি। রমেশ সরে গেল।

আমি অস্ফুটে বললাম "ভাগ্যিস গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকার কালে মায়াকোভস্কি জন্মায় নি।"

এ ব্যাপারে আমার এক সরকারি বন্ধুর ভাষ্য একটু অন্যরকম। তার বক্তব্য "গ্লাসনস্তেই মায়াকোভস্কিকে দরকার ছিল। লোকটা এযুগে জন্মালে অন্ততঃ

আত্মহত্যা করত না। শাখারম্ভ করেছে ?"

পরবর্তী বক্তা সরল দত্ত। বললেন, "সমাজে এক গভীর অবক্ষয় শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদীদের কারখানায় এই অবক্ষয়ের জন্ম। অপসংস্কৃতি আর ড্রাগ"—এক নিশ্বাসে বক্তা বললেন—"উঠে আসছে ওই অবক্ষয় থেকে।" উনি সেক্স্‌পীয়র থেকে উদ্ধৃতি দিলেন।

এযাকে আমিও খুঁজছি। কিন্তু উদ্বোধনী সঙ্গীতের প্রসঙ্গে আমি "ছাড় তো" গোছের একটা ভঙ্গি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো উঠতি সংস্কৃতিকর্মীর কাছে নিজের হতোদ্যম মনোভাব এভাবে প্রকাশ না করাই ভালো। কদিন আগেই বন্ধুকে আমি রিয়াজনফের টীকাসহ বাংলা অনুবাদে ম্যানিফেস্টো পড়তে দিয়েছি। সঙ্গে এরিক বেন্টলির আধুনিক মঞ্চের নাট্যতত্ত্ব। আমি জানি বইগুলো ও পড়বে না। তবুও দিয়েছি। যদি পড়েও, বুঝবে না। তবুও দিয়েছি। এতে একটা বিজ্ঞাপন আছে। দ্যাখো, আমি এই অনুতোষ রায় পিতা সন্তোষ রায় রিটায়ার্ড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার, বিএ অনার্স পল্‌ সায়েন্স, বিটি—প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী গায়ক অভিনেতা আরও কত কি—সংস্কৃতির খোলা ময়দানে আমার এলেম দেখানোর জন্যই বইগুলো জরুরী। বঙ্কু পড়বে না, পড়লে বুঝবে না জেনেও ওকে বইগুলো দেওয়া জরুরী।

সরল দত্তর ভাষণ শেষ হলো। যথারীতি উনি নাটক করলেন, সেক্স্‌পীয়র, ব্রেখট্‌ ঝাড়লেন—প্রস্থানের আগে আবার একটা নাটকীয় ডায়লগ গিমিক দেখালেন—তারপর নেমে গেলেন। করতালি।

বঙ্কু বলল "কী দিল বল গুরু! মাইরি—তুমি ওর সঙ্গে মিঠুনের "মর্দ কা বাত" তো দেখনি অনুদা, শালা সজ্জনদা লাস্ট সিনে কী ফাইটিংটা দিয়ে গেল।" আমি বঙ্কুর ওপর বিরক্ত হচ্ছিলাম। বললাম—"তুই এখনও হিন্দি ছবি দেখিস্‌ ?"

বঙ্কু বলল "কেন, হিন্দি মানেই কী খারাপ ? এই তো আমরা ভিডিওতে শ্যাম বেনেগালের দু-দুটো ছবি দেখলাম। যাই বলো স্মিতার জবাব নেই। কী এ্যাকটিং।"

বঙ্কুর ওপর রাগ করা বৃথা। ও আগে কালীপুজোর প্যাণ্ডেলে লাইট দিত। ভ্যানিসিং ঠাকুর তৈরি করত। সে কি দারুণ ভিড় বঙ্কুর লাইট দেখতে। এক-বার রামকৃষ্ণ ভ্যানিশ্‌ তো একবার মা কালি ভ্যানিশ্‌। বেশিদিন ভালো লাগেনি বঙ্কুর। বঙ্কু আরো সৃষ্টিশীল, প্রগতিশীল কাজের জন্য নাটকে এল। আমাদের 'লাল্‌ মশাল' নাটকে ( নাটক পুরো ফ্লপ ) বঙ্কুর আলোর সুখ্যাতি হল। 'লাইট-ম্যান্‌' কথাটা বঙ্কুর পছন্দ নয়, তাই সে কালক্রমে স্টেজ ম্যানেজার হয়ে গেল। ম্যানেজার নামটা বঙ্কুর পছন্দ। এখন বঙ্কু জগদম্বা অপেরার 'আলাদীন আর চল্লিশ চোর' যাত্রাপালায় আলোর খেলা দেখাচ্ছে। বঙ্কু প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিকর্মী হবে অচিরেই। যেমন এখানে আমার চেয়ে এষা সেনগুপ্তর কদর অনেক বেশি। সরল দত্ত স্নেহ ক'রে ও'র পিঠে হাত রাখে।

সরল দত্ত ভীড়ের মধ্যে ছোট একটু ঢেউ তুলে চলে যাওয়ার পরই অনেক ডাক্তার সংস্কৃতিকর্মী ভাষণ দিতে শুরু করলেন। ইনিও সংক্ষেপে সামাজিক অবক্ষয়ের কথা বললেন। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে অপরাধ এবং ড্রাগের নেশা কী ভাবে বেড়ে চলেছে, তার পরিসংখ্যান কাগজে লেখা নোট থেকে পড়ে শোনালেন। ওনার মতো করে উনি বললেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকাঠামোতে কীভাবে মাদক বর্জন সম্ভব হবে।

এ পর্যন্ত ডাক্তারী গবেষণায় মাদক সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে ( সেগুলি যদিও বেশির ভাগ পশ্চিম ইউরোপের দেশ থেকে ) তিনি তা এক এক করে তুলে ধরলেন।

রক্তে হ্যাসিস্ বা মারিজুয়ানার এলকালয়েড্ কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড করে—তিনি মেডিকেল জার্নাল থেকে নেওয়া নোট পড়ে শ্রোতাদের জানাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, কোথায় সুস্থদেহী মানুষ কিভাবে এই মাদকের প্রভাবে কুঁকড়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল, বিরাশি কেজি ওজনের দশাসই মানুষ বছর ঘুরতেই বাষট্টি, তারপর বাহান্ন। আমাদের দেশে টীন এজারদের মধ্যে ড্রাগের নেশা কিভাবে বাড়ছে, তার পরিসংখ্যানের জন্য তিনি যখন কাগজ ঘাটছেন সেই অবসরে আমি আবার সেই শৌচাগারদির দিকে পা পা এগিয়ে গেলাম। শৌচাগারের গায়ে একটি সুদৃশ্য পোস্টার ছিল।

॥ তিন ॥

মিছিলে রওনা হবার জন্য সোদপুরে আমরা একটা বত্রিশের ব্যারাকপুর লোকাল ধরব ঠিক ছিল। ব্যারাকপুর থেকে এষা আসবে ঠিক ছিল। এষা বলেছিল, আমার সঙ্গে কি নাকি জরুরি দরকার আছে। এষার সাধারণত আমার মতো সাংস্কৃতিক কর্মীর সঙ্গে দরকার থাকে না। যদিও গত কয়েকটা মাস এষা এবং আমার একটু ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু সে হচ্ছে কাজ ধান্দার প্রসঙ্গ। এষা এখন বাংলা ছায়াছবির পর্দায় মাঝে মাঝে উপস্থিত হবার ডাক পাচ্ছে। এমনিতে ক্লোজ আপে সুন্দর না হলেও, এষার গড়ন সুন্দর। এষার বয়স কত হবে? তিরিশ-বত্রিশ, না আরো বেশি। গত সপ্তাহে এষার তৈরি হয়ে যাওয়া একটা ছবির রাশ দেখতে আমি, আমার সোদপুরের দুই বন্ধু নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। মধ্যযুগীয় রাজা জমিদারদের কাহিনী—আঁটোসাঁটো কাঁচুলী, ঘাগরা পরে এষা সে ছবিতে বাইজি। সে যাই হোক, ক্যামেরা এষার বাস্ট লাইন, ওয়েস্ট লাইন হয়ে, পাছার ওপর দিয়ে পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল। ছবিতে এষার অভিনয়ের অংশ বিশেষ ছিল না। এষা নেচেছিল ভালো। একটা নাচের দৃশ্য, আরো দুটো দৃশ্যর জন্য এষা ইতিমধ্যেই বারোশো টাকা অগ্রিম পেয়েছিল। এষা সেদিন বালীগঞ্জ কোয়ালিটিতে আমাদের কফি পকৌড়া খাইয়েছিল।

দিন তিনেক এষার এই সাফল্যে আমরা, যারা সোদপুরে নাটকের দলের লোক, এক অপরিসীম আনন্দে নেশাচ্ছন্ন ছিলাম। এষা আমাদের নাটকের দলের মেয়ে। এষা টালিগঞ্জ পাড়ায় ডাক পাচ্ছে। এষার মুখের ক্লোজ আপ্ যদিও ভালো নয়, ব্রণর চাপড়া মোম ঘষেও ঢাকা পড়ে না, কিছুটা চৌকোনা ধরনের মুখ সোজাসুজি কিংবা প্রোফাইলে সেভাবে টেনে রাখে না—কিন্তু সেটাই তো সব নয়। রোহিনী হত্তাঙ্গাদি কী সুন্দর, সেই হিসাবে স্মিতা কি শাবানা ? এষা আমাদের 'স্মিতা'। শুধু মৃণাল সেন, গৌতম ঘোষ, নিদেন পক্ষে উৎপলেন্দুর একটা ডাক পাওয়ার অপেক্ষা। তারপরই কান্, ভেনিস্, মস্কো লোকার্নো,—নিদেন পক্ষে ইণ্ডিয়ান প্যানোরামা।

ব্যারাকপুর লোকালে এষার আসার কথা ছিল। এসেছে কিনা জানি না। হয়তো অন্য ট্রেনে এসেছে কিংবা ও কলকাতাতেই ছিল। এষা রামপুরহাটের কল-শো বাবদ একশো টাকা পাবে। টাকাটা আমার কাছেই জমা আছে। রামপুর-হাটের কল্-শো'তে আমাদের 'বিদ্রোহী' নাটকের পোস্টারে ভূমিকালিপিতে এষার নামের পাশে প্রথম বন্ধনীতে লেখা ছিল ফিল্ম। এষা ফিল্মের অভিনেত্রী, হ্যাঁ দুটো ছবি ওর রিলিজ করেছে ইতিমধ্যে। 'যুগান্তর' না 'আজকাল' ছোট করে একটা ছবিও ছেপেছে। আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের হিরোইন থেকে টালিগঞ্জ পাড়ায় এষার কি এটা উত্তরণ না অবক্ষয়। এষা নাকি আজকাল ড্রাগ নিচ্ছে।

যাক্, তবু এষা এখানে এসেছে। উদ্বোধনী গানও গেয়েছে। যখন উদ্বোধনী চলছিল—তখন আমি সেই শৌচাগারের সামনে। আমি ভাবলাম, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গানই গাইতে হবে, এর কি মানে আছে ? এষা তো নাচলেও পারত। আমি এষাকে খুঁজছিলাম। এষা কি আজকাল কলকাতাতেই থাকছে ? ওর কোনো প্রোডিউসারের ফ্ল্যাট বাড়িতে, একা ?

আমাদের জমায়েতের কারণে এদিকটায় 'নো এণ্ট্রি'। গভর্নর হাউসের সামনে থেকে কার্জন পার্ক বরাবর সারবন্দী গাড়ি দাঁড়িয়ে। মঞ্চের কাছাকাছি একটু বাড়তি ভীড়ের চাপ। অফিসফেরতা লোকজনের কৌতূহলী ভীড়—ইতস্তত। ওরা নাটকের, সিনেমার কিছু চেনা মুখের সন্ধানে এসেছে। আমি এষাকে খুঁজছি। ওরা কি এষার কথা জানে ?

রাস্তার মুখটাতে কয়েকজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ। আমাদের সোদপুর-পানিহাটির নাটকের দলের সেরকম কাউকে নজরে পড়ছে না। হয়তো অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ফিরতি ট্রেনে দেখা হবে—ওদের সঙ্গে, এষার সঙ্গে জমায়েতে আসতে হলে মিছিল করে আসতে হয়। মিছিল করে ফেরার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। আজ সমাবেশ শেষে এষাকে নিয়ে নিরিবিলি কোথাও বসা খুব জরুরি।

বৈশাখের শেষবেলায় রোদ মরে এসেছে। গঙ্গার দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। সমাবেশ ভাঙার মুখে—এষাকে এর মধ্যে কোথায় খুঁজব।

ডাক্তার বক্তার ভাষণ কখন শেষ হলো ? আমি যেন সমাবেশে থেকেও নেই।

এমনটাই হচ্ছে ইদানীং। অন্তত গত মাসখানেক যাবৎ বা তারও কিছু বেশি—রামপুরহাটে 'বিদ্রোহী' কল্-শো করে ছিল যেন। এষার সঙ্গে দেখা হলে বলতে পারত। এষা ইদানীং তার ভ্যানিটি ব্যাগে ডায়েরী রাখে। কবে কোথায় কার সঙ্গে কী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট, কবে নিউ থিয়েটার্স, কবে এ্যাকাডেমি—কবে সমাবেশ, এষার ডায়রীতে সব লেখা থাকে। এষার সঙ্গে দেখা হওয়া খুব জরুরি।

॥ চার ॥

এখানকার ভীড় একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করেছে। যেসব জায়গায় ব্যানার, লাল ফেস্টুন ছিল, সেখান থেকে সেগুলো সরে গেছে। সমাবেশের রঙ মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। যে কোনো মিছিল, সমাবেশ যখন এভাবে ভেঙে যেতে থাকে—আমার 'ভাঙলো মিলন মেলা ভাঙলো' গোছের একটা সুর আসে। আমার বড়ো বিষণ্ণ, দুর্বল লাগে নিজেকে। আজ আমি একবার ডাক্তার রাউতের কাছে যাব। ফিরতি মুখে এন. আর. এস হাসপাতালে একবার খোঁজ নেব—তারপর কাল সকালে সোদপুরে ডাক্তারের বাড়িতে।

না, ইদানীংকালের এই একাকীত্ব বিষণ্ণতা, এগুলোর জন্য নয়। এ-রোগ আমার অনেক কালের। প্রথম প্রথম যখন সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে আসি, তখন যেন এই শূন্যতার বোধ, এইসব মিছিল সমাবেশ, নাটক বা গানের অনুষ্ঠানের শেষে আমাকে বড়ো বেশি আঁকড়ে ধরত। অনুষ্ঠান, মিছিল, সমাবেশের আগে থেকে যে উদ্যমে, প্রত্যাশায় রক্তের গতি দ্রুত হতো, তা শূন্য উইংসের পাশে, ইতস্তত বিছানো সতরঞ্চি বা চেয়ারে কেমন যেন শ্লথ হয়ে আসত। রক্তের ওই গতিতেই তো বেঁচে থাকা—তীব্র আকাঙ্ক্ষার ওই দমকেই তো শ্লোগান। আমাদের দাবি মানতে হবে। এ দাবি—হ্যাঁ সংস্কৃতিকর্মীর দাবিও তো বেঁচে থাকার দাবি। রক্তকে উষ্ণ রাখার দাবি।

আমার রক্ত উষ্ণতা হারাচ্ছে! কয়েক মাস ধরেই দেখছি—এই রক্তের উষ্ণতা হঠাৎ হঠাৎ কমে আসছে। হাড়ের ভিতর দিয়ে এক তীব্র শীত ঠাণ্ডা সূঁচের মতো, মাথার পিছনে গিয়ে বিঁধছে। আমার পেশী, শরীরের মজবুত সন্ধিগুলো তখন কেমন যেন জ্বরতপ্ত, ভূতগ্রস্ত দুর্বল। এষা ইদানীং ড্রাগ নেয় মাঝে মাঝে, আমি নিই না। এখনও নিইনি।

গত নির্বাচনের ( সাধারণ নির্বাচন, ১৯২৪ ) সময় ময়দানের সমাবেশে আমরা সোদপুর পানিহাটির কর্মীরা নিজেদের এক জমায়েতে সামিল হয়েছিলাম। আমাদের অঞ্চলে বিভিন্ন পথসভা কিছু পথনাটিকা নিয়ে একটা প্রোগ্রাম ঠিক করার গুরু দায়িত্ব ছিল আমাদের।

সেদিনের সমাবেশেও এষা ছিল। স্থানীয় 'লোকতীর্থ'র ভেটারেন সদস্য কমলদা ছিলেন। আমাদের স্টেজ ম্যানেজার বঙ্কু ছিল। রমেশ, প্রীতিন ও আরো অনেকে ছিল। আমরা কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতার কয়েকটি

সমাবেশের জন্য শিল্পী নির্দিষ্ট করেছিলাম। তখনই আমার সঙ্গে এষার কয়েকটা জয়েন্ট প্রোগ্রাম ঠিক হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে দূরে ছিল হুগলী জেলার চাঁদপুরে আর বীরভূমের রামপুরহাটে। আমরা ছোট একটা নক্সা করতাম দুজনে। নক্সাটা পপুলার হয়েছিল গ্রামে গঞ্জে মফস্বলে। এষা মেয়ে হলে, তখন আমি বাবা সাজতাম, এষার মধ্যবয়সে দাদা বা স্বামী, আবার আমি তরুণ বিপ্লবী—এষা মায়ের ভূমিকায়। কৈশোরে আমাদের সাংস্কৃতিক দলে আমি আর এষা 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' আবৃত্তি করতাম, একবারও বই না দেখে। কিছু প্রোগ্রামে চাষী-চাষী বউ, জেলে-জেলনীও করেছি। এষার সঙ্গে সেভাবে কী আমার কোনো আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল? তখন জানতাম না।

ময়দানের সেই নির্বাচনী সমাবেশে হঠাৎ সেই প্রচণ্ড শীত অনুভব করি আমি। অল্প কাঁপুনি ছিল সঙ্গে। কিন্তু একটা অপ্রতিরোধ্য বরফের সুঁচ আমার ঘাড় হয়ে মাথার মধ্যে ঢুকছে, সেখানকার তাপে আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে, আমি স্পষ্টই অনুভব করেছিলাম। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম—এষা আমার পাশে ছিল।

ফার্স্ট এড্ ক্যাম্পের খাটিয়ায় ডাক্তার রাউত আমাকে অনেকক্ষণ শুইয়ে রেখেছিলেন। তারপর অনেকগুলো প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের ফিরিস্তি দিয়ে আমাকে বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমি বিশ্রাম নিয়েছিলাম, অনেকগুলো টেস্টও করিয়েছিলাম। মল, মূত্র, থুতু, কফ ছাড়াও ম্যালেরিয়া টাইফয়েড বা টিউবারকিউলোসিস্ সংক্রান্ত টেস্ট-গুলো থেকে কিছু পায়নি ডাক্তাররা। এই টেস্টগুলো ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু ডাক্তার রাউতের কল্যাণে সেগুলো আমি মাগনায় বা অত্যন্ত কম খরচে সারতে পেরে-ছিলাম। আচ্ছা, আজকের সমাবেশে একজন কে ডাক্তার ভাষণ দিচ্ছিল না। ডাক্তার রাউত নয় তো! মঞ্চের সামনে এগিয়ে গেলে নিশ্চিত চিনতে পারতাম। যদিও একবছরের মধ্যে ডাক্তার রাউতের সঙ্গে আমি আর খুব একটা যোগাযোগ রাখতে পারেনি। আমার চেনা ডাক্তার রাউতের মুখ ক্লিন্ সেভড্ ছিল। আজকের বক্তার মুখে দাড়ি ছিল। কাঁধে ন্যাকড়ার ব্যাগ। ওই আপাত অযত্ন-লালিত দাড়ি আর ন্যাকড়ার ব্যাগ্ কি প্রপস্, কিছুটা যা ব্যক্তিত্বকে নাটকীয় করে তোলে। ডাক্তার রাউত এখন ডাক্তার কাম-সংস্কৃতিকর্মী। গালে আপাত অযত্ন-লালিত দাড়ি আর কাঁধে ন্যাকড়ার ব্যাগ সংস্কৃতিকর্মীর ট্রেডমার্ক।

আমার ম্যালেরিয়া নয় টাইফয়েড্ নয়—টি বি নয়। ডাক্তার রাউত এখন মঞ্চে নেই—আমার চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। প্রগতিশীল সংস্কৃতি-কর্মীর কোনো ভাইরাস থাকে কি! ডাক্তার রাউত, আপনি তার টেস্ট বলবেন!

॥ পাঁচ ॥

আজকের সমাবেশে আসার আগে, আমার বাবা সন্তোষ রায়, রিটায়ার্ড অ্যাসি-স্ট্যান্ট টিচার, আমার হাতে সাদা খামে মোড়া একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

চিঠিটি একজন প্রভাবশালী সংসদ সদস্যের নামে। বাবা বললেন, বাবার বন্ধু, আমাদের শিক্ষক ফ্রন্টের বহুদিনের শ্রদ্ধেয় কর্মী হিমাংশুশেখর জানা মহাশয়ের চিঠি এটি। আমাদের সংসদ সদস্য এবং দল সবিশেষ গুরুত্ব দেন হিমাংশুবাবুকে। পশ্চিমবাংলায় নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে এঁর অবদান নাকি সাংঘাতিকভাবে স্বীকৃত। আগামীদিনে এরই স্বীকৃতি স্বরূপ শিক্ষা বিভাগে এঁর একটি জায়গা বাঁধা আছে।

আজকের সমাবেশে সেই সংসদ সদস্যকে পাইনি। আমি জানতাম পাওয়া যাবে না। পার্লামেন্টের অধিবেশন না থাকলেও সংসদ সদস্য এখন দিল্লিতে। চিঠিটা আমার চাকরির সুপারিশের চিঠি।

খবরের কাগজ দেখে ছ'বছর আগে আমি আধা সরকারি স্বশাসিত সংস্থা লোকসংস্কৃতি পরিষদে একটা দরখাস্ত করেছিলাম। লেখা আর মৌখিক পরীক্ষাও হয়ে গেছে বছরখানেক আগে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফল জানা যায়নি। শূন্যপদ তিন—একটি সংরক্ষিত, পরীক্ষা দিয়েছে সাড়ে তিন হাজার। বাবার আশা মৌখিক পরীক্ষায় যখন ডেকেছে, তখন একটা চান্‌স্ আছে এখনও। চাকরিটা পেলে হয়তো আমি মানুষ পদবাচ্য হব। যেমন আমার ছোট দুই ভাই হয়েছে। ওরা দুজনেই চাকরি করে—একজন সরকারি, একজন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে। ছোট, সবার ছোট প্রিয়তোষ নাকি খুব শিগ্‌গির বিয়ে করবে। ও বড়িষা না কোথায় যেন একটা সরকারি ফ্ল্যাট পাচ্ছে। বিয়ে করে চলে যাবে। আমার মিউনিসিপ্যালিটির ভাই দেবতোষ ইনস্টলমেন্টে একটা স্কুটার কিনেছে। ওর স্কুটারের পিছনে দুদিন আমি একটি রোগা, শ্যামলা মেয়েকে দেখেছি। একদিন শাড়িতে, আরেকদিন বোধহয় শালোয়ার কামিজে। আমি এখনও বিয়ের কথা ভাবিনি, ভাবতে পারি না। এষাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কেমন হয়? রামপুরহাট থেকে ফিরে আসার পর, বস্তুত, এষার কথাটা ঘুরেফিরে মনে পড়ছে। এষার সঙ্গে খোলামেলা কিছু কথা বলা দরকার। এখন মনে পড়ল, কে যেন বলছিল—উদ্বোধনী সঙ্গীতের সময় এষা আমাকে খুঁজছিল। শুধু গানে গলা দেওয়ার জন্য কি? মনে হয় না, আজকের নাতিবৃহৎ সমাবেশে সমবেত সঙ্গীত গাইবার লোকের তো অভাব থাকার কথা নয়।

সামনে ভাতের থালায় ভাত বেড়ে দিয়ে, ডাল তরকারি দিয়ে যেতে যেতে কথা বলা আমার মায়ের বহুদিনের অভ্যাস। বাবাও দেখেছি, এমনকি ইস্কুল যাবার তাড়া থাকলেও, এই সময়টায় কথা বলতেন। অনেক ছোটবেলায় মা কি ভাত বেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে এত কথা বলতেন? আমার মনে পড়ে না। এখন সামনে ভাত নিয়ে কথা বলতে আমার একদম ভালো লাগে না। মায়ের কথা বলার বিষয়গুলো এত জানা হয়ে গেছে! সেই চাকরি-বাকরি, সংসারের অভাব-অভিযোগ, বিয়ে-থার কথা—আমার কোন বন্ধু বাপ মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে বড়ো চাকরি নিয়ে আরবদেশে গেছে, কে ডিগ্রী নিয়ে আমেরিকা থেকে ফিরেছে। মায়ের

একই কথা ক্লান্ত, বিষাদগ্রস্ত। ভাতের থালা সামনে রেখে এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

সংস্কৃতিকর্মী হিসাবে আমার আয় সামান্য। কোনো মাসে দুশো তিনশো, কোনো মাসে আরও কম। বন্ধুবান্ধবদের সুবাদে পুজোর সময় শীতকালে, দু'-একটা গানের জলসায় ডাক পাই. সে সময় রোজগার কিছু ভালো। পাঁচশো, ছ'শো—বছর তিনেক আগে জানুয়ারি মাসে একবার এক হাজারের বেশি রোজগার করেছিলাম।

আমি বাবার বড়ো ছেলে, সেভাবে দেখতে গেলে সংসারের আর চারটি প্রাণীর এক ধরনের ভালোবাসা, প্রশ্রয় খানিকটা পাই বৈকি! সে মাসে মায়ের হাতে এক হাজার টাকা তুলে দেওয়ার পর মায়ের মুখে এক অপার্থিব হাসি দেখেছিলাম। অনেক, অনেক ছোটবেলায়, দায়-দায়িত্বহীন ছোটবেলায় মায়ের মুখে আমি এই হাসি দেখেছিলাম। মা আজকাল হাসে না। সেই হাসি হেসে বলেছিলেন "তোর বাবা বলছিল, অনু গানটাই ভালো করে প্র্যাকটিস করছে না কেন। আজকাল তো গান বাজনাতেও পয়সা আসে, প্রতিষ্ঠা আসে।"

মা এরপর আমাকে আমাদের পাড়ার বেচার কথা বলেছিল। "বেচার কাছেও তো দু'-একটা প্রোগ্রামের কথা বলতে পারিস।"

বেচা এখন মোটামুটি নামী পপ্‌শিল্পী। ওর নাম বদলে ও এখন "ভিকি" না কি যেন হয়েছে। কলকাতর দুটো রেঁস্তরায় পপ্‌ গায়। তাছাড়া আজকাল শারদীয় উৎসব থেকে শুরু করে শ্রীপঞ্চমী পর্যন্ত 'ভিকি'র প্রোগ্রাম বাঁধা। সপ্তাহে দুটো তিনটে বা আরও বেশি। 'ভিকি' সেসময় কত রোজগার করে। মাসে চার পাঁচ হাজার, নাকি আরো বেশি! আমার জানা নেই।

বেচা ওরফে 'ভিকি' কোনদিন গান শিখত বলে আমার জানা নাই। বরং একটা সময় বেচা আমার গানের ভক্ত ছিল। আমি নজরুল গাইতাম, কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত (রবীন্দ্রনাথের সব গান আমার আসত না) আর গণসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীতের কিছু জায়গায় আমি তো অনিবার্য ছিলাম। আমি সাতটি স্বরের শুদ্ধতা অর্জনের জন্য তানপুরা নিয়ে তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে গলা সাধতে শুরু করেছিলাম।

কদিন আগে আমাদের স্টেজ ম্যানেজার-কাম লাইটম্যান বঙ্কুও বলছিল, "বেচু এখন ক্যানটার করছে।" ওর টিমে এখন খাস কলকাতার তিনজন শিল্পী। একজন নাকি পার্ক সার্কাস এলাকার এ্যাংলো-খৃস্টান, ড্রাম বাজায়! বেচু ওরফে ভিকি এখন বঙ্কুর লাইট চাইছে। প্রত্যেক প্রোগ্রাম দুশো টাকা। সাজসরঞ্জাম যা কিনতে হবে সব বেচুর খরচা। বেচু বা 'ভিকি'র নামে এখন পোস্টার হচ্ছে "ভিকি অ্যাণ্ড রিটা' নাইট। দু' ঘণ্টার প্রোগ্রামে বেচা জায়গা বিশেষে দেড় থেকে দুহাজার টাকা নিচ্ছে। ফিফ্‌টি পার্শেণ্ট এ্যাডভান্স। গত সিজনের টাকায় বেচা নাকি বাগুইহাটির দিকে একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট বুক করেছে। সোদপুরে ক্লায়েন্টদের আসতে অসুবিধা হয়, তাই।

বঙ্কু উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, "এস না অনুদা আমরা একটা গ্রুপ করি। অনু অ্যাণ্ড এষা নাইট। রেট—হাজার টাকা নাইট।"

আমি বলেছিলাম, "তা হয় না বঙ্কু।" বঙ্কু বলেছিল "তুমি এষাদির জন্য ভাবছ? হ্যাঁ এষাদি দুটো-একটা সিনেমা করেছে। আরে তাতেই তো গ্ল্যামার। এষাদি ডিস্কো নাচলে স্টেজে কী কাণ্ডটাই হবে বল। লোক দিওয়ানা হয়ে যাবে!"

আমি বলেছিলাম, "না, তা হয় না।" কিন্তু একটু কৌতূহলও যে ছিল না তা নয়। এষাকে নিয়ে একটা গ্রুপ করলে পপ্ না গেয়ে যদি অন্যরকম কিছু করি! সেই চাষী-চাষীবৌ, জেলে-জেলেনী! নির্মলেন্দু চৌধুরীর (আমার একসময় প্রিয় শিল্পী) আদলে একটা 'মলুয়া' গীতিনাট্য। বঙ্কু বলেছিল 'এসব এখন পাবলিক খাচ্ছে না।" প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলেছিলাম "রিটা মেয়েটা কে রে!"

বঙ্কু বলেছিল, "তুমি দেখেছ গুরু! কী একখানা মাল মাইরি!"

আমি পাকে-চক্রে সোদপুর স্টেশনে লাস্ট ট্রেনে নেমে ফেরার পথে বাজারের ক্লাবের প্রোগ্রামে গতবছরই দেখেছি, দশ মিনিট। ফ্রী ফাংশানে ভীড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে কানে তালা লাগানো জোরালো গম্‌গমে ইকো সাউণ্ডে—"হাওয়া, হাওয়া"—মঞ্চে ধোঁয়াশা, বিচিত্র পোষাকে (হিন্দী কমার্শিয়ালের আদলে) যেন কোনো চলতি হিন্দী ছবির ফ্রেম থেকে নেমে এসে টীন এজার নায়ক নায়িকা গান গাইছে, উদ্দাম নাচছে, এ ওকে জড়িয়ে ধরে পাক খাচ্ছে, ছিটকে যাচ্ছে। সিটি, উচ্চকিত শব্দ, চীৎকার। সেখান থেকে বাড়ি সামান্য একটু পথ। আমি গুনগুন্ করছিলাম "হাওয়া, হাওয়া—এ হাওয়া"! সুরটা আমার আসে—অতি সহজে, অনায়াসে আসে।

বঙ্কুকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "রিটাটা কে রে?" বঙ্কু বলেছিল "মাল একটি, তুমি চেন না? গয়লাপাড়ার মোড়ে বলাইদার চায়ের দোকান দেখেছ। ওর আসল নাম ঋতা—বলাইদার ভাইঝি! ওর বাবা আগে পানিহাটি জুট মিলে কাজ করত। এখন বেকার! মেয়ের সঙ্গে প্রোগ্রামে যায়! তুমি দেখনি, না!"

আমি মাকে বলেছিলাম, "বেচার গানের রাস্তা আলাদা, আমার রাস্তা আলাদা।" আমি মাকে অপসংস্কৃতির ব্যাপারটা বোঝাতে পারিনি। মায়ের কাছে "ভিকি অ্যাণ্ড রিটা" নাইট অনেক জীবন্ত অভিজ্ঞতা। আমাদের বাড়িতে এখন টিভি হয়েছে, আগে ছিল না। টিভিটা প্রিয়তোষ কিনেছে। মা শনি রবিবার নিয়মিত বাংলা হিন্দী ছবি দেখে। মা গণসঙ্গীতের কোনো প্রোগ্রাম টিভিতে দেখে না। মা কি জানে, আমি কেন কাদের জন্য গান করি? আমার গানের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য? মা তো থমসন্ পড়েনি, কড্‌ওয়েল নিদেনপক্ষে গোপাল হালদার।

মা বলেছিল, "কি জানি বাবা, লোকে রাত জেগে বেচার গান শোনে, পয়সা দেয়—এই তো দেখি। গান তো লোকের আনন্দের জন্য—পয়সার জন্য।"

আমি কয়েকদিন "অনু অ্যাণ্ড এষা নাইট" ভাবনাকে লালন করেছিলাম।

মনে মনে বাগুইহাটিতে একটা ফ্ল্যাট দেখেছিলাম। আমার ব্যাণ্ডে আফ্রিকার এক বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় যুবককে ঘর্মাক্ত, দুটো স্টিক নিয়ে ড্রাম পেটাতে দেখেছিলাম।

এসব স্বপ্নের কথা আগে কখনও এষাকে বলিনি। সেদিন রাতে, অনেক গভীর রাতে এষাকে বলেছিলাম, রামপুরহাটে।

॥ ছয় ॥

আজকে মিছিলে আসার জন্য সোদপুর থেকে আমাদের একটা বত্রিশের ব্যারাকপুর লোকাল ধরার কথা ছিল। আমি জানতাম, ওই ট্রেনে এষা আসবে। আমাদের দেখা হওয়াটা জরুরি ছিল। এষাকে আজ বিষহরির রক্ষাকবচের কথা বলতাম।

খেতে বসে মায়ের একই কথা শুনতে শুনতে আমি বললাম "আচ্ছা মা তোমার সেই গুরুদেবের স্বপ্নাদেশে পাওয়া কবচটার কথা মনে আছে ?"

মা একটু অবাক হলেন, বললেন "হঠাৎ এতদিন বাদে সেই কবচের কথা, আছে কোথাও।"

জ্ঞান হওয়ার পর আমি কবচটা খুলে ফেলেছিলাম। এখানে জ্ঞান মানে আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক জ্ঞান—যাকে বলে, সচেতনতা, শ্রেণী সচেতনতা। এভাবে বললে, বড়ো বেশি লেকচারবাজির মতো শোনায় যেন। তবু আমার পনেরো বছরের সাংস্কৃতিক জীবনের শুরুতে সেটা একটা জ্ঞান অর্জনের দিন ছিল বৈকি। সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে আমার সচেতন হওয়ার দিন।

আমাদের সোদপুরের লোকতীর্থ'র (কী নাটক মনে নেই—নবান্ন ছেঁড়াতার!) নাটকে সেই আমার প্রথম অভিনয়, খালি গায়ে স্টেজ রিহার্সালের একটি দৃশ্য। হঠাৎ পরিচালক সদানন্দদার নজর পড়ল, আমার হাতে বাঁধা কবচের উপর। বললেন, "হাতে ওটা কি বেঁধেছ অনুতোষ ?

আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার কাছে কবচটার পৃথক কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আমি কত বছর বয়স থেকে ওই কবচ অঙ্গে ধারণ করে আছি, বলতে পারব না। সদানন্দদা বলেছিল "ওঠা খুলে ফেল।"

কালো কর্ডে বাঁধা কবচটায় অনেক গিঁট পড়েছিল। ছিঁড়ে গেলে মা কবচের কর্ডটা বদলে দিতেন। এর বেশি আর কিছু আমার মনে নেই।

আমি কবচটার কথা মাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম। শুনেছিলাম তার গুরুদেবের গুরুদেব নেপালের কোনো গুহায় সাধনা করে স্বপ্নাদেশে এই কবচ পেয়েছিলেন। মা বিষহরির রক্ষাকবচ। গুরুদেবের গুরুদেব ছিলেন সিদ্ধপুরুষ—বগলাতন্ত্রের সাধক। সাধারণভাবে পঞ্চমকারে তন্ত্রসাধনা জাতীয় বিষয়ে একটা ভাসাভাসা ধারণা থাকলেও বগলাতন্ত্র কি, আমি আগেও জানতাম না এখনও জানি না। শুধু জেনেছিলাম মায়ের গুরুদেবের দেওয়া ওই কবচ বিষহরির রক্ষাকবচ। যে কোনো ধরনের বিষে ধন্বন্তরি। গুরুদেবের গুরু-

দেবকে স্মরণ করে ওই কবচ ধারণ করলেই অব্যর্থ ফল। আমার কৈশোরে ডাবল নিউমোনিয়ায় রীতিমত হোম যজ্ঞ করে আমাকে এই বিষহরির রক্ষাকবচ পরানো হয়েছিল। তারপর বারো বছর—একযুগ বিষহরির রক্ষাকবচ আমাকে নাকি আধি ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

সদানন্দদা বলেছিল "তোমার রোল্ একটা প্রোগ্রেসিভ যুবকের রোল্। তোমার হাতে কবচ, তাগা, মাদুলি মানায় না। ওটা খুলে ফেল" প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীর হাতে যে কবচ মানায় না, এটা আমি ক্রমে ক্রমে জেনেছি।

কবচটি তামা কিংবা পিতলের, বাইরে একটা কালচে আস্তরণ পড়েছে, বোঝার উপায় নেই। অস্পষ্টভাবে বোঝা যায় চ্যাপ্টা চৌকো মাপের কবচের ওপর কিছু জ্যামিতিক নক্‌সা। সেটিই নাকি যন্ত্র মন্ত্র।

সে যাই হোক, মায়ের অনেক তর্জন-গর্জন, উপরোধ-অনুরোধ—শেষমেশ কান্নাকাটি সত্ত্বেও দাড়িকাটার ব্লেড দিয়ে কালো কর্ডটা কেটে আমি কবচমুক্ত হয়েছিলাম। মা কপালে হাত জোড় করে ইষ্টনাম জপেছিলেন। বলেছিলেন, "গুরুদেব, অপরাধ নিয়ো না।

আমার কপালে কবচটা ছুঁইয়ে নিয়ে বলেছিলেন, "গুরুদেবের দেওয়া জিনিস ফ্যাল্‌না হলেও থাক্, আমার কাছেই থাক।"

কবচের কথা উঠতেই মা আমার কপালে হাত দিলেন। ডাবল নিউমোনিয়ার স্মৃতিতে কি? বললেন, "মুখটা তোর কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে, হ্যাঁরে শরীর ঠিক আছে তো।"

আমি বললাম, "না, আমার শরীরের জন্য নয়।" খুব স্পষ্ট করে না ভেবেই বললাম "একজন চেয়েছে, দেব।"

না, এষা আমার কাছে বিষহরির রক্ষাকবচ চায়নি। আমিই দিতে চাইছিলাম এষাকে।

মা বলতেন, আমার যে কিছু আর হলো না জীবনে, সে ওই কবচ খুলে ফেলার কারণেই। আমাকে এখন আরও এক হাতা ভাত বেড়ে দিয়ে বললেন, "ভাতটা মাছের ঝোল দিয়ে খা, আমি দেখছি। যদি ঠাকুরের কুলুঙ্গিতে পাই।"

আমাদের একতলা ভাড়াবাড়ির চিলেকোঠায় মায়ের ঠাকুরঘর। সেখানে দশ বারো রকম ঠাকুর ঠাকুরাণী পটে অথবা মূর্তিতে বিরাজমান। মায়ের বড়ো নিজস্ব জায়গা, চিলেকোঠায় ধূপ ধুনো-ফুল মেশানো একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। ঠাকুর ভালো না লাগলেও গন্ধটা আমার ভালো লাগে।

মা আমার হাতে যত্ন করে কাগজে মুড়ে কবচটা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন "যা, একটা শুভ কাজে যাচ্ছিস নিয়ে যা।"

আমি জানতাম বাবা সুপারিশপত্র যার হাতে দিতে বলেছিলেন, সেই সংসদ সদস্য এখন দিল্লিতে। আমি জানতাম সরকারি সংস্থা লোকসংস্কৃতি পরিষদে দুটি অসংরক্ষিত শূন্যপদের একটির জন্যও দাবিদার আমি হতে পারব না। এ ধরনের সুপারিশ নির্ভর চাকরির ক্ষেত্রগুলোতে চাকরি কেন পাওয়া যায় না,

তা আমি জানি। কীভাবে পেতে হয়, তা ঠিকভাবে জানি না। আন্দাজ করতে পারি, আমার চাকরি হবে না।

এষার জন্যই যে বিষহরির কবচ দরকার মা জানে না। রামপুরহাটের কল্-শো'তে না গেলে, অনেক রাতে এষার সঙ্গে অনেক কথা না বললে, আমিও জানতাম না এষার বেঁচে থাকার জন্য মেডিকেল সায়েন্সে আপাতত কোনো ওষুধ নেই।

আমি এষাকে বিষহরির রক্ষাকবচের কথা বলি নি। আজ এই সমাবেশের পর কোথাও ময়দানে বা রেস্তোরাঁয় বসে বলব ভেবেছিলাম। এষা, যখন কোনো ভরসাই কোথাও নেই, তুমি একবার বিষহরির রক্ষাকবচ ট্রাই কর। তুমি এখন রোগী—প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী নয়। তোমার জন্য এখন আমাদের হাতে কোনো ওষুধ নেই।

তুমি বিষহরির রক্ষাকবচ নিয়মিত শোধন ক'রে বামবাহুতে ধারণ কর। মাতা বিষহরি তোমাকে রক্ষা করবেন।

বেরবার আগে মাকে বললাম, "মা তুমি গুরুদেবকে স্মরণ কোরো···আমি একজনকে রক্ষাকবচ পরাবো।"

॥ সাত ॥

রামপুরহাটে হঠাৎ এই মরা মরশুমে আমাদের সোদপুরের 'লোকতীর্থ' দলের কল্-শো-এর ডাক পাওয়াটা রীতিমত ঘটনাচক্র। এষা, বলা চলে, এক্ষেত্রে খানিকটা অনুঘটকের কাজ করেছে। এষার সঙ্গে মাধাইবাবুর আলাপ টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায়। মাধাইবাবু যার পুরো নাম মাধবলাল সাহা, বাড়ি রামপুরহাটে, ব্যবসাদার। লোহা লক্কড়ের স্ক্র্যাপের ব্যবসা আছে। পানাগড় থেকে মিলিটারি ডিসপোস্যালের ট্রাক, জিপ কিনে মেরামতি করে আসানসোলে বিক্রির ব্যবসা করেন। বড়ো কনট্রাকটরও বটে। রাস্তা করেন, মাটি কাটেন, সেই মাটি দিয়ে খাদ ভরাট করেন। তিনি 'সিনেমা' করতে চান। সিনেমার প্রযোজক হতে চান। সে ভাবেই এষার সঙ্গে মাধাইবাবুর আলাপ।

এষার পরিচিত একজন পরিচালক মাধাইবাবুর সঙ্গে এষার আলাপ করিয়ে দেন। টালিগঞ্জেরই কোনো এক স্টুডিওতে আলাপের মাস দুই পরে মাধাইবাবু এষাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেন ব্লু ফক্স, নাকি ট্রিনকাতে। সেখানে আরও উঠতি চিত্রতারকার সমাবেশ যে হয়নি এমন নয়। কিন্তু মাধাইবাবুর বিশেষ পক্ষপাত দেখা যায় এষার প্রতি। দু'পাত্র হুইস্কির পরই মাধাইবাবু এষার কোমর জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, "আপনার সঙ্গে সুচিত্রা সেনের মুখের আদলের মিল আছে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে আমি তুলব। আপনি মুনমুনের মত নাম করবেন।"

সেদিন নাকি সত্যিই এষার পরিচালক এষাকে মাধাইবাবুর সাথে যেতে বলেছিলেন। কলকাতার উপকণ্ঠে কোনো গেস্ট হাউস নাকি বাগানবাড়িতে।

আমি জানি না এষা গিয়েছিল কিনা। রামপুরহাটে আমাদের 'বিদ্রোহী' নাটক শেষ হয়ে গেলে এষা আর আমি বহুক্ষণ একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। এষা আমাকে মাধাইবাবুর গল্প বলেছিল, কিন্তু বলেনি এষা সেদিন মাধাইবাবুর সঙ্গে ওপরে ওঠার জন্য কোনো গেস্ট হাউস বা বাগানবাড়িতে গিয়েছিল কিনা। নদীর অন্যদিকে হাতাওয়ালা একটা বিরাট বাগানবাড়ি ছিল।

এষা মাধাইবাবুর প্রযোজনায় সিঁথির সিঁদুর ছবিতে সহনায়িকার ভূমিকায় সই করতে পারে, খবর ছিল। এষা কত টাকা এ্যাডভান্স নেবে? এষা কি সোদপুর ছেড়ে কোথাও ফ্ল্যাট কিনছে?

মাধাইবাবুর বাড়ি রামপুরহাটে। বয়স পঞ্চাশ বা কিছু বেশি। অকৃতদার মাধাইবাবু একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থার আজীবন সদস্য নাকি প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তারাই নাকি মাধাইবাবুকে আমাদের দলের নাম আর 'বিদ্রোহী' নাটকের কথা বলে। মাধাইবাবু নতুন করে নাটকের সুবাদে এষাকে পেয়ে যান।

এ নাটকে এষা যে নায়িকা হিসেবে, (গত পাঁচটা ছ'টা শো আমরা কলকাতায় এষার তারিখ পাইনি) রামপুরহাটে এল, সেটা কাকতালীয়।

'বিদ্রোহী' নাটকে এষা প্রধান ভূমিকায়। অনেকটা গর্কির মায়ের আদলে এষার চরিত্র। এ নাটকে পুলিশ-সমাজবিরোধী মিলে এষাকে ধর্ষণ করছে, এমন একটা দৃশ্য আছে। যারা 'বিদ্রোহী' দেখেছেন, তাঁরা জানেন, বস্কুর লাইটে, শব্দ ক্ষেপনে ঠিক হাফ্ টাইমের আগে এ দৃশ্য নাটকের একটা জোরালো দৃশ্য। এখানে অন্যতম ভিলেনের ভূমিকায় আমার এক বন্ধু স্বপন প্রায় 'বিয়াল্লিশ' ফিল্মের বিকাশ রায়কে মনে পড়িয়ে দেয়। এষা রামপুরহাটে ওই দৃশ্য উতরে দিল, অনায়াসে।

এষার 'বিদ্রোহী' চেহারার তুঙ্গী অবস্থা প্রায় শেষদিকে। সেখানে রামদা হাতে এষা সাক্ষাৎ মা দুর্গা। নেপথ্যে ঢাকে কাঠি, বলির বাজনা।

বিদ্রোহী নাটকে আমি একটা বাউল চরিত্র করি। দুটো গান গাই। গান, অভিনয় দুটোই আসে বলে এ নাটকে আমিও নজরে পড়ি। আমাদের নিজেদের স্ক্রিপ্টে এ নাটকের রামপুরহাট শো নিয়ে একচল্লিশটা অভিনয় হয়ে গেল।

এষা এ নাটকের জন্য একশো টাকা পাবে। রাহা খরচ, খাওয়া থাকা খরচ আমাদের। আমাদের দলের সভ্যা (যদিও কোনোকালেই চাঁদা দেয় না, আমরাও প্রাপ্য টাকা থেকে কাটি না) হলেও, বিদ্রোহী নাটকের শো-এর জন্য এটাই এষার সঙ্গে আমাদের কনট্রাক্ট্। টাকাটা, ওই একশো টাকা আজও আমার পকেটে আছে। এষার সঙ্গে দেখা হলে দিতে হবে।

এষার সঙ্গে রামপুরহাটে রাত বারোটার পরের কেচ্ছাটা খুব চাউর হয়েছিল: আমাদের সোদপুর পানিহাটিতে তো বটেই (কথাটা আমার ভাই প্রিয়তোষ, এমনকি তার বউয়ের কানেও উঠেছিল) কলকাতাতেও আমাদের পরিচিত মহলে আমাকে এষাকে নিয়ে রাত বারোটার নদীর ধারের দৃশ্যটি চাউর হয়েছিল। পরে

শুনেছি, ঘটনাটি প্রচারের পিছনে মাধাইবাবুর হাত ছিল। রামপুরহাটের ওই দৃশ্যে পাথর নুড়ি চাপা পড়া এক শীর্ণতোয়া, তিরতির করে বয়ে যাচ্ছিল। আমরা খালের ধার, উঁচু পাড় থেকে পাক খেয়ে খেয়ে নেমে এসে শীর্ণ তোয়ার জলে পা ডুবিয়ে বসেছিলাম। পায়ের পাতাটুকু ডোবে, খালে তখন ততটুকুই জল ছিল। বাতাসে কিংবা আপন গতিতে তখন শীর্ণতোয়ায় একটা মৃদু স্পন্দন ছিল, নিরুচ্চার গতি ছিল। আমি খালটি বা ওই শীর্ণতোয়ার নাম জানি না। এষা আর আমি ওই শীর্ণতোয়ার পাশে অনেকক্ষণ শুয়েছিলাম।

নাটকের পর মেকআপ তুলে আমরা যে যার ঘরে গিয়েছিলাম। ঘর বলতে রাত্রে একটি প্রাইমারি স্কুলের মোট চারখানি ক্লাসরুম আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি করে। কিছু পরে রামপুরহাটের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতার লেভেল দেওয়া প্যাকেটে আমাদের জন্য প্যাকড্ ডিনারে মাংস আর বিরিয়ানি এসেছিল। আধেক গলে যাওয়া আইসক্রিম ছিল কাপে তার পরে।

কলকাতা থেকে দূরে, বিশেষত রামপুরহাটের মতো মফঃস্বলে আমরা সাধারণত শালপাতা পেতে ভাত মাছের ঝোল, মাংস, দই, মিষ্টিতে অভ্যস্ত। প্যাকড্ লাঞ্চ সেখানে একটা ব্যতিক্রম।

প্রাইমারি ইস্কুল বাড়িতে দুটি টেবিল ফ্যান, দুটি শিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু লোডশেডিং-এর জন্য ওই ফ্যানে কাজ হচ্ছিল না। বরং খোলা আকাশের নিচে, প্রাইমারি ইস্কুলের আঙিনায় স্বস্তি ছিল। এ সময় প্রকৃতির স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ শীতল ছিল। ইস্কুলের আঙিনায় দাঁড়িয়েই এষা বলেছিল, "অনুতোষ, চলো না, খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বেড়িয়ে আসি।"

রাত বারোটায় কোনো নারীকে (এষার মতো কোনো নারী) সঙ্গে নিয়ে নির্জন খোয়াই ভেঙে শীর্ণতোয়া এক খাল না পাহাড়ি নদীর ধারে গিয়ে বসার অভিজ্ঞতা সেই আমার প্রথম। একজন নারীকে শীর্ণতোয়া নদীর পাশে নিয়ে অত রাতে শুয়ে থাকার অভিজ্ঞতা প্রথম। অনেক রাতে, খালের জলে পা ডুবিয়ে (মাথার ওপর থেকে তখন একটা প্রায় গোল চাঁদ, গলে গলে আমাদের চারপাশে শীর্ণতোয়ার জলে এসে মিশছিল) এষা বলেছিল, "অনুতোষ, আমার একটা ভীষণ অসুখ করেছে।"

॥ আট ॥

দুটো মাস কেটে গেছে ইতিমধ্যে। আমরা এর মধ্যে অপসংস্কৃতি আর মাদক-বিরোধী সমাবেশ করেছি আরও দু'-তিনটে। একটা অনুষ্ঠানে 'উই স্যাল ওভারকাম' গেয়েছি সোদপুরের 'লোকতীর্থ'র শিল্পীদের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে। এই অপসংস্কৃতি আর মাদকের জগত পেরিয়ে আমরা কোথায় যাব, সেটা অবশ্য আমরা শিল্পীরা বিশেষ জানি না। কিন্তু গান গেয়েছিলাম, বেশ ভরাট দরদ দিয়ে—সমবেত কণ্ঠে।

দুটো মাস কেটে গেছে। চীনের ছাত্র আন্দোলন কিংবা গ্লাসনস্ত পেরেস্ত্রৈকা নিয়ে আমাদের লোকতীর্থর সংস্কৃতিকর্মীরা দুটো আলোচনাচক্রর ব্যবস্থা করেছিল। সেই আলোচনাচক্রে নেতারা বলেছিলেন, (যা তাঁরা গত পঞ্চাশ বছর ধরে বলে চলেছেন) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানি এক হলে কি হবে, তা নিয়ে আমার রিটায়ার্ড পিতৃদেব মাঝে মাঝে উত্তেজিত আলোচনা করেন। দু'মাসে তাঁর ব্লাড সুগার বেড়েছে, প্রেসার বেড়েছে। মায়ের চোখের চালসে একটু ঘন হয়েছে। মা এখন ভালো দেখতে পান না।

এই দুটো মাসে আমার দু'মাস বয়স বেড়েছে। সরকারি সংস্থা পরিচালিত লোকশিল্পী পরিষদের চাকরির জন্য আমি আরও দুটো সুপারিশপত্র নিয়ে দুজনের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা আশা দিয়েছেন—একটা প্যানেল হবেই হবে। কবে হবে, তা না জানলেও, আমি মাকে আশা দিয়ে যাচ্ছি—একটা প্যানেল হবে। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।

এই দু'মাস এষার আমি কোনো খবর পাইনি। বাইরের কোনো কল্-শো পাইনি। এষার সঙ্গে দেখা হয়নি। বিষহরির রক্ষাকবচ আমার কাছেই রয়ে গেছে। এষার একশোটা টাকাও।

কলকাতার সমাবেশে সেদিন উদ্বোধনী সঙ্গীতের সময় (বঙ্কু বলেছিল) এষা আমার খোঁজ করেছিল। গানে গলা দেবার জন্য, নাকি রামপুরহাটের কল্-শো'র একশোটা টাকার জন্য। অথবা সেই ভয়ংকর গভীর গোপন অসুখের কথা বলতে? এষা কি রামপুরহাটের নদীর ধারে যেমন হয়েছিল, তেমন একা হতে চেয়েছিল—কলকাতার ভীড়ে চৌরঙ্গী বা সিধু কানু ডহরে? আমার কোনো বাগানবাড়ি নেই, হোটেলে যাওয়ার পয়সা নেই।

ব্যাপারটা যদি তাই হবে, তবে একটা বত্রিশের লোকালে যখন দেখা হলো না, সমাবেশে আমাকে খুঁজল না কেন এষা? সোদপুরের আমাদের দলের কয়েকজনের সঙ্গে তো দেখা হয়েছিল এষার, সেই সমাবেশে। আর যদি এভাবে ভাবা যায় যে, এষা তার ভয়ংকর গভীর গোপন অসুখের কথা নিয়ে আমার সঙ্গে আর আলোচনা করতে চায় না, তাহলে সেদিন এষা আমাকে ডেকে নিয়েছিল কেন? রামপুরহাটে শীর্ণতোয়ার তিরতিরে স্রোতের ধারে—হঠাৎ কেমন যেন নিজেকে নিঃশেষ করে বলে উঠেছিল, "অনুতোষ, আমার একটা ভীষণ ভয়ংকর অসুখ করেছে।"

এষা বলেছিল, তার জ্বর হচ্ছে। ক্লোরোকুইন থেকে শুরু করে এ্যাম্পি-সিলিন—আরোও আরোও ব্রড স্পেকট্রাম এ্যান্টিবাইওটিকের সমস্ত ধারাপাত শেষ করে ডাক্তার রাউত নাকি বলেছিলেন, "রক্ত পরীক্ষা করান।"

রক্তর একটা নিয়মমাফিক পরীক্ষা আছে। শরীরের ভিতরে কোথাও কোনো ক্ষত জীবাণুসংক্রমণ এসব টেস্টে নাকি ধরা পড়েনি। ই. এস. আর. কি আমি জানি না। ওই টেস্টের অস্বাভাবিকতা দেখে প্যাথোলজিস্ট ডাক্তার বর্মন গম্ভীর

মুখে নাকি বলেছিলেন "এষাদেবী, আপনি কি ড্রাগ নেন ?"

ডাক্তার রাউত বা ডাক্তার বর্মন এ-দুজনের সঙ্গে দুমাসের মধ্যে আমার যোগাযোগ হয়নি। এষা বলেছিল বাষট্টি কেজি থেকে একবছরে তার ওজন কমে বাহান্ন হয়েছিল। তার শরীরের ভেতর কোথাও, কিংবা রক্তপ্রবাহের মধ্যে ভাসমান লক্ষ লক্ষ কণিকার কোথাও একটা কী যেন ঘটে যাচ্ছে, এষা অনুমান করেছিল। আমার ওজনও একদিন মাপতে হবে। আমারও জ্বর হচ্ছে। আমার ওজন কি দু'মাসে দশ কেজি কমে যাবে ?

ডাক্তার বর্মনই নাকি এষাকে কিছুটা জোর করে, বাধ্য করিয়েই সিরামের, রক্তের এলিসা টেস্ট করিয়েছিলেন। এষা বলেছিল, ডাক্তার বর্মনকে 'আমার ভয় করছে ডাক্তারবাবু। আপনি আমার পরিচিত ডাক্তার। রাউতদা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি জানি এলিসা টেস্ট কি। আপনি আমার নাম বদলে আয়েষা রাখুন—আয়েসা খাতুন।

এলিসা টেস্টে আয়েসা খাতুনের এইচ. আই ভি. পজিটিভ্ হয়েছিল।

আর এরপর রামপুরহাটের কল্-শো। এষা বলেছিল রামপুরহাটে শীর্ণতোয়া এক খাল না পাহাড়ি নদীর ধারে বসে—"অনুতোষ আমার এক ভীষণ ভয়ংকর অসুখ করেছে।"

।। নয় ।।

সেদিন সেই সমাবেশ শেষে আমি বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। সমাবেশের চিহ্নমাত্র তখন সেখানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতার এই অঞ্চলের রাত আটটার প্রাত্যহিক সমাবেশকে গিলে ফেলেছে ততক্ষণে। আমি কতক্ষণ এখানে-সেখানে ঘুরেছি। তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা। কার্জন পার্কের বাসস্ট্যাণ্ডে, মেট্রো সিনেমার সামনে রাস্তার আলোয় যতটুকু সম্ভব আমি এষাকে খুঁজেছি। এষা নেই।

শেষ মুহূর্তের কোনো ভাবনায় এষা হয়তো সরে গেছে। এষা আজকাল সোদপুরে থাকে না। আমি ভাবছিলাম যত রাত্রিই হোক সোদপুরে একবার ডাক্তার রাউতের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার আগে ডাক্তার বর্মন।

ডাক্তার বর্মনকে খুঁজে পেতে, কথা বলতে একটু ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন জঙ্গি কমরেডের পরিচিতিতে আমি অ্যাপয়েনটমেণ্ট পেলাম।

ডাক্তার বর্মণ বললেন, "এষা আই মীন আয়েষা খাতুন (উনি অনেকগুলো কার্ড ঘাটলেন) হ্যাঁ মনে পড়েছে। সিরামের এলিসা টেস্ট হয়েছিল। সাস্-পেক্‌টেড্ এড্‌স্ ভাইরাস্।"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা কি কনফার্মড্। মানে আমাদের এষা, আয়েষা খাতুন কি আর কোনোদিনই—"

ডাক্তার বললেন, "বলা মুশকিল। আসলে হঠাৎ হঠাৎ এই জ্বর আসা। যোন্ অ্যাংগল্, মাসল্ হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়া। এমনকি নার্ভগুলোও হঠাৎ কেমন হয়ে যাচ্ছে দেখছেন না। গায়ে জ্বর অথচ একটা রকমের সূচের মতো ঠাণ্ডা কিছু এষাদেবীর মাথায় ঢুকে যাচ্ছে, গলে ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। আমি বললাম, "এটা কি এড্সের নিশ্চিত সিম্‌টম্।"

ডাক্তার বর্মন বললেন, "বলা মুশকিল। বলা মুশকিল। এলিসা টেস্টে এইচ. আই. ভি পজিটিভ্। ভয় পাওয়ার কারণ আছে। ওয়েস্টার্ণ ব্লট টেস্ট বলে একটা টেস্ট আছে। সে টেস্টটা হয়ে গেলে নিশ্চিত হওয়া যেত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এষাদেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ডাক্তার বর্মনের কাছ থেকে সেদিন আমি আমার বন্ধু বিশ্বনাথের কাছে গিয়েছিলাম। বিশ্বনাথ কখনও পাবলিক ইউরিন্যালে প্রস্রাব করেনি। বিশ্বনাথের বাড়ি খুঁজে পেতে সময় লাগল খানিকটা। অনেক দিন দেখা নেই বিশ্বনাথের সঙ্গে। গড়িয়াহাট বাজারের পিছনে বিশ্বনাথদের পুরোনো বাড়ির সমনেটা এখনও পুরোদস্তুর বাজার। রাত ন'টাতেও সেখানে রাস্তার ওপর বিশ্বনাথদের দরজার সামনে লাউশাক, কুমড়োশাক, নটেশাক নিয়ে বসে আছে এক বুড়ি।

বিশ্বনাথকে বাড়িতে পেলাম না। পেলে ওকে আমি দশ পয়সা দিয়ে শৌচাগারে মূত্রত্যাগের গল্প বলতাম। ওর কাছে আবেদন জানাতাম—কলকাতার তিনশো বছরে ও যেন শহরের যত্রতত্র জিপার খুলে না দাঁড়িয়ে যায়। বিশ্বনাথের মা বললেন "অফিসের কাজে বিশ্বনাথ ধানবাদ গেছে। দিন তিনেক বাদে ফিরবে।"

বিশ্বনাথের মা আমাকে চিনতে পারেনি। ও'র চোখেও কী চাল্‌সে পড়েছে। আমি বললাম 'মাসীমা, আমি অনুতোষ—অনু।"

উনি জিজ্ঞেস করলেন, "বিশুকে কিছু বলতে হবে?" আমি বললাম, "আমার কাছে মা বিষহরির রক্ষাকবচ আছে। বিশুর যদি গণোরিয়ার সংক্রমণ হয়, বা আরও কোনো খারাপ রোগের—এড্সের, ওকে বলবেন—বিষহরির রক্ষাকবচটা বাঁধতে। কালো কর্ড দিয়ে হাতে বাঁধলে বিষহরি ওকে রক্ষা করবে।"

মাসীমা কানে ভালো শুনতে পান না। তবু বললেন, "বিশুর কী কিছু হয়েছে? কই ও তো কিছু বলেনি। বৌমাও কিছু বলেনি।"

মাসীমাকে স্পষ্টতই কিছুটা হতচকিত বিহ্বল দেখাচ্ছিল। আর তখনই দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে এক মাঝারি গড়নের মহিলা নেমে এলেন। চৌকো মুখের আদল। চুলটাও মাঝারির মাপে ছাঁটা—শরীরের গড়ন ভারি সুন্দর। বয়স কত হতে পারে—তিরিশ বত্রিশ পঁয়ত্রিশ!

মাসীমা বললেন, "বৌমা, দ্যাখো কে এসেছে। বিশুর বিশেষ বন্ধু, আমাদের অনুতোষ—অনু গো!"

বৌটির আমাকে চেনার কথা নয়। বিশ্বনাথের বাড়িতে আমি দশবছর বাদে এলাম। বিশু যে বিয়ে করেছে, আমি তো তাই জানতাম না।

বৌটি বলল, "আসুন, ওপরে উঠে আসুন।" আমি বললাম, "আজ থাক।

আপনি বিশ্ব এলে বলবেন আমি এসেছিলাম।" বৌটি বলল, "বিষহরির রক্ষা-কবচ না কি যেন বলছিলেন।"

আমি বললাম, "ও কিছু নয়। আপনার নামটি কিন্তু জানা হল না।"

বৌটি সলজ্জ হেসে বলল, "আয়েসা! আয়েসা খাতুন।"

আমি দেখলাম, এখন একেবারে মুখোমুখি দেখলাম সিঁথিতে সিঁদুর দিলে এষাকে বৌটির মতো দেখাত। বৌটি বলল, "আবার আসবেন কিন্তু।"

আমি ভাবলাম এষা, আয়েষা খাতুন নামে এলিসা টেস্ট করালো কেন? এষা কি আয়েষার নাম জানে, পরিচয় জানে? বিশ্বনাথের সঙ্গে তো এষার পরিচয় থাকার কথা নয় কিংবা আয়েষার এষার সঙ্গে।

আয়েষার এইচ. আই. ভি. টেস্ট হয়েছে কি? এইচ. আই. ভি. কী পজিটিভ্' আজ না হলেও চার সপ্তাহ, চার মাস কিংবা চার বছর পরে হতে পারে। আয়েষার এড্‌স্ হতে পারে।

॥ দশ ॥

যতদিন যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি আমার রক্তে এষা মিশে যাচ্ছে। এতদিনে অনেক স্পেশালিস্ট প্যাথোলজিস্ট ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝেছি—এইড্‌সের ভাইরাস আমার রক্তে পালতোলা নৌকার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। রক্তের গতি দ্রুত হলে নৌকা ভাঙছে, নোঙর করছে আবার ভাসছে। চক্রাকারে এই আবর্তনে আমার শরীরের মানবিক মেরুদণ্ডী জিনের বদল ঘটছে। ডি. এন. এ—আর. এন. এ.-র বিপর্যয় ঘটছে। ভাইরাসের ডি. এন. এ. এখন আমার রক্তকণিকায় আর. এন. এ.-র সঙ্গে মরণান্তিক সঙ্গমে লিপ্ত। রামপুরহাটে সেই শীর্ণতোয়া নদীর ধারে—নুড়ি পাথর, কিছু দুর্বাঘাসের শয্যায় জলের শব্দ শুনতে শুনতে (আমাদের পায়ের পাতা জলে ডুবে ছিল। আকাশে চাঁদ ছিল) এষা আর আমার ভালোবাসা-বাসির চেয়েও শরীরের অনেক ভিতরে ভাইরাসের এই সঙ্গম অনেক রক্তাক্ত—অনেক মর্মান্তিক।

একটু একটু করে আমি ভেঙে যাচ্ছি। এলিজা টেস্টের পর ওয়েস্টার্ন ব্লটিং টেস্ট। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ওজন কমে গেছে পনেরো কেজি। আমি কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছি।

ডাক্তার রাউত এর মধ্যে একদিন আমাকে দেখতে এসেছিলেন। বললেন, "আমার ইমিউনিটি সিস্টেমটা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এবার কোনো খবর পেলেন?"

ডাক্তার রাউত বললেন, "কী করে এটা হলো বলুন তো? আপনি ড্রাগ এ্যাডিক্ট্ নন!"

আমি রক্ত দিয়েছি রক্তদান শিবিরে। আমি জ্বর, সর্দি-কাশি, আমাশার ইন্‌জেকশন্ নিয়েছি হেলথ্ সেণ্টারে, পাবলিক হাসপাতালে। আমি অনেক

অনেকবারই রক্তের টেস্ট করিয়েছি। টি. সি. ডি. সি.—ই. এস. আর। আমি চাকরির জন্য তদ্বিরে গিয়ে নেতার জন্য রক্ত দিয়েছি।

বক্রেশ্বর তৈরির জন্য আমি তিনটি ক্যাম্পে মোট পাঁচবার রক্ত দিয়েছি।

প্রায় একবছর হয়ে গেল, রামপুরহাটে এক শীর্ণতোয়ার জলের পাশে আমার এক প্রিয় নারীর পাশে শুয়ে শুয়ে রক্তাক্ত হয়েছি।

হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস এখন শিরায়, ধমনীতে প্রতি মুহূর্তে সংক্রমিত হচ্ছে। বাইরে, ভিতরে এই ভয়াবহ সংক্রমণে আমি কি বাঁচব ডাক্তার?

আমি শোধন করে কালো কর্ড দিয়ে আবার বিষহরির রক্ষাকবচ ধারণ করেছি।

॥ এগারো ॥

আমি এখন আর সোদপুরে থাকি না। সেভাবে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় স্থিরতাও নেই। মাঝে মাঝে এষার কথা মনে পড়ে। এষার কথা আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করি না। কেউ বলেও না। মাধাইবাবুর সেই ছবিটা, 'সিঁথির সিঁদুর', কী শেষ হলো? এষা কি তাতে আছে? মাধাইবাবু কী এডস্ ভাইরাসের কেরিয়ার? মাধাইবাবুকে পুলিশে ধরছে না কেন? নির্বাসনে দিচ্ছে না কেন?

আমার কেস্‌টা সোদপুরের 'লোকতীর্থ" গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা কি জানে! ডাক্তার রাউত জানে, হয়তো ওরাও জানে

কাল বিশ্বনাথ এসেছিল।

আমি বললাম, "তুই এখনো কি খোলা রাজপথে নয়ানজুলিতে জিপার খুলে···

ও বলল, "গনোরিয়ার জীবাণু দশ হাত লাফাতে পারে, তবে তুই যখন বলেছিস আমি দশ পয়সা দিয়ে একদিন সাধারণ শৌচাগারে যাব।"

আমি বললাম, "তোর বউ আয়েষা—আমি একজন আয়েষাকে জানতাম তার আসল নাম এষা, এষা বা আয়েষা কিন্তু এডসের কেরিয়ার হতে পারে। তুই আয়েষার সিরামের এলিসা টেস্ট করিয়ে নিস্।" বিশ্বনাথকে আমি এষার কথা বললাম।

বিশ্বনাথ বলল, "তুই বলছিস, আমি খুঁজব। কিন্তু কি হবে খুঁজে।"

আমি বললাম, "আমি জানি না. এষা আমাকে ভালোবাসে কিনা, আমি বাসি কিন্তু। ওকে পেলে আমি এখনও বোধ হয় লড়তে পারি—এডস্ ভাইরাসের সঙ্গে, হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসের সঙ্গে—রক্তে ওদের ডি. এন.এ. আর. এন. এ.-সঙ্গে।

ডাক্তার রাউত বলেছেন, "চিকিৎসা নেই এমন বলি না। ব্যয়সাপেক্ষ—কিন্তু আছে। সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত মানুষ দরকার। তার মেরুদণ্ড দরকার। মেরুদণ্ডের

মজ্জা দরকার। তার উষ্ণ শোণিত দরকার—তাহলেই বদলাবে, ধীরে ধীরে বদলাবে। একটা মানুষ তার সামগ্রিক অস্তিত্ব—তার রক্ত বদলাবে।"

আমি বিশ্বনাথের হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, "বিশু তুই খুঁজিস কিন্তু। এষা সেনগুপ্ত, বয়স বত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ, মুখ এমন কিছু নয়—সোজাসুজি বা প্রোফাইলে তেমন আসে না। অনেকটা তোর বৌয়ের মতো। তুই এষাকে খুঁজিস কিন্তু বিশু।"

আমি জানি, এষাকে খুঁজে পেলে আমরা দুজনে (একা আমি পারব না) একজন সুস্থ মানুষকে খুঁজে বেড়াবার অভিযানে বেরব। সে মানুষটা কেমন আমি জানি না। ইদানী স্বপ্নে দেখি—আবছা অবয়ব, কিন্তু সোজা মেরুদণ্ড, লড়াকু। সুস্থ সুন্দর তাজা শোণিত বয়ে চলেছে তার রক্তে

আমি আর এষা তার কাছে নতজানু হয়ে বসব। বলব, আমরা আপনার মেরুদণ্ড চাই—মেরুদণ্ডের মজ্জা চাই। আমাদের শরীরের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ করে নিংড়ে ফেলে দিয়ে আমরা আপনার রক্ত চাই।

"চারিদিকে এত মানুষ, মিছিল সমাবেশ জনবিস্ফোরণ—একটা সুস্থ মানুষ পাব না বিশু ?"

---